তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০২১ (বিশেষ সংখ্যা)। ৫০ টাকা

ভয়েস মার্ক

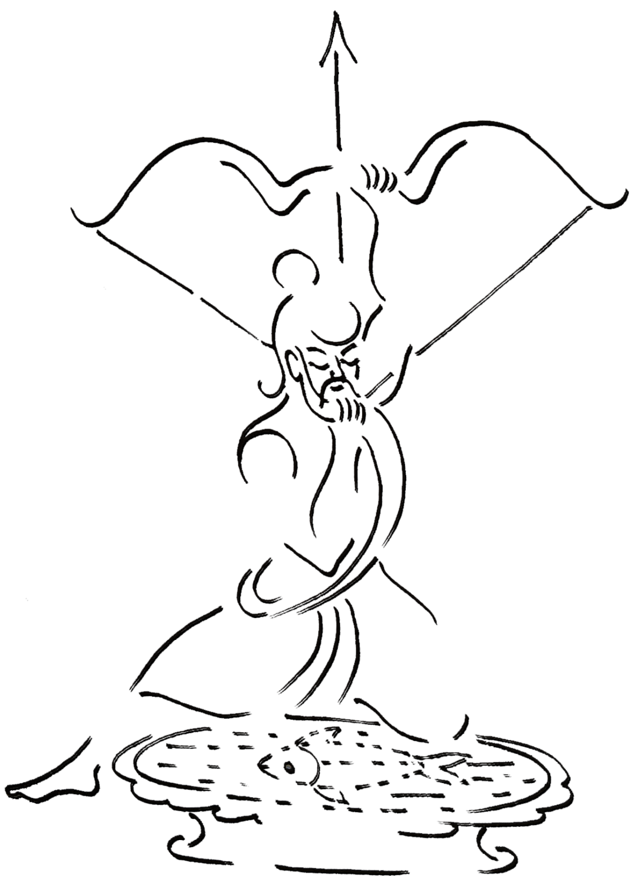

কৃষক বনাম কর্পোরেট • বাজেট -২০২১ • সাংস্কৃতিক/রাজনৈতিক সংগঠন

ব্যক্তি ও আর্থসমাজের আন্তঃবিশেষণ • ভাষা-সংস্কৃতির সমৃদ্ধি • গল্প • কবিতা

ক্রোড়পত্র : লক ডাউন পর্বের রচনা

পত্রিকা পরিচিতি

ভয়েস মার্ক

দ্বি-মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক : মোঃ আযাদ হোসেন

azadm1981@gmail.com

voicemark19@gmail.com

WhatsApp : 9932837185

গ্রাহক পরিষেবা: রনিক পারভেজ, ৯৩৭৮৪৮০১৯২

পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতি ও সম্পাদনা: মোঃ মিনারুল হক

নামলিপি ও প্রচ্ছদ চিত্র : হিমাদ্রী শেখর মজুমদার

স্বত্বাধিকার: ভয়েস মার্ক কালচারাল গ্রুপ

RNI Ref. Number: 1343240

ভয়েস মার্ক

দ্বি-মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক
মোঃ আযাদ হোসেন

প্রতি সংখ্যার মূল্য ২০ টাকা (বিশেষ সংখ্যা বাদে)
গ্রাহক চাঁদা সডাক ১০০ টাকা। যে কোনো সংখ্যা থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।
গ্রাহক পরিষেবায় যোগাযোগ : রনিক পারভেজ, ৯৩৭৮৪৮০১৯২

পত্রিকার যোগাযোগ স্থান
বহরমপুর : ৯৯৩২৮৩৭১৮৫
বর্ধমান : ৮১১৬২৭৯১৫২
বাঁকুড়া : ৯৩৭৮৪৮০১৯২
দ: ২৪ পরগণা : ৮৯২৬৭৪৪১৪০
উত্তরবঙ্গ : ৯৪৩৪৬৫৫৬১০

যোগাযোগ
ভগবানপুর, আষাঢ়িয়াদহ
লালগোলা, মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২১৪৮.
E-mail: voicemark19@gmail.com
Mob: 9932837185 / 9735874384

ভয়েস মার্ক

তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা। জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি ২০২১
(বিশেষ সংখ্যা)। ৫০ টাকা

সম্পাদক
মোঃ আযাদ হোসেন
voicemark19@gmail.com
WhatsApp : 9932837185

গ্রাহক পরিষেবা: রনিক পারভেজ, ৯৩৭৮৪৮০১৯২

নামলিপি ও প্রচ্ছদ চিত্র : হিমাদ্রী শেখর মজুমদার

মূল্য : পঞ্চাশ টাকা

মোঃ আযাদ হোসেন কর্তৃক ভগবানপুর, আষাঢ়িয়াদহ, লালগোলা, মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২১৪৮ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক কিস অফসেট প্রেস, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ ৭৪২১০১ থেকে মুদ্রিত।

সম্পাদকীয়
কৃষক বনাম কর্পোরেট ৩

সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ
কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২০-২১ ৪
সাংস্কৃতিক/রাজনৈতিক সংগঠন প্রসঙ্গে ৬

প্রবন্ধ
ব্যক্তি ও আর্থসমাজের আন্তঃবিশেষণ ৯
শ্রীচেতনিক
ভাষা-সংস্কৃতির সমৃদ্ধি ১১
আযাদ রহমান

গল্প
হীনমন্য ১৩
নির্মল চর ১৪
কস্তুরী
লকডাউনে রেশমারা ১৬
সুকৃতি
চরিত্র ২০
সুদীপ সরকার

কবিতা
কী হবে ভেবে ২৩
একটা কবিতা লিখতে চাই ২৩
অরুন চক্রবর্তী
প্রেম সংগ্রাম ২৪
দিল্লি চলো ২৫
রঞ্জন পাড়ুই

ক্রোড়পত্র
লকডাউন পর্বের রচনা

গল্প ২৭

কবিতা ১০৭

সম্পাদকীয় নিবন্ধ ১১৭

‘অস্তিত্ব’ প্রকাশিত গ্রন্থাবলি

১। অস্তিত্বঃ প্রবেশিকা (২১টি প্রবন্ধ)	১৫০.০০
২। অস্তিত্ব △ মানুষঃ দেহপূর্ব, দেহান্তপূর্ব এবং ... বর্তন ক্রমঃ এক	২০০.০০
৩। অস্তিত্ব △ মানুষঃ দেহপূর্ব, দেহান্তপূর্ব এবং ... বর্তন ক্রমঃ দুই	২০০.০০
৪। দেহমনের নিয়ন্ত্রণ এবং ...	১৩০.০০
৫। জীবন দিশারী ‘অস্তিত্ব’	৩০.০০
৬। মেধা প্রতিভা কি ভাগ্য (!) বাচক? কী তার লভ্য প্রযুক্তি?	১৫০.০০
৭। দাম্পত্য প্রযৌক্তিক পরিবার সমিতি	৩০.০০
৮। বস্তু প্রযুক্তি নির্মাণী ‘অস্তিত্ব’	২৫.০০
৯। সত্তার অর্গল ভাঙাটাই মনের দরজা খোলার রহস্য	৪০.০০
১০। শ্রমমূল্যের শান্তি রথ	১০০.০০

‘অস্তিত্ব’ প্রকাশেয় গ্রন্থাবলি

১। পূর্বপ্রসঙ্গ	১৬টি কলম
২। সৃষ্টিতত্ত্ব	২২টি কলম
৩। জীবনতত্ত্ব	৪৮টি কলম
৪। দেহতত্ত্ব	৮টি কলম
৫। জীবতত্ত্ব	১টি কলম
৬। ঋজুতত্ত্ব	৭৪০টি কলম
৭। সরেজমিন বা স্পটলাইট	একটি সিরিজ
৮। একসোডাস কল্লোল (কবিতা)	একটি সিরিজ
৯। অস্তিত্ব △ মানুষঃ দেহপূর্ব, দেহান্ত পূর্ব এবং ...	একটি সিরিজ

প্রকাশক: গাইডেন্স ফাউন্ডেশন
ফোন: ০৩৩-২২৮০-৬৭০৯/৫৫০৫
১৯৭ পার্কস্ট্রিট, কলকাতা-১৭, (পার্ক সার্কাস ময়দানের পাশে)
যোগাযোগ: ৯৮৩০০৬৯৫২৫
E-mail: emdadul197@gmail.com

সম্পাদকীয়

কৃষক বনাম কর্পোরেট

রক্ষকবলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বারে বারে একটি কথা ওঠে আসে। তার সমাধান হয়না। হবার কথাও নয়। কথাটি কী? কথাটি হল এই ব্যবস্থায় রাজনীতি ক্রীড়নক। নেপথ্যের বাজিকর সেই রক্ষ। তার বৈষয়িক যাবতীয় স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থাপক হল রাজনৈতিক নেতৃত্ব। স্বাধীনোত্তর ভারতে এই প্রতিপাদ্যটি বারেবারে উচ্চারিত হলেও রাজনীতির আঙিনায় থাকা ব্যক্তিদের মানে নেতাদের বা পার্টিগুলির ভূমিকার সাথে এই নেপথ্যের সম্পর্কটি পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠেনি। না ওঠার কারণ মিশ্র অর্থনীতি। রক্ষ এই অর্থনীতি প্রণয়ন করে নিজের গোপন চেহারাটি সামনে আনতে দেয়নি। রক্ষচালিত মুক্তবাজার অর্থনীতি প্রণয়নের পরেও গণ-জনতার কাছে তার রূপটি পরিছন্ন হতে না দেওয়ার জন্য কতই না 'ডোল' উপঢৌকন তাকে একে একে দিতে হয়েছে। যার সর্বশেষ প্রয়াস মনমোহন জমানায় নারেগা প্রকল্প সহ আরো এক গণ্ডা প্রকল্প। যার মোদ্দা কথা হল রক্ষ মুক্তবাজারকে তার চরমে নিতে গিয়েও নিতে পারেনি। জনকল্যাণের দায় নামক কথাটির আড়ালে সে আশ্রয় নিয়েছিল। ২০১৪ পরবর্তী সময়ে রক্ষের এই চেহারাটি অপসৃত হয়েছে। যদিও সে অতি ছলে 'লারজার দ্যান লাইফ' নেতার সর্বভারতীয় বা ইমেজ রূপে একজনকে খাড়া করেছে। তা সত্ত্বেও শেষ রক্ষা হয়নি।

হয়নি তার প্রমাণ সাম্প্রতিক কৃষক আন্দোলনে সরাসরি কৃষকরা আদানী বা আম্বানী কর্পোরেট গ্রুপের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে। কেবল বিক্ষোভ নয় ডাটা ট্রান্সপারেন্সি না হোক ডাটার ছড়াছড়ি যুগে রক্ষ তার তাবেদার রাষ্ট্রীয় রাজনীতির কাছে সেই ডাটা রক্ষা করতে পারছে না। তার দোসর সোস্যাল মিডিয়াও counter productive হয়ে তার exposure এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কৃষকরা পাঞ্জাব ও হরিয়ানার জিও টাওয়ার বন্ধ করে দিচ্ছে। এদের সিম বয়কটের আহ্বান জানাচ্ছে। পুঁজি গোষ্ঠীগুলি সমস্যায় পড়ছে। তাদেরকে সংবাদ মাধ্যমে বিবৃতি জারি করে বলতে হচ্ছে কৃষি আইনে তাদের কোনো হিস্যা নেই।

নয়া কৃষি আইনে দৃশ্যতই বাজার নিয়ন্ত্রণের যে ছিঁটেফোটা এতদিন বজায় ছিল তা তুলে দেবার ফন্দি করা হয়েছে।

কর্পোরেটদের হাতে কৃষক চুক্তি চাষিতে পরিণত হোক। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য আইন রদ করে মজুতদারিকে বৈধতা দেয়া- ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে সেই রাজনীতি যে কর্পোরেটের স্বার্থ রক্ষার্থে নিবেদিত প্রাণ তা প্রমাণ করছে। রাষ্ট্র তার সর্ব শক্তি দিয়ে এই স্বার্থ রক্ষার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। লারজার দ্যান লাইফ বা হৃদয় সম্রাট মঞ্চে মঞ্চে বক্তৃতা দিলেও কৃষককে বোঝানো যাচ্ছেনা। অর্থাৎ লড়াইটা রাজনৈতিক গ্রুপ বনাম কৃষক নয়। লড়াইটা কৃষক বনাম কর্পোরেট থেকে অন্য দিকে ঘোরানো যাচ্ছে না।

গত ছয় সাত বছরে যে যে পলিসিগুলি রাজনৈতিক নেতৃত্ব নিয়েছে আখেরে তা যে কর্পোরেট স্বার্থ রক্ষার্থে তা জনতার কাছে আর অধরা নেই। নোটবাতিল, জিএসটি, লকডাউন ইত্যাদির মধ্যে দিয়েও দেখা যাচ্ছে এই গ্রুপগুলি কয়েকশো গুণ মুনাফা করছে।

শত্রু আড়ালে গেলে তার বিরুদ্ধে লড়া যায়না। শত্রু প্রকাশ্যে। লড়াই তাই সহজ। আগামী দিনের নতুন ভারতবর্ষ সেই লড়াই গড়ে উঠবে কিনা তা নির্ভর করছে এই শত্রুর বিরুদ্ধে জনতাকে জ্ঞান-বিশ্বাস-সংগ্রামের হাতিয়ারে শাণিত করা যায় কিনা- তার উপর।

সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ

কর্পোরেট বান্ধব কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২১

শীতকালীন অধিবেশনের শুরুতেই অর্থমন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারামন ২০২১ সালের বাজেট পেশ করলেন। বাজেট পেশের আগেই দেশের অর্থনীতির হাল বিষয়ক আর্থিক সমীক্ষা প্রকাশিত হয়েছে। তাতে পরিষ্কার ছিল কয়েকটি বিষয়- ১। দীর্ঘ লক ডাউন জনিত কর্মহানিতে জনতার আয়হীনতা। ২। বেকারত্ব ৩। কৃষক অসন্তোষ। ৪। ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসার অবস্থা সঙ্গীন।

অর্থনীতির ডিম্যাণ্ড হীনতা করোনা মহামারির পূর্ব থেকেই ছিল। মহামারি জনিত লকডাউনে তা আরো নিম্নমুখী হতে হতে চরমবিন্দুর দিকে যাচ্ছে। মুক্তবাজার অর্থনীতির নিয়মেই চাহিদা সৃষ্টি করা অত্যন্ত দরকার। দরকার ১০০ দিনের মতো প্রকল্পের ব্যয়বরাদ্দ। জনতার হাতে অর্থের জোগান।

কিন্তু বাজেটে কী দেখা গেল?

একগাদা বাক্যালংকার মিশ্রিত কর্পোরেট আয় ব্যয় ও মুনাফার সালতামামি। ভোট জনিত লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সহ আরো কয়েকেটি রাজ্যের পরিকাঠামো ব্যয়বরাদ্দ বাবদ কিছু টাকা। কর্মসংস্থান গ্যারান্টি খাতের ৪২শতাংশ সংকোচন। কৃষিতে ব্যবহার্য পেট্রোপণ্যে নতুন সেস আরোপ। মধ্যবিত্তের ট্যাক্স সংক্রান্ত কোনো সুবিধা থাকল না। থাকল কী? যা থাকল- তা হল রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থাগুলির বিক্রি বাবদ টাকা তোলা।

গৌতম আদানি বাজেটের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। তিনি বললেন বাজেট অভূতপূর্ব। আত্মনির্ভর ভারত গড়ার লক্ষ্যে সঠিক পদক্ষেপ। জাতীয় স্বার্থেই পলিসি নেওয়া হয়েছে। ইনার কথা উল্লেখ করার কারণ এই নামটি বর্তমান সরকারটি ক্ষমতাসীন হবার পর থেকেই চর্চিত। বিরোধী দলগুলি সমস্বরে যে দুয়েকটি নাম ক্রোনি কর্পোরেট হিসেবে উল্লেখ করে তার মধ্যে এটিই সর্ব অগ্রগণ্য। তিনি ভারতীয় কর্পোরেটের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিত্ব। অর্থাৎ সরকার যে বাজেট পেশ করেছে, তা যে কর্পোরেটদের খুশি করছে তার কথাতেই তা প্রমাণিত। বিরোধী দলগুলি সরকারের বাজেটকে প্রো কর্পোরেট ও দেশীয় সম্পত্তির বিক্রির বৈধতা হিসেবে উল্লেখ করেছে। জনগণের হাতে টাকা দেয়া যেখানে ভঙ্গুর অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতো তার উল্টোটাই করা হয়েছে। গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি খাতে ব্যয় কমানো যার দৃষ্টান্ত।

অর্থনীতিকে বলা হয় রাজনীতির ঘনীভূত প্রকাশ। সেইজন্যই অর্থশাস্ত্রের জনকরা অর্থনীতি অর্থে পলিটিক্যাল ইকোনোমি কথাটি ব্যবহার করেছেন। সে অ্যাডাম স্মিথ বা রিকাডো কিংবা মার্কস হোন। অর্থাৎ অর্থনীতির আলোচনা রাজনীতি বাদ দিয়ে সম্ভব নয়। বা অন্যভাষায় রাজনীতির স্বরূপ অনুযায়ীই অর্থনীতির স্বরূপ খুঁজতে হয়। তাহলে ভারতীয় রাজনীতির স্বরূপটি কী? যা থেকে এখানের গৃহীত অর্থনীতির ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব?

তা হল উগ্র রিলিজিয়াস জাতীয়তাবাদ। এর নিজস্ব কোনো অর্থনীতিক মতাদর্শ নেই। কর্পোরেট মনোপলির সে পৃষ্ঠপোষক। এই উগ্র রিলিজিয়াস জাতীয়তাবাদকে টিকে থাকতে হলে দরকার জনগণের চরম বশ্যতা। এক নেতার প্রতি আনুগত্য। বশংবদ প্রেস। আর স্বার্থবাহী কর্পোরেট প্রতিভূ।

জনগণের চরম বশ্যতা অর্জন করা যাবে কীভাবে? জনগণের আর্থিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কল্যাণ হলে তা সম্ভব নয়। তাই সার্বিকভাবে জনতাকে দূর্দশাগ্রস্ত করতে হবে। যাতে বশ্যতা অনিবার্য হয়। সেই লক্ষ্যেই ২০১৪ থেকে গত ৭ বছর আর্থিক নীতিমালা প্রণয়ন হচ্ছে।

উল্লিখিত রিলিজিয়াস জাতীয়তাবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য

এলিটদের নিরঙ্কুশ বশ্যতা এবং গণমাধ্যম ও সেই এলিটদের সহযোগিতায় ব্যাপক জনতাকে সেই এক বগ্গা জাতীয়তাবাদের পক্ষে আসতে বাধ্য করা। এর অন্যথা হলেই দেশবিরোধী তকমায় বিরোধীকে গুড়িয়ে দেওয়া। পরিণামে দেশের বর্তমান ক্ষমতা যতই জনবিরোধী ও প্রোকর্পোরেট আর্থিক নীতি নিক না কেন তার বিরুদ্ধে শক্তিশালী বিরোধী রাজনীতি গড়ে ওঠাই মুশকিল। মুশকিল অন্য একটি কারণেও। সোভিয়েত ব্লকের পতনের পর নিওলিবারেল মতবাদের বিপরীতে পরিকল্পিত অর্থনীতি সমন্বিত রাজনৈতিক মতাদর্শ অনুসন্ধানহীনতা সেই কারণ। প্রকারান্তরে স্বাধীনোত্তর ভারতে বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে সেই নিওলিবারেল মতবাদের প্রতিক্রিয়ায় বর্তমান ক্ষমতা তখত এ আসীন। মানে তখনো ক্ষমতা প্রো কর্পোরেটই ছিল। কিন্তু কোথাও একটু চেকস এ্যাণ্ড ব্যালান্সের ব্যবস্থাও ছিল। তা যতই থাকুক, জনগণের জীবনমান তার দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। এরই ফাঁক গলে সেই অন্তঃসলিলা জনবিক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে বর্তমান উগ্র জাতীয়তাবাদ ক্ষমতা দখল করেছে। বর্তমান বাজেটের মত বিগত ৬ বছরের বাজেটেও একই রকম জনবিরোধী ও প্রোকর্পোরেট পলিসি প্রণয়ন হলেও জনতা ভূতপূর্ব নরম জাতীয়তাবাদকে সমর্থন করছে না। বা বলা যায় ক্ষমতা-হারারা জনগণকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার প্রায়োগিক নীতি -কৌশল প্রণয়ন করতে ব্যর্থ হচ্ছে।

এই ব্যর্থতা যত দিন বর্তমান ক্ষমতা তত দিনই নিরঙ্কুশ। অর্থাৎ চোরে চোরে মাসতুতো ভাই ছেড়ে ডাকাতে ডাকাতে পিসতুতো ভাই গ্রহণ করে জনগণের নাভিশ্বাস উঠলেও তার থেকে পরিত্রাণ নেই।

সাংস্কৃতিক/ রাজনৈতিক সংগঠন প্রসঙ্গে

(১) সংগঠন কী

সম্যক রূপে গঠিত যা। কী? ব্যক্তি সমূহের যূথ। তা সংগঠন হতে গেলে তাকে সম্যক রূপে গঠিত হতে হবে। তবেই তা অভিষ্ঠ ফল দেবে। অন্যথায় নয়। ব্যক্তি সমূহ বা ব্যষ্টিকে সংগঠিত সমষ্টিতে রূপ দেবার প্রয়োজন কী?

(২) সংগঠন কেন?

ব্যক্তি একক ভাবেই জীবনের ভোগ বা দুর্ভোগ পোহায়। কিন্তু তার এই ভোগ/দুর্ভোগের যে জীবনটি সে যাপন করে তার ভিত্তি হল শ্রম-উৎপাদন-মূল্য। যা সে একক ভাবে সম্পন্ন করতে পারে না। সেখানে তাকে শ্রমের বিনিময় করতে হয়। না হলে তার জীবন চলে না।

যেমন, সে শিক্ষক। স্কুলে বিদ্যার্থীদের পড়ানো তার কাজ। সে শ্রম দিল। বিনিময়ে কিছু অর্থ পেল। অর্থে তো পেট ভরবে না। তার চায় পেট ভরানোর জিনিস। চাল, ডাল, তেল, নুন, চিনি, সাবান হরেক জিনিস। তার চায় দেহাচ্ছাদনের পোশাক। তার চায় মাথা গুজবার ছাদ। তার চায় বিনোদন এর হরেক সামগ্রী। এগুলি সে শ্রম দিয়ে তো ফলায়নি। অন্যে শ্রম দিয়ে ফলিয়েছে। অনেকে করেছে। একজনে নয়। তার মানে কী দাঁড়ালো? না, শ্রম প্রক্রিয়ায় যুক্ত হলেই মানুষ আর একক বা স্বতন্ত্র থাকে না। সে অনেকক বা সমষ্টি বা সমাজে যুক্ত হয়ে যায়। সে না চাইলেও তাকে সামাজিক হতে হয়। অর্থাৎ কী দাঁড়াল? শ্রম প্রক্রিয়ায় ব্যক্তিকে যুক্ত হতে হয় বেঁচে থাকার তাগিদে। কিন্তু শ্রমপ্রক্রিয়াটা সামাজিক। অথচ সামাজিক এই শ্রমের সুতো থেকে মূল্য আহরণ করে তা কীভাবে সে ভোগ করবে বা আদৌ কিছু ভোগ করবে না সেটিতে সে পৃথক। স্বতন্ত্র। এখানে সে সামাজিক নয়।

মুশকিল টি কী? মুশকিল হল ঠেলায় পড়ে সামাজিক শ্রমক্ষেত্রে অংশ নিতে বাধ্য হলেও সেখান থেকে উৎপাদিত মূল্যের বিভাজনটি কি সামাজিক হয়? হয় না। কেন হয় না?

এই কেনটির উত্তর পেলে জীবনের অনেক কিছুরই উত্তর পাওয়া হয়ে যায়।

সেটি কী? যে লোকটি শ্রমে অংশ নিতে গেল সে কী সাথে নিয়ে গেল? দুটি জিনিস। এক, তার দেহ, দুই, তার মন। মানে তার রইল একটি দেহ-মন। যাকে সত্তা বলতে পারি। দেহমন যুক্ত এই ব্যক্তিসত্তা সামাজিক শ্রমে অংশ নিচ্ছে। এই সত্তার বৈশিষ্ট্য কী? এর বৈশিষ্ট্য হল সে আত্মকেন্দ্রিক। আত্মকেন্দ্রিকতায় সে উৎপাদিত মূল্যের সমস্তটায় দখল নিতে চায়। তাতে তার প্রয়োজন থাক বা না থাক। এ তার মজ্জাগত। যার পরিণামে উৎপাদিত মূল্য যেহেতু সীমায়িত, একজনের জবর দখল মানে অন্যের অপ্রাপ্তি, মানে অধিকার হরণ। এই অধিকার হরণের ক্ষমতা সবার সমান নয়। সেই জন্য শ্রমে উৎপাদিত মূল্যের সামাজিক অংশ অর্থাৎ উদবৃত্তের দখলদারিত্ব আজকের দিনে যেমন গুটিকয়েক কর্পোরেটের হাতে।

তার মানে একই সমাজে সকলে শ্রম দিলেও কারুর জুটছে কারুর জুটছে না। তাহলে ভোগান্তি। এই ভোগান্তিতে যে ভোগে সে অশান্তিতে পড়ে। যে ভোগায় সেও শান্তি পায় না। তাহলে কী হয়? সমাজ অশান্তিতে ভোগে। এই অশান্তির আগুন থেকে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যই দরকার সম্যক ভাবে গঠিত দল বা সংগঠন। যা এই সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির শান্তি ও নিরাপত্তার গ্যারেন্টার। অর্থাৎ সংগঠনই একমাত্র মানুষকে নিরাপত্তা দিতে পারে।

(৩) সংগঠনকে সম্যক ভাবে গড়ে তুলতে হয় কেন?

সংগঠন ভঙ্গুর হলে তার কার্যকারিতা থাকে না। আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিরা তার দখল নিয়ে নেয়। অশান্তি উৎপাটনে তার কোনোই ভূমিকা থাকে না। উলটে সেই সংগঠনই আর্থসমাজকে যাতনা দেয়। সেই সংগঠন কর্তৃক আর্থসামাজিক ক্ষমতা কব্জা হয়ে গেলে কী হয়

তা সমকালীন রাজনৈতিক দলগুলোর দিকে তাকালেই বোঝা যায়। সেই জন্য সংগঠনকে সম্যক হতে হয়।

(৪)কীভাবে সংগঠন সম্যক হবে?

তার প্রথম শর্ত আদর্শ। কোন আদর্শে ব্যক্তি সংগঠিত হবে? কী তার থিয়োরি? সেই তত্ত্ব যুগের প্রেক্ষাগত। প্রশ্ন উঠবে বস্তুগত আদর্শ কি যুগে যুগে আলাদা? না, আলাদা নয়। কিন্তু তার প্রযুক্তি আলাদা। তাহলে আদর্শটি কী? আদর্শটি হল শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব। তার মর্ম? অচেতন-চেতন-দ্বন্দ্ব-দহন-মুক্তি ও অধিষ্ঠান চেতনিক এই বিবর্তনে ব্যক্তি চেতনার অধিষ্ঠান, আর আর্থসমাজিকভাবে তার প্রতিষ্ঠানী বাস্তবতা। চেতনিক এই বিবর্তনে অংশ নেয়া প্রতিটি ব্যক্তিই সেই সংগঠনের কর্মী যার চরিত্র দ্বান্দ্বিকতা বিশেষিত।

যে দ্বন্দ্বের একমেরুতে নেগেশন, অপর মেরুতে অ্যাফারমেশন। মানে একমেরুতে আত্মকেন্দ্রিকতা অন্যমেরুতে আত্মবিকেন্দ্রিকতা। সংগঠনে গ্রোথিত হয়ে ব্যক্তি তার আত্মকেন্দ্রিকতায় লাগাম দিয়ে আত্মবিকেন্দ্রকিতায় নিজের বিকাশ ঘটায় এবং বৃহত্তর আর্থিসামাজিক লক্ষ্য অর্জনে সবরকমের ত্যাগ স্বীকারে ব্রতী হয়। যে সংগঠনের নেতৃত্বও দেয় সে। নেতৃত্ব যূথের গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন দায়িত্বও নেয় সে। এখানে ব্যক্তিক সেন্টিমেন্ট যেমন পরস্পরের প্রতি ইগো, সন্দেহ, ঈর্ষা, ঘৃণা সহ সব ধরনের কাতরতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়েই সে সেই ডেডিকেশন অর্জন করে।

আর এই ধরণের ব্যক্তি সমূহের যূথ অর্থাৎ সংগঠন হয় নিশ্ছিদ্র। যা আর্থসামাজিক নেগেশন অর্থাৎ রক্ষণকামিতার বিরুদ্ধে বিজয় অর্জনের যোগ্যতা রাখে।

(৫) সংগঠনের কর্মীবাহিনীর দ্বান্দ্বিকতা অর্জনে গৃহীত কর্মসূচি কি রাজনৈতিক/ সাংস্কৃতিক?

সাংস্কৃতিক কর্ষণেই এগজিস্টিং (Existing) রক্ষ চালিত আর্থসমাজের স্বরূপ চিহ্নিত করণ হয়। তাই সংগঠন গড়ে ওঠার প্রাক পর্যায়ে দীর্ঘ আর্থসমাজ সংস্কৃতির অধ্যয়ন অনুশীলন পর্ব। এই পর্বেই তত্ত্ব আহরণ ও তার অধিকৃতির অনুশীলন করতে হয়। সংগঠন গড়ে ওঠা থেকেই তার কর্মসূচিতে যুগপৎ সংস্কৃতি ও রাজনীতি দুই-ই থাকতে হয়। কারণ সংস্কৃতিহীন রাজনীতি মানেই রক্ষের কারবার। রাজনীতিহীন সংস্কৃতি বলে কোনো বিষয় বস্তুবিজ্ঞানে নেই। এককথায় প্রথম পর্বে যে সংস্কৃতিশীলন তা আসলে শিল্প রাজনীতি মানে পরোক্ষ রাজনীতি। আর পরবর্তী অধ্যায়ে পরোক্ষ-প্রত্যক্ষ যুগলের যোগেই যুগরক্ষ কব্জা হয়।

তাই প্রাক পর্বের ভ্রূণ চর্চাতেই পরবর্তী পর্যায়ের অভিষ্ঠ ফল লাভ করা যায়। সাংগঠনিক নেতৃত্ব একথা স্মরণে রেখেই কর্মসূচির রূপরেখা প্রণয়ন করেন। উদাহরণ, লেনিনীয় নেতৃত্বে সোভিয়েত সংগঠনের সফলতা। কিন্তু মাও নেতৃত্বে সংস্কৃতি-রাজনীতির পূর্বাপর গুলিয়ে যাওয়ায় পরের পর্বে স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক কর্মসূচি নেওয়া হলেও তা ব্যর্থ হয়।

(৬) প্রাক-পর্বের কর্মসূচির প্রধান প্রধান দিকগুলি কী কী?

এর অঙ্গসংস্থানের গোড়াটাই হল ফাইন আর্টস চর্চা। যাতে হৃদয়বৃত্তি ও মস্তিষ্ক বৃত্তির যুগপৎ সাধনায় ব্যক্তি চরিত্র ব্যক্তিকতা বর্জনে অবজেকটিভিটি মুখীন হতে পারে। সুকুমার বৃত্তির চর্চায় ব্যক্তি তার অভিব্যক্তির যথার্থ প্রকাশে সক্ষম হয়।

এতে করে গণচরিত্র সংক্রমণী নিম্ন বিশেষণগুলি বর্জিত হয়ে ক্রমান্বয়ে জন ও রণ চরিত্র অর্জিত হয়। উল্লেখ্য যে গণ চরিত্র ভাসমান। জন গণের থেকে পৃথক হলেও বা প্রশ্নবাচক চরিত্র অর্জন করলেও সিদ্ধান্ত নিতে পারেনা। রণ চরিত্রই সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা রাখে। তাই এ পর্যায়ে সুকুমার বৃত্তি চার্চিক ব্যক্তির লক্ষ্য রণচরিত্র অর্জন অর্থাৎ নিজেকে নৈর্ব্যক্তিকতামুখীন করা।

ফাইন আর্টস এর বিভিন্ন আঙ্গিকের যথা সংগীত, নাটক, গল্প, অভিনয় ইত্যাকার মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশের সুযোগ তৈরি করা।

একই সাথে জ্ঞান-বিশ্বাস-সংগ্রাম প্রত্যয়ে নিজেকে শক্ত করার লক্ষ্যে ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান বিষয়ে নিরলস অধ্যয়ন কর্মসূচি। যা স্টাডিগ্রুপ

গড়ে তোলার মধ্যে দিয়ে খুব সহজেই করা যায়।

রক্ষণকামী ক্ষমতার দখল দারিত্ব প্রকট রূপে আসে অর্থনীতির সবটা পূর্ণ দখল দারির মাধ্যমে। তাই প্রতিটি কর্মীর জীবনপাঠে অর্থনীতির পাঠ অতি আবশ্যক। অর্থনীতির বস্তুগত রিডিং বিহীন কোনো কর্মী সংগঠনের কোনো কাজে আসে না।

(৭) সংগঠনের একক হিসেবে ব্যক্তি কীভাবে অগ্রসর হবে?

- জ্ঞান-বিশ্বাস-সংগ্রাম তত্ত্ব প্রযুক্ত হয় জ্ঞান-শ্রম-যৌনতার ধারায়। মানে কী? মানে যে লোকটি সাংগঠনিক একক সে শ্রমে অংশ নেবে। রক্ষকবলিত আর্থসমাজ থেকেই মূল্য সংগ্রহ করবে। মূল্যের বিভাজন করবে। আবশ্যিক রেখে উদবৃত্ত সোশ্যাল ট্রাস্টে অর্পণ করবে।
- শ্রমসিক্ত ব্যক্তির জীবন সিঞ্চনী বিধায় তার যৌন জীবনও অতিগুরুত্বপূর্ণ। কারণ মূল্য বিভাজিত হলেও যৌনজীবনহীন যে শ্রম অস্তিত্ব বিজ্ঞান অনুযায়ী তা স্থানু। অর্থাৎ যৌন জীবনহীনতা ব্যক্তি চরিত্রে বস্তুমুখীন ঋজুতা আনতে দেয়না। ফলে সে নেতৃত্বে অযোগ্য হয়ে পড়ে। তাই এদিকটিও সবিশেষ গুরুত্বে দ্রষ্টব্য।
- রক্ষ অধিকৃত সমাজের চলতি যত ধারণা-সংস্কার-ট্রাডিশন তার সমূল উৎপাটন। এই মূলোচ্ছেদ প্রক্রিয়া জ্ঞান-বিশ্বাস-সংগ্রাম এষণায় সংঘটিত করতে হয়। তার কর্মসূচি নেতৃত্বকে প্রণয়ন করতে হয়।
- ধারণা মূলোচ্ছেদ হলেই থেকে যায় দেহের বাধা। সেখানে লুক্কায়িত জড়। যার সংক্রমণে ব্যক্তিচরিত্রে জড়বাদি তাতক্ষণিকতার উপসর্গ আসে। তাই দেহ-মন নিয়ন্ত্রণ করার প্রকৌশল ছাড়া ট্রাডিশন বর্জিত হলেও ব্যক্তি চরিত্রে যথার্থ নেতৃত্ব-যোগ্যতা অর্জিত হয়না। এখানে অত:পর প্রয়োজন প্রাত্যহিক দেহ-প্রবন্ধ কর্মসূচির। যা অত্যাবশ্যকীয়। এই কর্মসূচিতে দেহমনের বলিষ্ঠতা অর্জন হলে জড় তাৎক্ষণিকতা সংক্রমণ রোধ করা যায়।

(৮) কথার শেষে

শ্রমসিক্ত জীবনের গতি আমাদের হাতেই। আমরা তা নিজের হাতে রাখব নাকি রাক্ষসের হাতে তুলে দেব সেই দায়ও আমাদেরই।

গণ-জন-রণের একক সমাহার রূপ আর্থসমাজের শান্তি হরণকারী শ্রমচোর কর্পোরেটি দাপটকামিতা আর তার দোসর সমকাল ক্ষমতা চক্রকে বুকের উপর থেকে নামাতে গেলে বস্তুভিত্তিক সংগঠনে সংগঠিত হতেই হয়। এর কোনো বিকল্প মানব জাতির জীবনে নেই।

তাই সে সংগঠনের একক হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে আলোচ্য লেখাটি আপনার অনুভূতিতে সামান্য আঁচড় দিতে পারলেই শ্রম বিফল হয় নি বলেই বিবেচিত হবে।

প্রবন্ধ

ব্যক্তি ও আর্থসমাজের আন্তঃ বিশেষণ

শ্রীচেতনিক

তা হল আমিত্ব। ব্যক্তিসত্তার না বাচকতা ও হ্যাঁ বাচকতার দ্বন্দ্বে যাকে বার করে আনতে হয়। যা নৈর্ব্যক্তিকতামুখীন চেতনাগত বাস্তবতা। এই চেতনা যখন সমাজ ও ব্যক্তির জীবনের নির্ধারক ভূমিকা নেয় তখনই আর্থসমাজে স্বর্গ রচিত হয়।

যেমন উনবিংশের সোভিয়েত। যেখানে লেনিনীয় আমিত্ব সাধনায় রাশিয়ান মুক্তি অর্জিত হল। যেমন চীন, ভিয়েতনাম বা পৃথিবীর আরো অনেক জনপদ। আর এসবের বহুপূর্বে ইসলামের মক্কাবিজয় সেই আমিত্ব সাধনায় অর্জিত চেতনা বস্তুত্বেরই আর্থসামাজিক কীর্তি।

এত উপরের কথা হল। ভেতরের কথাটি কী। দেখা যাক। শ্রমবাচক সুতোতেই ব্যক্তি আর্থসামাজিক। তাতেই তার দেহমনগত এগজিস্টান্স। শ্রমবাচকতায় উৎপন্ন দ্রব্যের দখল প্রসঙ্গেই তার সত্তার তলদেশ পরিষ্কার নজরে আসে। যখন তার উৎপাদক রূপ স্রষ্টাচরিত্র হারিয়ে কুক্ষিবাচক রূপ গণেশ চরিত্রে সে সংক্রামিত হতে থাকে। পরিণামে কুবেরের আওতায় উৎপাদিত সম্পদ ধনরূপে কুক্ষীগত হয়ে আর্থসমাজের কোনোই কাজে আসেনা। শক্তি সীমাবদ্ধতায় এই দখল প্রবণতা ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় অধিকাংশ সত্তায় দখলকাম হলেও দখলবর্জিত রয়ে যায়। বিলাস-দারিদ্র্য সংক্রমণ। যেখান থেকে সন্ত্রাস। তার থেকে আসে সংক্রমণী যৌনবৃত্তি, উঞ্ছবৃত্তি, ভিক্ষাবৃত্তি ইত্যাদি। ব্যক্তি ঐ শ্রমবাচক সুতোর গ্রন্থিতে গাঁথা থাকলেও, তাতে শ্রম দিলেও মূল্যহীন জীবন যন্ত্রণায় ককাতে থাকে। এই ককানি থেকে মুক্তিবাচক অভীপ্সায় সে কোনখানে যাবে? ভেতরে না বাইরে? বাহির তো সেই ককানি বাস্তবতা। অতএব ঘর থেকেই তাকে এগোতে হয়। ঘরে কী দেখবে সে? কীভাবেই বা দেখবে? অর্গলবদ্ধ যে ঘরে তার প্রাণভোমরা বন্দি সেখান থেকে তাকে বের করে আনতে সে তখন অগ্রসর হয়। ডুব দেয় নিজ সত্তায়। অবলোকন করে চোর এবং চোরামি। চোর ধরে। বন্দি করে। জ্ঞাতা স্থিত হয়। কী নিয়ে সে বাইরে আসে? বাইরে আসে তারই চেতনা নিয়ে। যে ছিল বন্দি সত্তা-কারাগারে। প্রবৃত্তির অন্ধকারে। সেই চেতনা তখন আর্থসমাজকে বিবর্তিত করে প্রগতির ধ্বজা উড়ায়। জ্ঞান-বিশ্বাস অর্জনে সংগ্রামী এষণায় সমাজ তখন নতুন সাজে সজ্জিত হয়। এটাই ইতিহাস। এই ইতিহাস নিমার্ণী বাস্তবতায় জ্ঞান তথা তত্ত্ব প্রায়োগিক কৃৎকলায় রাজনীতিতে রূপ নিলেই ব্যক্তি ও আর্থসমাজের বস্তুলব্ধি ঘটে। যার উদাহরণগুলি প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে।

আমি, আমিত্ব, বস্তু

আমি একটি শক্তি। দেহের পদার্থ অপর শক্তি। দুই শক্তি বিশিষ্ট মানব সত্তা। এই আমি শক্তি দেহের শক্তির কবলগ্রস্ত হয়েই মানব শিশুর ভ্রূণ। দেহগঠনের ক্রমপর্যায়ে শিশুর প্রাকৃতিক স্তর পরবর্তী সত্তার জাগরণ ঘটে। এই জাগরণেরই ক্রমে ফুলের সৌরভ আর বৃশ্চিকের দংশন দুই-ই মালুম হয়। মালুম এর গোড়ার কথা এই আমিত্ব। যা আমির-ই বিশেষণ। আমি দ্বি-ধা। আমিত্বহীন আমি, আর আমিত্বময় আমি। আমিত্বহীন আমিতেই ঘটে রক্ষণকামী পূর্বোল্লোখিত চৌর্য্য। আর চোর ধরার প্রযুক্তি অর্জিত হয় আমিত্বময় আমিতে। আমিত্বহীন আমি বস্তু অর্থাৎ সত্য থেকে দূর ব্যবধিত। আমিত্বময় আমি বস্তু সমন্বিত। বস্তু সন্নিকট।

বস্তু কী? অস্তিত্বের জবাব- বস্তু তাই যা চর্চা করলে উন্নত হয়, না করলে সুপ্ত হয়ে যায়। তখন রক্ষণকামী আবর্তে আমির কী হাল হয়? তা আজকের বিশ্বের দিকে তাকালেই স্পষ্ট হয়।

আমিত্বহীন আমির প্রথম ধাপে আমিত্ব বিস্মরণ ও পরবর্তীতে আমিত্ব প্রতারণা মজ্জাগত হয়ে যায়। যার প্রায়শ্চিত্ত করা যায় না। এই প্রায়শ্চিত্ত অযোগ্য আমি বস্তু অর্থাৎ সত্যকে বুড়ো আঙুল দেখায় সেই সত্যেরই নাম করে।

বস্তুতত্ত্বের ভেদক

এই বস্তুতত্ত্ব কে ভেদ করে? ভেদ করেন ব্যাস। কেমন করে করেন? না, জ্ঞান-বিশ্বাস-সংগ্রাম প্রযুক্তিতেই করেন। তার প্রথমেই থাকে ঐতিহ্যের ধারণা মুক্তি। পরবর্তীতে জড়ের আকর্ষণ মুক্তি। চেতনায় রা-ধা প্রযুক্তি ব্যতিরেকে যা সম্ভব নয়। যার তত্ত্বকাহিনি পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত তথা ভারতীয় দর্শন।

চেতনার এই রা-ধা প্রযুক্তি আর্থসমাজে প্রযুক্ত না হলে আমি মুক্তি পায় না। অচেতন সত্তার ঘুম ভাঙানীতে চেতন, তাতে দৃষ্টি নিক্ষেপে নিবিষ্টতা, আমিত্ব অবলোকনে স্বীয় আমিত্ব প্রীতি, সেই আমিত্ব যন্ত্রণার কারণ যে নাস্তি তাকে দ্বন্দ্বে আহ্বান, নাস্তির দহনেই অর্জিত সেই চেতনার মুক্তি। আর মুক্ত চেতনার স্তর অতিক্রমে অনাপেক্ষিকতায় অধিষ্ঠানই ধা। চেতনার এই প্রযুক্তি চেতনায় অধিষ্ঠানেই যার পূর্ণত্ব। অধিষ্ঠিত চেতনার আর্থসামাজিক প্রতিষ্ঠা না ঘটলে আর্থসামাজিক রক্ষণকামিতা তাঁকেও জ্বালাতে ছাড়ে না। যেমন ছাড়েনি আহম্মদকে। ছাড়েনি চেতনা-নিকট লেনিনকে। তাই আমির এই পুরাণে অর্জিত আমিত্বকে আর্থসমাজে বর্তন করাতে হয়। যা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ।

এই পুরাণকার তখন কী করেন?

ব্যক্তি ও তার আর্থসমাজের বিশেষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। বৃন্দাবনী রণকৌশলে সরস্বতী হয়ে আর্থসমাজকে জাগিয়ে তোলেন। প্রভঞ্জনী ক্ষিপ্রতায় সংস্কৃতির ভিত ব্যবহারে রাজনৈতিক কৃৎপ্রজ্ঞার পরিচয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেন। এ দ্বিতীয় ইতিহাস।

প্রথম ইতিহাস চেতনার রা-ধা অর্জন। আর তাতেই দৃষ্ট মহা-আমির মহা আমিত্বিক মহা নিয়ম। সেই দর্শনে দৃষ্ট চেতনার অধিষ্ঠিতি মানে চেতনিক বিপ্লব। এই বিপ্লবেই লাভ হয় জ্ঞান-দর্শন-সাহিত্য। যা আর্থসমাজে শ্রমমূল্য বিন্যাসনী বাস্তবতায় প্রযুক্ত হলে ঘটানো যায় আর্থসামাজিক বিপ্লব। যা আর্থসামাজিক ইতিহাস সৃষ্টি। উল্লেখ্য যে, মার্কসীয় তত্ত্ব অর্জন সেই প্রথম ইতিহাসেরই আপেক্ষিক দৃষ্টান্ত। আর সেই তত্ত্বেরই আর্থসামাজিক প্রযৌক্তিকতায় ইতিহাস সৃষ্টির দৃষ্টান্ত সোভিয়েত প্রতিষ্ঠা। যেখানে মার্কসীয় বৃন্দাবনী ট্যালেন্ট লেনিনীয় প্রযুক্তিতে আর্থসমাজকে মুক্ত করে।

ভাষা-সংস্কৃতির সমৃদ্ধি

আযাদ রহমান

ভাষা অনুভূতির প্রকাশক। অনুভব যত তীক্ষ্ণ যত তীব্র যত গভীর ভাষার ব্যঞ্জনা তত সমৃদ্ধ। ভাষার সমৃদ্ধি তাই সেই জাতির উন্নততর যার অনুভূতি চর্চা সূক্ষ্মতর।

উদাহরণ-১। ভারতীয় জীবন ধারা

বৈদিক আর্য জীবন চর্চা সঞ্জাত ভাষা। এই জীবন চর্চার গোড়াতে সন্ধানী দৃষ্টি ফেললে দেখা যাবে পূর্বেকার নগর সভ্যতার শোষণ যন্ত্রণার বিরুদ্ধে কৃষিভিত্তিক উৎপাদকের সংগ্রাম। যাতে দস্যু অর্থাৎ লুঠেরা পরাজিত হয়। গড়ে উঠে সেই সাহিত্য ব্যঞ্জনা যা চিরায়ত মর্যাদার অধিকারী। পুরাণ, বেদ, উপনিষদ আর মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত।

এই চিরায়ত তত্ত্ব কাহিনী ও তত্ত্বসিদ্ধান্ত সমূহ পরবর্তী জেনারেশন এর অনুভূতি চর্চা অর্থাৎ জীবনচর্চাহীনতায় অসার, অলৌকিক পুরনো যুগের গল্প-কাহিনিতে অবনমিত হয়। সমকালীন ক্ষমতা-চক্র তাতে রক্ষণকামী প্রক্ষেপণ ঘটিয়ে তাকে আরো জঞ্জাল করে তোলে। একই সঙ্গে ভাষার সেই অর্জিত সমৃদ্ধি ক্ষয় পেতে পেতে বর্তমান সময়ে এসে তা মৃত ভাষায় রূপ নিয়েছে।

নানান গল্প-কেচ্ছার জঞ্জাল সরিয়ে ভারতীয় জীবন বোধের নির্যাস সেই সাহিত্য থেকে আহরণ করতে হলে প্রয়োজন অনুভূতির সূক্ষ্মতর গভীরতর অনুশীলন। যা আর্থসমাজ সংস্কৃতি তথা রাজনৈতিক স্পন্দনহীন শ্যাওলায় মজে থেকে সম্ভব নয়।

সমকালীন আর্থসামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় শ্রম-মূল্য ভিত্তিক জীবন জিজ্ঞাসা থেকেই সেই অনভূতির চর্চা হয়। যা আখেরে আর্থসমাজ সস্কৃতির মান বাড়ায়। আর তার প্রকাশক ভাষাও তত সমৃদ্ধ হয়। অন্যথায়, সমকাল রক্ষণকামী ক্ষমতা চক্র উল্লিখিত জ্ঞান-দর্শন প্রজ্ঞার সংকলনকে ঐতিহ্যের অনড় স্তূপের সেন্টিমেন্ট হিসেবে সংক্রমণ করে। ব্যাক টু হিসটোরিক্যাল পাস্ট এর স্লোগান দেয়। যার ফেরে পড়ে গণমানস জ্ঞান-প্রজ্ঞার সংকলিত নির্যাস দূরের কথা সমকাল জীবন যন্ত্রণার কারণ অনুধাবন করতেও পারেনা। বাজিমাৎ করে রক্ষ।

আর কী করে? আর্থসমাজ সংস্কৃতিকে পাঁকে নামায়। সন্ত্রাস করে। যা ভাষা সন্ত্রাস রূপেও আসে। যেমন সম্প্রতি 'এক দেশ এক ভাষা এক ধর্ম' স্লোগান। যা কোনো একটি জনপদের আর্থসমাজ সংস্কৃতির সমৃদ্ধির প্রধান উপাদান ভাষাকে সংকুচিত করে। এহেন সন্ত্রাসের আবহে নাগরিক 'অস্তিত্ব' বর্ণিত তার ভাষা-সংস্কৃতি রূপ বৃদ্ধাঙ্গুল কেটে ফেলতে দেবে নাকি তা শক্তিশালী করার আন্তসংগ্রাম শুরু করবে তার উপর নির্ভর করে তার জীবনের মান।

উদাহরণ-২। ইসলাম

ভারতীয় জীবন ধারায় যে অনুভূতি চর্চা সমৃদ্ধ ভাষা সংস্কৃতির সৃজন করেছিল, বস্তু বিকাশের সেই একই ধারায় মধ্যপ্রাচ্যের প্রকৃতি জিজ্ঞাসার পূর্বতন নিদর্শন সহ সেই অনুভূতি চর্চা খন্ড-বিখন্ড গোষ্ঠী জীবনের দুরাচার আর শোষণী শ্রম-সম্পর্ককে অস্বীকার করে আর্থসামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিল রাসুলুল্লাহর নেতৃত্বে। আলকোরানিক জ্ঞান-বিশ্বাস-সংগ্রাম তত্ত্ব যে শান্তি প্রতিষ্টার ভিত। সেই ভিত অর্জন সেই অনুভূতি চর্চার সূক্ষ্মতম গভীরতম স্থান স্পর্শ করেই সম্পন্ন হয়েছিল। যার পরিণতিতে অতি সমৃদ্ধ ও সাহিত্য ব্যঞ্জনা যুক্ত আরবি ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল। হযরত আলি পরবর্তী রক্ষণকামী ক্ষমতা চক্র আর্থসামাজিক সাংস্কৃতিক সেই জীবন চর্চাকে ব্যাহত করার ভয়ঙ্কর চক্রান্ত করে। যাতে বস্তু অর্থাৎ সত্য অর্থাৎ অনুভূতির সেই চর্চা বন্ধ করে আর্থসমাজকে বেঁধে ফেলা যায় অনড় অচল এক অচলায়তনে। রীতি আর সংস্কার যেমন ভারতীয় জীবনবোধকে পর্যুদস্ত করেছিল, ঠিক

তেমনি বিকাশ বিরোধী রীতি-সংস্কারের জঞ্জাল বুনে আর্থসমাজ সংস্কৃতির পজিটিভ প্রবাহকে দূষিত করে ফেলা হল। গণমানস এমন এক ভেলকিতে দিশাহারা হয়ে গেল যা থেকে আজও তার মুক্তি ঘটেনি। পরিণামে প্রথম দিকের সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শনের পথিকৃৎ সভ্যতা ক্রমে জড়ভোগের এক জঞ্জালে রূপ নিয়েছে। ভাষা-সংস্কৃতি তার হয়ে গেছে অনড় অচল জীবন বিরোধী মৃতপ্রায়।

এই মৃতপ্রায় জীবন থেকে বেরোতে গেলে তাই দরকার সত্তামন্থনী জীবন জিজ্ঞাসার চর্চা। সেখান থেকেই আলকোরানিক জ্ঞান-দর্শনের মূল্য আবিষ্কৃত হতে পারে। আর তা হলেই দেখা যাবে আর্থসমাজ সংস্কৃতির সমৃদ্ধ রূপ।

উদাহরণ-৩। কম্যুনিজম

ভারতীয় দর্শনের আর্থসামাজিক প্রয়োগহীনতা আর আলকোরানিক দর্শনের প্রায়োগিক বস্তুবিচ্যুতি পৃথিবীতে জীবন দর্শন শূণ্যতা সংক্রামিত করে। জাকাত তত্ত্ব প্রয়োগ বন্ধ হয়ে যায়। সেখান থেকেই সেই একই বস্তু জিজ্ঞাসার পরিণতিতেই মার্কসীয় দর্শন উদবৃত্ত মূল্য তত্ত্ব নিয়ে উঠে আসে। যা আর এক সমৃদ্ধ ভাষা-সংস্কৃতির প্রাঞ্জল প্রবাহের নিদর্শন। এই দর্শনের প্রয়োগ কেন্দ্রিক যে সোভিয়েত তত্ত্ব তাও সেই ভাষা ও সংস্কৃতিকে উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত করে। সোভিয়েত ভাষা সংস্কৃতি পৃথিবীর গবেষণার বিষয় হয়। জার সাম্রাজ্যের অচলায়তন ভেঙেই যার উত্থান।

কিন্তু অর্থনৈতিক নিয়তিবাদে মার্ক্সবাদকে অধঃপতিত করেই রক্ষণকামিতা সোভিয়েতকে পরাজিত করার চক্রান্ত করে। সফল হয় গত শতকের নয়ের দশকে। ইউরোপ সহ গোটা পৃথিবী পড়ে যায় রক্ষণকামের নয়া রূপ পোস্ট মডার্ন খপ্পরে। যেখান থেকে উঠে আসে পোস্ট ট্রুথ, অ্যান্টি লোগোস, অ্যান্টি সেন্টার, বিনির্মান ইত্যাদি শব্দবন্ধ। আর রয়ে যায় ইতিহাসের অতীত যার শবদেহ ধারণ করে দেশে দেশে কম্যুনিজমের তথাকথিত উত্তরাধিকারীরা। যা আরেকটি ধর্মের রূপ নিয়েছে। মার্কসীয় আরোহ মূলক তর্কপদ্ধতি এদের হাতে অতিবোদ্ধার অহঙ্কারে পর্যবসিত হয়। এরা নিজেরা হয় বস্তুবিচ্ছিন্ন আর আর্থসমাজকেও দিতে পারেনা কোনো উন্নত সমাজ সংস্কৃতি। কিন্তু আর্থসমাজকে জ্বালাতন করতেও ছাড়ে না।

এই উৎকেন্দ্রিকতা থেকে বের হতে গেলেও দরকার সমকাল আর্থসমাজ সংকট নিরিখে জীবন জিজ্ঞাসার। যা থেকেই শ্রেণিসংগ্রাম তত্ব নাকি আমিত্ব সংগ্রাম তত্ত্ব কোনটা সমকাল জীবন মুক্তির অগ্রদূত তাও পরিষ্কার হয়। আর্থসমাজ পেতে পারে উন্নততর আর্থসমাজ সংস্কৃতি। অর্থাৎ ভাষা-সংস্কৃতি।

কেবল ভাষা নিয়ে নির্দিষ্ট দিনে কথা বললে আর অনুষ্ঠান করলে ভাষা তথা সংস্কৃতির উন্নতি হয় না। ভাষা সংস্কৃতির উন্নতি হয় সামগ্রিক আর্থসামাজিক জীবনের সমস্যা চিহ্নিতকরণ, শত্রু-মিত্র নির্ণয়, সংগ্রামী নীতি ও কৌশল নির্বাচন ও তার ভিত্তি রূপী তত্ত্ব অনুশীলনের মাধ্যমে। এক কথায় জ্ঞান-বিশ্বাস-সংগ্রাম এর ত্রিশূল তত্ত্ব আর্থসামাজিক অনুশীলনে এনেই তা করতে হয়। যার সূচক বিন্দু শ্রম-মূল্যের হিসেব কষা আর অর্থনীতির অন্ধকারকে আলোয় আনার সাংস্কৃতিক চাষবাস।।

গল্প

হীনমন্য

কস্তুরী

বাজার থেকে সবজি,মুদি বাজার, গেটে রাখা জল দিয়ে ভাল ভাবে ধুয়ে মনোরমা ডাকলো– কৈ গো ঝুড়িটা একটু দিতে পারবে?

সতীশ– না, খাতা দেখছি তুমি নিয়ে যাও। মনোরমা– সে তো জানি আমাকেই তো নিতে হবে। এসব তো আমারই কাজ। সকাল থেকে ঘরদোর পরিষ্কার করে, বাসন ধুয়ে, জামা কাপড় কেঁচে বাজারে গিয়েছিলাম। বাইরের মালপত্র তো আবার ভেতরে নিয়ে ঢোকা যাবে না। বাতিকগ্রস্ত কি না! সতীশ– সকাল সকাল চেঁচামেচি করে মাথা গরম করো না। তুমি কেন বাজারে যাও আমি বুঝি কিছু বুঝি না!

কদর্য উক্তি শুনে মনোরমার ভেতরে আগুন জ্বলে উঠে। বৈশাখের সকালের গুমোট আরও বেড়ে যায়। কেন যাই তা তুমি যদি বুঝতে! তোমার পায়ের ব্যাথাটা এখন কেমন আছে? আজকে একবার ফিজিওথেরাপি করতে যাবে আমার সঙ্গে?

সতীশ– আমায় দয়া দেখানো হচ্ছে। মনোরমা মনে মনে ভাবে কে যে কাকে দয়া করেছে। পাঁচ বোন অভাবের সংসার বাবাই সংসারে একমাত্র রোজগেরে। দু-তিন বিঘে জমি চাষ করে কত টুকুই বা আয় হত। নিতাই কাকা দয়ালু মানুষ আমাদের সম্বন্ধটা করেছিলেন। স্কুল মাস্টার শিক্ষিত ছেলে আমাদের মত মেয়েদের কি এমন ছেলে জোটে! সতীশ দশ বছর বয়সে খেজুর গাছে রস পাড়তে উঠে পড়ে গিয়ে বাম পাটা ভেঙ্গে যায়। চিকিৎসার ভুলের জন্য হাঁটুর নিচ থেকে গোড়ালি পর্যন্ত শুকিয়ে সরু হয়ে যায়। কিন্তু তাতে কি, সতীশ ভাল মাইনে পায়, তার সম্মান আছে। সতীশ– বেশ,বাইরের হাওয়া খেয়ে এলে এবার সংসারের কাজে মনোযোগ দাও। আমার গরম জল চাই, স্নান করব। সতীশ সরু পাটায় তেল মালিশ করে। মনোরমা গ্যাসে জল বসিয়ে সতীশের সরু পাটার দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

সতীশ– কী দেখছ এমন করে? আমায় ঘেন্না হচ্ছে। মনোরমা কোনো উত্তর দিতে পারে না। ঠোঁট দুটি অব্যক্ত যন্ত্রণায় কাঁপতে থাকে। সংকীর্ণ কারাগারে নিজের বিষাক্ত চিন্তায় আবদ্ধ থেকে, হীনমন্যতায় ভুগে সতীশ একেবারে অমানুষ হয়ে উঠেছে। তাঁর কষ্ট যে আমায় রন্ধ্রে রন্ধ্রে পীড়া দেয় তাকি কোনো দিন সে অনুভব করতে পারবে?

দিন কয়েক থেকে সতীশের কোমর থেকে হাটু পর্যন্ত খুব ব্যাথা, যন্ত্রণায় ছটফট করছে। এদিকে মনোরমা নাওয়া-খাওয়া ভুলে সতীশকে সুস্থ করে তোলার ধনুক ভাঙ্গা পণ করেছে। বিভূতি ডাক্তারকে বাড়িতে ডেকে দু -বেলা ফিজিওথেরাপি, তেল মালিশ, হট ব্যাগে সেঁক দেওয়া, সতীশের শয্যার পাশে বসে সারা রাত যত্ন নেওয়া। সতীশ ঘুমিয়ে পড়লে শিয়রে বসে ঝিমোয়। গভীর রাত্রে বৈশাখের আকাশে ঘনঘন মেঘ ডাকার আওয়াজে সতীশের ঘুম ভেঙে যায়। ঘুটঘুটে অন্ধকার ঘরের কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না। মাথার পাশের টেবিল ল্যাম্পটি জ্বেলে দেখে মনোরমা চেয়ারে বসে ঘুমোচ্ছে। এ কদিনে তার চেহারার এ কি হাল হয়েছে? চোখের নিচে কালি পড়েছে,মুখটা শুকিয়ে গিয়েছে, চুলে জট পড়েছে, কত দিন চুলে চিরুনি পড়েনি। টেবিল ল্যাম্পের মৃদ আলো মনোরমার মুখে পড়ছে আর তার ভেতরের দীপ্তি যেন ঠিকরে ছড়িয়ে পড়ছে। কী অপরূপ তার সেবা, নিষ্ঠা, ভালবাসা। ধীরে ধীরে ডান পায়ের উপর ভর দিয়ে উঠে বসে বিছানায় সতীশ। ডাকে, রমা রমা, ধড়মড়িয়ে ওঠে মনোরমা কত দিন এই নরম ডাক শোনেনি মনে করতে পারে না।

সতীশ– রমা বিছানায় বসো। মনোরমা উঠে গিয়ে জানালায় দাঁড়ায়। বাইরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টির জল পড়ে। ভেতরে মনোরমার কত দিনের অব্যক্ত মেঘ অবিরাম বৃষ্টির ধারার মত ঝরে পড়ে।

নির্মল চর

কস্তুরী

শ্যাওলা জমা গতিহীন কালো নদির জলের দিকে চেয়ে আমিনার মনে পড়ে সে দিনের কথা। হঠাৎ গভীর রাতে বিধ্বংসী, রাক্ষসী পদ্মার ভয়াবহ রূপ। প্রতিবেশীদের বুক ফাটা কান্না, কোলাহল, ছুটোছুটি আর আর্তনাদে আমিনা আর তার মায়ের ঘুম ভেঙে যায়।এক প্রতিবেশিনী ময়নার কুঁড়ে ঘরটা তখন জলের গভীরে।টিনের দরজা দড়াম দড়াম করে বাড়াচ্ছে ময়না।সর্বনাশ! ঘর থেকে তোমরা বেরিয়ে এসো, না হলে ঘর সমেত তোমরাও জলের তলায় তলিয়ে যাবে। ময়নার ডাকে আমিনা আর তার মা দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। আমিনা দেখে তাদের ঘরের বেশ কিছুটা দূরে ক্ষুব্ধ জলরাশি। প্রতি বর্ষায় এমনই রাক্ষসী রূপ ধারণ করে এই মোহময়ী পদ্মা। এমনই চণ্ডালিনি হয়ে ওঠে, যা পায় সবই গ্রাস করে ফেলে। ময়না আমিনার মাকে বলে বুবু দাঁড়িয়ে কী দেখছো, ঘরের জিনিসপত্র বের করে ফেলো। আমিনার কোনো আগ্রহ না দেখে তার মা নিজেই ঘর থেকে সামান্য জিনিসপত্র বের করে আনে। মায়ের জীবনযুদ্ধ দেখে আমিনাও ক্লান্ত,অবসন্ন।মায়ের প্রতিও তার গভীর অভিমান। মাত্র পনেরো বছর বয়সে বিয়ে দিয়ে দেয় বরকত মিঞার ছেলে রহিমের সাথে। রানিতলা থানার পদ্মার তীরবর্তী অঞ্চলে। সেই সময় আমিনা ক্লাস এইটে পড়ে। যখন তার জীবন গড়ার সময় তখনই দুঃসহ অন্ধকারে তাকে ঠেলে দেওয়া হয়। রহিম মুম্বাইয়ে জরির কাজ করে। বরকত মিঞা জানে তার ছেলে খুব বাধ্য।ছেলেকে ডেকে পাঠায় বিয়ের জন্য।পিতার কথা রাখতেই রহিম এসেছিল আমিনাকে বিয়ে করতে।কিন্তু বিয়ের রাতে সদ্য বিবাহিত আমিনাকে শুনতে হয়েছিল কঠিন কথা। রহিম আমিনাকে বলে, পরশু আমার reservation আছে,ওই ট্রেনে আমাকে ফিরতে হবে মুম্বাই,ওখানে আমার বিয়ে করা বউ আছে।শুধুমাত্র পিতার কথা রাখতেই তোমাকে বিয়ে করেছি।আমিনা নিস্তব্ধ,নির্বাক।শুধু সকরুণ দৃষ্টিতে স্বামীর পানে চেয়ে ...কত কথা বলার ছিলো, কেন করলেন এমন আমার সাথে? না কিছুই বলা হয়নি আমিনার।সেই রাতেই চলে গিয়েছিল রহিম, সেই প্রথম,সেই শেষ। সেই থেকেই আমিনার একাই পথ চলা।অবলম্বন বলতে গেলে বৃদ্ধা মা। পদ্মার পাড়ের মানুষদের জীবনে লেগে থাকে প্রতিনিয়ত ভাঙা গড়ার খেলা। তার জীবনেরও ভাঙা গড়া।পদ্মা একদিকে যেমন গ্রাস করছে ঘর বাড়ি, মাঠ, স্কুল,গ্রামকে গ্রাম।নিরাশ্রয় মানুষেরা দিকবিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।আবার কেউ বিস্তীর্ণ পদ্মার ওপারে চরে ঘর বাড়ি করে জীবন যাপন করছে।চরে আমিনা মাকে সঙ্গে নিয়ে একটা খড়ের ঘর বেঁধেছে। সে এখন অর্ক কোচিং সেন্টার এ পড়ে।প্রতিদিন নৌকায় এপারে এসে কলেজ করে,বিভিন্ন কাজ সেরে সন্ধ্যায় নৌকায় আবার ফিরে যায়।সফির সঙ্গে পরিচয় হয় অর্ক কোচিং সেন্টারে। সফি কোচিং সেন্টারের হেডমাস্টার এর বন্ধু,তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত।

হেডমাস্টার: তুমি তো জানো আমাদের এখানকার অবস্থা কতটা শোচনীয়, মানুষের অবস্থা দিন আনতে পান্তা ফুরোয়। এই যে পদ্মার ভাঙ্গন এ নিয়ে কেউ ভাবে না।

সফি: জানি রবি, এতো দেশের অন্যতম জাতীয় সমস্যার মধ্যে পড়ে, এই সমস্যা জাতীয় স্তরে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব তো তোমাদেরই। কিন্তু তা না করে এই অবস্থার জন্য দায়ী কিন্তু তোমরাই।

রবি: কেন আমরা কেন?

সফি: তোমরাই তো, ভোটের সময় যখন কিছু বালির বস্তা দিয়ে পাড় বাঁধিয়ে দেয়, তখন তোমরা ভাবো সমস্যার সমাধান হয়ে গেলো, তোমরা মেনে নাও, ভোট দাও সেই প্রতারক নেতানেত্রীদের।এই গভীর সমস্যার সমাধান তো অন্যভাবে করতে হবে,রবি।

রবি: কীভাবে?
সফি: তোমাদের সকলকে বোঝাতে হবে মৌলিক সমস্যাটা। এই যে রক্ষরা বলে এতো প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা, কিন্তু প্রকৃতি কি সত্যি আহাম্মক? না কখনই না, তোমাদের এখান থেকে গভীরভাবে প্রতিবাদ যদি না হয় তবে কীভাবে ঘটবে সমাধান? সকলকে ঐক্যবদ্ধ করো রবি, এই যন্ত্রণা আর কতদিন সইবে?
রবি: হ্যাঁ ভাই ঠিকই বলেছ, তোমার কথাই বেশ শক্তি আছে, অনুপ্রেরণা আছে। বকুল গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আমিনা সফির মুখের পানে চেয়ে থাকে। সফির চোখে আগুন আছে,সে আগুনকেই যে আমিনা পেতে চাই। আমিনা শত প্রতিকূলতাকে হার মানিয়ে গ্রাজুয়েট হয়েছে। সে আজ যুবতী, আগুনের স্পর্শ তার চায়। সে এখন পদ্মার তীরবর্তী একটি দোকান ভাড়া নিয়ে চরের মেয়েদের নিয়ে উলের কাজ শেখানোর জন্য একটা নিটিং সেন্টার খুলেছে। সফি মেশিন ও উলের যোগান দেয়। সফি ভাই শোনেন এদিকে। বলো আমিনা কেন আমায় ডাকলে।দেখুন ঐদিকে , সফি ও আমিনা দেখে দুজন মানুষ নর ও নারী পদ্মার উঁচু পাড়ে দাঁড়িয়ে। পুরুষটি নীচে নেমে হাত বাড়িয়ে দেয়। পুরুষটির হাতটিকে শক্ত করে ধরে নারীটি নীচে নেমে যায়। দুজনে হাত ধরে নৌকা পর হয়ে, ঘনিষ্ঠ বাহুডোরে আবদ্ধ হয়ে বিস্তীর্ণ বালুকারাশি পার হয়ে সর্ষে ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলে। দেখতে দেখতে তারা দৃষ্টির বাইরে চলে যায়। সফি চঞ্চল হয়ে ওঠে,মনে দোলা লাগে। আমিনার ডান হাতটি মুঠোর মধ্যে নিয়ে আলতো করে চাপ দেয়।

রেশমা-র লকডাউন

সুকৃতি

দক্ষিণ দিক থেকে গ্রামে ঢুকলে রাস্তার ডানধারের বাড়িগুলোর পেছনে বর্ডার পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল সবুজ মাঠ। বামদিকের বাড়িগুলোর পেছনে চোখে পড়ে আম -জাম, বাঁশ-কাঠালের বড় বড় বাগান... হাঁটাহাঁটি দৌড়ঝাপ হয়না বলেই বৃষ্টির জল পেয়ে আগাছাগুলো কেমন তরতর করে সতেজে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। পাখি আনন্দে গায়, নিশ্চিন্তে খায় পোঁকামাকড় থেকে পাকা ফল পর্যন্ত। একা একটি ছেলে, উসকোখুসকো চুল, মলিন খালি গা, চোখগুলো যেন ঠিকরে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। জনশূন্য রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে দেখে শীর্ণ হাড়গিলে, কাঁদামাখা গায়ের নেড়িকুত্তার জিভে অপেক্ষাকৃত অধিক গতিতে লালানিঃসরণ হতে থাকে...শিশুটি প্রথমে অবাক হয়ে পরে ভীত হয়।

রাস্তার দুধারে সারে সারে বাড়িঘর, বেশিরভাগই ইটগাঁথা, নতুন। অজানা ছোঁয়াচে রোগের সংক্রমণের ভয়ে সবাই সবাইকে এড়িয়ে চলে। নিঝুম রাতের মত, সকাল থেকে সন্ধে সারাটা দিন প্রায় স্তব্ধ। দিনে দু-একবার গরুর ঘাসওয়ালার চেঁচানো আর ফল-আনাজওয়ালার দু-তিনবারের হাঁক শোনা যায়। কত খরতপ্ত জ্যৈষ্ঠের দুপুরের দইওয়ালার 'দইদই' হেঁকে যাওয়ায় গৃহস্থ চাষীর মনে পুলক জাগত, চুড়িওয়ালার 'চুড়ি চাই চুড়ি চাই' শব্দে কিশোরী অনাবিল আনন্দে ঘর ছেড়ে বাইরে আসত। আজ আর তেমন হয়না। তবু আজও বোধহয় জানালা-দরজার পাল্লার ফাঁক দিয়ে কিশোর-কিশোরী থেকে শুরু করে বহু আবালবৃদ্ধের চোখ উঁকি দিয়ে গভীর আগ্রহে পথের দিকে চায়।

গ্রামটির নাম কল্পতরু। গ্রামের বেশিরভাগ মানুষকেই সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাদ রেখে রাতদিন বিভোর করে রেখেছে এক গভীর দিবাস্বপ্ন। পেটের ক্ষুধা মেটানোর স্বপ্ন।

মোড়ের মাথায় রাস্তা শেষে দুধারে সারে সারে পঞ্চাশ খানেক দোকান। বেশির ভাগই পাকা। রহমানের চায়ের দোকানটা বাঁশের চাটাইয়ের। বাঁশের ঝাপ, বাঁশের ধরাট। পুরোনো টিনের চাল মরচে ধরা। সামনেটায় পাটকাঠির ছাউনির উপর ত্রিপলটার মাঝে মাঝেই ফাটাফুটি। গতরাত্রে বিশ মিনিট ধরে ঝড়ের গোঁ গোঁ গোঙানির পর ছাউনিটা নুইয়ে পড়েছে। রহমান ঝাপে ঠেস দিয়ে ধরাটে বসে আছে। দোকানের মেঝের সামনেটায় রাস্তার ধুলো, শুকনো ছেঁড়া পাতা, শিমুলগাছের ছড়িয়ে পড়া তুলো, প্লাস্টিক কাগজে ভরে আছে। চা খেতে কেউ আসবেনা, তাই ঘর সারানোর বালাই নেই, ঝাঁট দেওয়াও দরকারি মনে হয়না। আড়াইমাস থেকে রোজগারের পথ খুইয়েছে রহমান। রোজ খুব সকালে উঠে সে এভাবে বসে বসে পিচ গলানো রাস্তার দিকে আনমনে চেয়ে থাকে। মাঝে মাঝেই ডোবা হয়ে আছে... উপরের দেড়সেমি মাপের নতুন প্রলেপ উঠে গিয়ে ভেতরের কলঙ্ক চকচক করে রেরিয়ে আসে। পাড়ার একটা দুরন্ত ছেলে, ছ-সাত বছর বয়স হবে হয়ত, পায়ের আঘাত দিয়ে গর্তের জলগুলো যতদূর সম্ভব চারদিকে ছিটিয়ে নিজের অদ্ভূত শক্তির ক্ষমতায় অসম্ভব গর্ব অনুভব করে— যেদিকে জল জমে আছে সেদিক দিয়ে অনির্বচনীয় আনন্দে খেলতে খেলতে চলে যায়। ছোটবেলার ডানপিটে আর বাউণ্ডুলেপনার স্মৃতিকে সেকেণ্ডে অতিক্রম করে সেই সন্ধ্যাবেলার মেঝে-পাতা বিছানায় শুয়ে দাদির কাছে শোনা— না খেতে পেয়ে অসাড়, রোগজর্জর কঙ্কালসার মানুষের কান্না তার কান দুটোকে ঝালাপালা করতে থাকে। অস্বস্তি হয়, দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। হাঁপানির ব্যারাম তার ছিলনা, সে রোগে মনে হয় তাকে ধরেছে। কাশতে কাশতে আর হাঁপাতে হাঁপাতে বাঁশের খুঁটিটা শক্ত করে ধরে। গাছের পাতাগুলো স্থির হয়ে একটা গম্ভীর ভাব ধারণ করে। যেন তার দিকে চেয়ে আছে— রোদ ওঠেনি— গুমোট ভাব... রহমানের বুকটা ধড়ফড় করে ওঠে।

ঠোঙায় মুড়ি চিবোতে থাকা রহমানের দশ বছরের ছেলে ওমরকে ডাক দেয়।

পরনের লাল প্যান্টটা ক্রমশ কালো হয়ে এসেছে, প্যান্টের ফিতে ঢোলা, বারে বারে ডান হাতটা দিয়ে উপরে তুলতে থাকে, মাঝে মাঝে মুখে মুড়িও দেয়। পাঁজরের হাড়গুলো স্পষ্ট গোনা যায়। ফর্সা গায়ের রঙ এ মলিন ভাব এসেছে, চুলগুলো পরিপাটি করে আচড়ানো আছে, তবু ধুলোয় যে চিটচিটে অবস্থা পলক ফেললেই চোখে পড়ে। সকালে যে কিছু খাওয়া হয়নি, একথাটা রহমান ভুলেই গেছিলো। ওমরের হাতে মুড়ি দেখে মনে পড়ে। ক্ষিদে নিমেষেই উধাও হয়। কাজ না থাকার অসহায়তা ক্ষিদের যন্ত্রণাকে মাঝে মাঝেই অতিক্রম করে যায়। ছেলের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে রহমান ঘরের দিকে এগিয়ে যায়।

গতরাত্রে ঝড়ের আগেও গুম হয়েছিল আকাশ-বাতাস। রাত তখন নটা। কোন সকালের রেশনের চাল সেদ্ধকরা ভাত পানি দিয়ে রাখা ছিল। ক্ষিদেই পেট জ্বালা করে। পাশের বাড়ির শুকতারাদের বেড়ার ফাঁক দিয়ে এধারে বেরিয়ে আসা কচুর শাকগুলো ওমরের মা রেশমা নুন দিয়ে সেদ্ধ করে রেখেছিল, কোনও রকম খেয়ে তারা শুয়ে পড়ে।

সরকারি হুকুমে সমস্ত দোকানপাট বন্ধ। মুদির দোকান হলেও হত। সর্বনিম্ন পুঁজি আর ন্যূনতম আয়ের তীব্র বাসনায় খোলা চায়ের দোকান সারাক্ষণ ভ্রুকুটি করে। কোনওরকম একটু আলু ভাত-রুটি খেয়ে এ যাত্রায় বেঁচে ফিরতে হবে, চায়ের কোনো প্রয়োজন নেই।

শুকতারাদের তিনতলা বাড়ির পেছন থেকে বাড়ির সমান, ৫০ মিটার চওড়া আম কাঁঠালের বাগানটা চলে গেছে লম্বা হয়ে অনেক দূর। তারই শেষে প্রায় বর্গাকার বিঘাখানেক জমিতে পটল, বেগুন, ডাঁটা, ঝিঙে, লালিম, লঙ্কা থেকে শুরু করে কত কী! চোখ ধাঁধিয়ে যায়। আগে কতদিন রুস্তমের বেঁটেখাটো বউটা শাড়ির কোঁচায়, কখনো ঘাসের ঝুড়িতে এটা সেটা ভরে নিয়েছে, লতিকার মা ছাগলের খুঁটোটা আলগা করে পুঁতে আনমনে ঘাস কাটতে কাটতে ছাগলকে বেগুনের গাছগুলো নির্দ্বিধায় খাইয়ে দিয়েছে। সে অবশ্য কিছু চুরি করেনা... তার বাড়ির লাছেই সব্জির বাহার- পুঁই, সজনে, ডাঁটা ইত্যাদি। তবু শুকতারার মায়ের রংবেরঙের শাড়ি পরে, কানের দুল হিলিয়ে কথা বলা শুনে তার গা-পিত্তি জ্বালা করে... কিছু গাছ অবোলা ছাগলে মুড়োলে তার মনটা একটু ফুরফুরে হয়।

এখন অবশ্য তেমনটা করার আর জো নেই। শুকতারার কলকাতায় ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া ভাই সাইদ বাড়িতেই আছে। সে প্রায় সারাক্ষণই বাগানে বসে থাকে। সকলের বিশেষ করে মেয়েদের চলাফেরা আর শাড়িপরার ভাবভঙ্গি বিশেষভাবে লক্ষ্য করে। প্রতিদিনের মত সেদিন বিকেলেও রেশমা, তার ছোট্ট ছাগলটার জন্য লতিকার মাদের দলেই ছিল। রেশমার ঘাসের ঝুড়িতে পা লাগতেই রুস্তমের বউয়ের মোটাসোটা শরীরখানা ধপাস করে গেল পড়ে। দাঁত কিড়মিড় করে ওঠে তার, পুরুষালি ভঙ্গিমায় বলে,- কী ভাবছিস লা? এত সরু আলের উপর কি এভাবে ঝুড়ি রাখে? হটিয়ে রাখ। এটা সেটা একটু নেনা তুলে, ও ছোঁড়া তোকে কিছু বুলবেনা।

পাতলা ছিপছিপে গড়ন রেশমার। ছোট্ট মুখটা আরও শুকনো হয়ে আসে, যেন কথা বেরোয়না। মুখে শান্ত ভাব এনে কঠিন স্বরে বলে- মাসি, মুখ সামলে কথা কও। রেশমার চোখ দেখে রুস্তমের বউ ভয় পেয়েও বুঝতে দেয়না, নির্লজ্জের মত আড়ালে হাসে। রেশমা এটা সেটা নিতে পারেনা, বিকেলের ঘাস করা সঙ্গীর দল মাঝে মাঝে তাকে বোকা বলে ঠোঁট টিপে মুচকি হাসলেও বাক্যবাণ নিক্ষেপ করার সাহস জোটাতে পারেনা।

রহমান ছেলের সাথে বাড়ি ফেরে। এদিন দুপুরবেলা নুন দিয়ে ভাত মাখতেই ক্ষণিকে গলে গিয়ে জলের গাঢ়ত্ব অনেকগুণ বেড়ে যায়। কাঁচা লঙ্কা চাইতে রেশমা দৌড়ে ঘর থেকে একটা শুকনো লঙ্কা এনে দেয়- না তাকিয়ে রহমান, রেশমার হাত থেকে লঙ্কাটি ছিনিয়ে নিয়ে গোগ্রাসে ভাত গিলতে থাকে, দুবারেই লঙ্কাটা শেষ হয়। রেশমা খুব নরম গলায় বলে কাঁচা লঙ্কা শুকিয়ে গেছে তাই। রহমান সে কথায় না গিয়ে বলে, একটু পেঁয়াজ আছে, ওমরের মা? রেশমা ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে মিছামিছি পাটকাঠির ভাঙা খসা ঝাপের রান্নাঘরে এটা ওটা তাড়াতাড়ি করে হাতড়াতে

থাকে। দু তিন মিনিট পরে বলে, ছোট্ট পেঁয়াজ হলেই তো হবে, না? এই বলে সে আবার হাতড়ায়। রহমান বলে—না, আর লাগবেনা, হয়ে গেছে।

—আচ্ছা, তবে থাক। একটু আস্তে আস্তেও খেতে পারো না। পরে খুঁজে রাখবো।

পরের দিন সকাল থেকে রেশমা গ্রামের স্কুল থেকে অনেককেই ত্রাণের প্যাকেট ভর্তি জিনিসপত্র নিয়ে যেতে দেখে। রুস্তমের বউ পাঁচ কেজি চাল, চার কেজি আলু এক কেজি ডালের প্যাকেট নিয়ে রেশমার সামনে দিয়ে গটগট করে চলে যায়, যেন সে রেশমাকে চেনেইনা। রুস্তম শয্যাশায়ী। কী যে রোগ তার, কে জানে। জল ছাড়া কিছুই খায় না। মেয়েটারও বিয়ে হয়ে গেছে। রেশমার দেওর বাইরে আটকে গেছে, ঘরে তারও বারো বছরের ছেলে। সেও ত্রাণ পেলো। আরো কতজন আসে যায়। কদিন আগেও সিপিএম এর ছেলেরা তাকে তৃণমূল ভেবে হয়তো তালিকা থেকে বাদ দিয়েছে। তৃণমূলের প্রধান সিপিএম বলে হয়তো তাকে ত্রাণ দেওয়ার কথা মনে করেনি। অন্য ছেলে ছোকরারা, ত্রাণ বিলি করতে এসে, 'বাড়িতে মরদ আছে ঠিক জুটিয়ে নেবে,' বলে হয়তো মনে করেও, দেবার দরকার নেই ভেবে এড়িয়ে গেছে। 'আমরা কেন পেলাম না, তারা কেন পেল, ওরা তো দু বার, ওরা তো চার বার পেয়েছে,'- এসব বার্তা নিয়ে কেউ কেউ গিয়ে জোর করে, কেউ কান্নাকাটি করেও নিতে পারলো। রেশমা পারলো না। সে বারান্দায় খুঁটিতে হেলান দিয়ে মাটিতে বসে থাকল নির্বিকার হয়ে। চোখ দিয়ে জল পড়েনা, শাড়ির ময়লা আঁচলখানা দু হাতের আঙুল দিয়ে ছোট ছোট ভাঁজ করে আবার ভেঙে দেয়। রেশমার মনের জোরের সাথে শরীরের জোরও ঢেরখানি কমে আসে।

.... বর্তমান আর ভবিষ্যতেও না খেতে পেয়ে রোগাক্লিষ্ট হয়ে মৃত্যুর হাতছানিতে ধিক ধিক করে এগিয়ে যাওয়ার নির্মম অদৃষ্টের সামনে ছেলে-স্বামীর শীর্ণ মুখ দুটো ভেসে ওঠে। ছেলেকে বলে বাপের সাথে খেয়েছে, বাপকে বলে ছেলের সাথে খেয়েছে।

দুপুর থেকে বিকেল গড়িয়েছে। চাল-ডালের প্যাকেট যাওয়া - আসা কখন বন্ধ হয়েছে— দু তিন দিনের ভেজানো ভাতের কিছুটা বাটিতে পড়ে আছে, তা থেকে উঠে আসা মদের মত গন্ধ তাকে অবশ করে দেয়, নেতিয়ে পড়ে মেঝেতে।

দোতলার জানালা দিয়ে সাইদ খাপছাড়া অদ্ভূত দৃষ্টিতে নীচের ভূলুণ্ঠিত নিথর দেহটাকে নিরীক্ষণ করতে থাকে। রহমান বাড়ির রাস্তায় পৌঁছে এদৃশ্য দেখে হতবাক। সজল চোখে হতবুদ্ধির ন্যায় রেশমার শীর্ণ হাতদুটি ধরে কোলে ওঠানোর চেষ্টা করতেই সাইদকে দেখতে পায়, রাগে ভয়ে দুশ্চিন্তায় কাঁপতে থাকে। সাইদ ঝপ করে জানালার পাল্লা বন্ধ করে। রহমান কোনওক্রমে রেশমাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শোওয়ায়।

ওমর তখনও বাড়ি ফেরেনি। যুদ্ধ নয়, বোমার ভয় নয়, কোনও এক অদৃশ্য রোগের ভয়ে ওমরের বাইরে যাওয়ার কড়াকড়ি আছে। রহমান ছিলনা। ঘরে আলু ডাল ফুরিয়ে এসেছে, তেল নেই, কোন উপায়ে সে কী করবে? রহমানকেই বা কী বলবে— পাড়ার ডাক্তার বলেছে তাকে বেশি চিন্তায় ফেলা যাবেনা। গ্রামের তার থেকেও ভালো পরিবারে যখন ন্যূনতম খাবারের সুরাহা হচ্ছে তখন তাকে কি ঠকানো হচ্ছে না?— তার এমনই হবার— এসব সাত পাঁচ ভাবনার মাঝে ছেলের আবদার— 'মা আজ আলুর ঝোল কর, খালি আলুসেদ্ধ দিয়ে ভাত আমি কিছুতেই খাবোনা।' নিজেকে সামলাতে না পেরে দিয়েছিল সপাটে এক চড় কষে। এসবে ওমর আজকাল অভ্যস্ত। ঠোঙায় চালভাজা নিয়ে সেই দুপুরে বেরিয়েছে। বাগানে গুলিডাণ্ডা, গুলতি ছোড়া খেলা চলছে— আওয়াজ স্পষ্ট শোনা যায়। সন্ধ্যা ছাড়া আজ সে নিশ্চয় আসবেনা রেশমা জানে। রহমান আবার একটু বাইরে বেরিয়েছে।

একটু ধাতস্থ হয়ে, হাতমুখ ধুয়ে বাইরে উনুনে চাল ফোটাতে দিয়ে রেশমা আবার বাইরে বসে। গরমটা বেজায় বেড়েছে। ভেজামাটি থেকে গরম ভাপ উঠছে। লাল বাল্বের চারধারে উই পোকার লাফালাফি— তাদের মৃত্যুর সময় আগত। এদের দেখেও অসহায় নারীর ঈর্ষা হয়।

স্বামী ছেলের টানে বুকে দমক লাগে।

রুস্তমের বউ ব্যাগভর্তি সব্জি নিয়ে যাবার সময় রেশমা

চোখ তুলে তাকাতেই, হাসিমুখে বলে– করলা, পেঁয়াজ, একটু কাঁচালঙ্কা, শশা, এইসব আর কি। আরো ভেতরে ঈর্ষার দপদপানি বেড়ে ওঠে রেশমা টের পায়, হাত-পা জোরে জোরে খসখস করে চুলকোতে থাকে। ওমর চুপি চুপি রান্নাঘরে খসে পড়া ঝাঁপের ফাঁক দিয়ে দেওয়াল ঘেষে ঘরে ঢোকে।

কিছুক্ষণ পরে রহমান আসে। হাতে ছোট্ট ফলের ক্যারি। রহমান বলে– হাটে গেছিলাম। এটুকু ক্যারিতে এক কেজি আলুর সমান জিনিস কোনওরকমে ধরে– রেশমা আন্দাজ করে। রহমান বলে– ওমরের জন্য দুটো পাকা আম আছে, একটু সব্জি আছে। রেশমা রাগে গজগজ করে ওঠে— রুস্তমের বউ এর যে ক্ষমতা তা ব্যাটাছেলে হয়ে তোমার নেই। রহমান স্থির দৃষ্টিতে দূরে আলো আঁধারে তাকিয়ে কোনো তল খুঁজে পায়না। শ্লথ পায়ে ঘরে ঢোকে। রেশমা কুঁকিয়ে কেঁদে ওঠে।

সারাদিনের অনবরত দৌড়ঝাপ শেষে আলুসেদ্ধ ভাত খেয়ে ওমর গভীর ঘুমে শুয়ে আছে। দুশ্চিন্তা, শোক, অসহায়ত্ব কোনও কিছুর ছাপ তার মুখে নেই। বাইরের পৃথিবীকে সে আজও দুহাতে উপভোগ করে। মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে রহমানের চোখে জল আসে, গোপনে মুছে নেয়। কিছুক্ষণ পর রেশমা রহমানের পা ধরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

রাত দশটা বেজে গেছে। পাশের বড় বাড়িটার ভদ্র মানুষগুলোও সারাদিন বিছানায় শুয়ে, টিভি দেখে, গান শুনে ক্লান্ত হয়ে খানিক বিরক্ত হয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে। জমকালো বাড়িটাও প্রকৃতির গাঢ় অন্ধকারে কালো ছায়া হয়ে আছে। কুকুরগুলোও ডাকেনা। মারুতি, বাস রাস্তা কাঁপায়না, লরির ঝাঁকানি, ভারিক্কি গতি কবেই থেমে গেছে। গাঢ় আঁধারেও বোঝা যায়, অন্ধকার উৎকর্ণ হয়ে আছে সামনের প্রকাণ্ড বটগাছটাকে ঘিরে। রেশমার আজকাল আর একলাও বাইরে বেরোতে ভয় করেনা। আকাশে আজও তারারা নেই, বৃষ্টি হবে বলেও মনে হয়না। রহমান আর রেশমা পাশাপাশি বসে আছে। রেশমা হাত বাড়িয়ে রহমানের ডান হাতটা ধরে, রহমান সেই হাত শক্ত করে ধরে দুহাত দিয়ে।

পরের সকাল। যে করেই হোক টাকা ইনকামের কিছু উপায় খুঁজতেই হবে। মনে ভরসা আর জোর নিয়ে রহমান রাস্তায় বের হয়– সে মনিস খাটতে পারে, ইচ্ছে করলেই উপায় হয়। তৎক্ষণাৎ হাতিমপুরের বাসটা মোড়ে এসে থামে। বাসটা অনেকদিন আসেনি। সেখানে কত ধরনের কারখানা– পাটকল, রাইসমিল...। সে পা চালিয়ে হাঁটে। মনে হয় লোকজন সব ঠিক করাই ছিল। হুস করে বাসটা রহমানের ক্ষীণ আশাকে নিভিয়ে দিয়ে জোর গতিতে দূরে মিলিয়ে যায়।

চরিত্র

সুদীপ সরকার

সব্যসাচী মজুমদার এলাকার একজন প্রথিতযশা শিক্ষক। ইংরাজী সাহিত্যে তার অগাধ পান্ডিত্যের জন্য নিজের এলাকার বাইরে বিস্তীর্ণ অঞ্চলেও তিনি সমানভাবে সমাদৃত। ছোটোবেলা থেকেই অত্যন্ত মেধাবী সব্যসাচী সাংসারিক অস্বাচ্ছন্দ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করেই বড় হয়েছেন। শত প্রতিকূলতাতেও সে কখনও হতোদ্যম হয়ে পড়েনি বা নিজ আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়নি। সব্যসাচী নিজে যখন ক্লাস এইট কিম্বা নাইনে পড়ত তখন থেকেই সে তার নীচের ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াতো নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের বন্দোবস্ত করার জন্য। নিতান্তই আটপৌরে কৃষক পরিবারের ছেলে সব্যসাচী টিউশন করে যা অর্থোপার্জন করতো তার প্রায় সবটাই বাবার হাতে তুলে দিতো সংসার চালানোর জন্য। শিক্ষকরা সব্যসাচীকে খুব ভালোবাসতো শুধুমাত্র তার মেধার জন্য নয় বরং অনেক বেশী তার সততার জন্য। ছোটোবেলা থেকেই অত্যন্ত দৃঢ়চেতা সব্যসাচী নিজের যোগ্যতায় কিছু করার কথা ভাবতো। অবাঞ্ছিত ভাবে কারোও থেকে কোনো সুযোগ নিতে তার প্রচন্ডভাবে আত্মমর্য্যাদায় লাগতো। এহেন সব্যসাচীর ঘরণী সুকন্যা গৃহবধূ হলেও উচ্চাকাঙ্ক্ষী। স্বামী তার মেধা কাজে লাগিয়ে আরোও অর্থোপার্জন করুক এটাই তার অভিপ্রায়। সব্যসাচী বেশ কিছু গরীব ছাত্র-ছাত্রীকে বিনি পয়সায় পড়ায় এটা সুকন্যার মোটেই পছন্দ নয়। সব্যসাচী-সুকন্যার একমাত্র সন্তান ঋষভ। সে বাড়িরও এই প্রজন্মের একমাত্র পুত্র সন্তান কারণ সব্যসাচীর দাদা-বৌদির একমাত্র কন্যা সন্তান নীলিমা। ঋষভ শুধুমাত্র পুত্র সন্তান হওয়ার কারণে তার ঠাকুমার কাছ থেকে অতিরিক্ত স্নেহজনিত প্রশ্রয় পায় তার সাথে সুকন্যার অতিরিক্ত আদিখ্যেতা তো আছেই। এই বিষয়গুলো সব্যসাচীর একদমই পছন্দ নয়। সে অনেকবার তার মা ও বৌ কে বুঝিয়েছে যে এগুলো করে তারা আদপে ঋষভের ক্ষতিই করছে কিন্তু তার কথায় উভয়েই বিশেষ কর্ণপাত করেনি। সব্যসাচী ঋষভের অতিরিক্ত চাহিদাগুলোকে একদমই পাত্তা দেয় না বরং ভাইঝি নীলিমার সাথে পুত্র ঋষভকে একই পঙক্তি তে রেখে উভয়ের নূন্যতম চাহিদাগুলোই কেবলমাত্র মেটায়। সব্যসাচী অনেকবার লক্ষ্য করেছে ঋষভ ও নীলিমা একসাথে খেতে বসলে মাছের বড় মাথাটা তার মা নাতির পাতেই দেয় কখনও নাতনির পাতে দেয় না, নাতনি বায়না করলেও ঠাকুমা ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দেয় যেকোনো ভালো জিনিষের ওপর বাড়ির ছেলের অগ্রাধিকার। এই ব্যাপারগুলোতে সুকন্যা খুব আহ্লাদিত হয় কিন্তু সব্যসাচীর এগুলো একদম অপছন্দের। বিষয়গুলো ঋষভ যে খুব উপভোগ করতে শুরু করেছে তা শিক্ষক সব্যসাচীর দৃষ্টি এড়ায়নি। সে বহুবার তার মা কে বুঝিয়েছে যে এসব করে আখেরে তিনি তার নাতির ক্ষতিই করছেন। এতে করে ঋষভের উন্নত চরিত্র গঠন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, কিন্তু কে কার কথা শোনে। ক্লাস ফাইভে সব্যসাচী ঋষভকে তার নিজের স্কুলেই ভর্তি করালো। সব্যসাচী ইস্কুলে প্রধান শিক্ষক বাণীব্রত বাবু সহ সকল সহকর্মীকে বলে রেখেছে যে ঋষভ তার ছেলে বলে ইস্কুলে অতিরিক্ত সুবিধা যেনো না পায় বরং সে ঋষভকে তার কর্মক্ষেত্রে নিয়ে এসেছে এই কারণেই যেনো ঋষভ অনুশাসনের শিক্ষা আরো ভালো করে পায়। সব্যসাচী তার সহকর্মীদের কে এব্যাপারে তাকে সাহায্য করার অনুরোধ জানায়। ঋষভ এখন ক্লাস সেভেনে পড়ে। বিগত দু বছরে ঋষভ পরীক্ষায় খুব ভালো ফল করতে পারেনি বরং মোটামুটি নাম্বার পেয়েই পাস করেছে। সব্যসাচীও নিজের মনকে এই বলে মানিয়ে নিয়েছে যে ঋষভ উচ্চ মেধার ছেলে

একদমই নয় বরং কিছুটা মধ্য মেধার ছেলে। সে জানে কোনো ব্যক্তির মেধার ঘাটতি অতিরিক্ত অনুশীলন দিয়ে পুষিয়ে দেওয়া সম্ভব যদি সেই ব্যক্তির জেদ থাকে। এই জেদ গড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন অতিরিক্ত পরিশ্রম করার মানসিকতা। জেদকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য অবশ্যই প্রয়োজন মূল্যবোধের পাঠ। ইস্কুলে এখন বাৎসরিক পরীক্ষা চলছে। সব্যসাচী একাকী টিচারস রুমে বসে আপনমনে বিষয়ভিত্তিক চর্চায় মগ্ন। এমন সময় প্রধান শিক্ষক বাণীব্রত বাবুর ডাক এলো। উর্দ্ধতনের ঘরে ঢুকে সব্যসাচী দেখলো তার আর এক সহকর্মী চিরঞ্জীতও ঐ ঘরে বসে আছে। প্রধান শিক্ষকের চেয়ারে বসে থাকা বাণীব্রতবাবুর মুখ যেনো আজ অন্যদিনের থেকে বেশী গম্ভীর, চিরঞ্জীতের মুখটাও কেমন যেনো থমথমে। কোনো এক অজানা আশঙ্কায় সব্যসাচীর বুকটাও যেনো একটু কেঁপে উঠলো। সে বুঝতে পারলো তারা দুজনেই তাকে যেনো কিছু বলতে চাইছে কিন্তু বাণীব্রতবাবু অহেতুক কাজের অছিলায় যেনো সময় নষ্ট করছে। ঘরের মধ্যে তখন শ্মশানের নিস্তব্ধতা। অবশেষে নীরবতা ভেঙ্গে সব্যসাচীর চোখের দিকে তাকিয়ে কিছুটা অপ্রতিভ অবস্থায় বাণীব্রতবাবু বলতে শুরু করলো " আজ ক্লাস সেভেনের পরীক্ষার ঘরে চিরঞ্জীতের গার্ড ছিলো। ওদের আজ সায়েন্স পরীক্ষা ছিল। চিরঞ্জীত ঋষভকে টুকলি করতে দেখে। চিরঞ্জীত সঙ্গে সঙ্গে ঋষভের খাতা কেড়ে নেয় কিন্তু টুকলি করা কাগজটা হস্তগত করতে পারেনি তাই কোনো প্রমাণ নেই.....". সব্যসাচীর কানে আর কোনো কথা ঢুকছে না। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো আসা এই হঠাৎ আঘাতে সে যেনো বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে। শুধু বাণীব্রতবাবুর একটা কথাই তার হৃদয়ঙ্গম হলো " সিদ্ধান্ত তোমার, তুমি মনে করলে ঋষভকে শাস্তি দিতে পারো আবার মনে করলে চিরঞ্জীতকে তিরষ্কারও করতে পারো কারণ টুকলির কোনো প্রমাণ তো নেই"। সব্যসাচী নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে বললো "স্যার আমাকে দুদিন সময় দিন"। টিচারস রুমে তার কিছু সহৃদয় বন্ধু তাকে পরামর্শ দিলো " বুঝছিস না, চিরঞ্জীত তোর ভাবমূর্ত্তিকে কালিমালিপ্ত করতে চাইছে। শিক্ষক হিসেবে তোর এতো সুনাম ওর সহ্য হচ্ছে না। ও ইচ্ছে করে ঋষভকে ফাঁসিয়েছে। ওটা বড্ড মাতব্বর হয়েছে। চিরঞ্জীত কে তুই একটা উচিত শিক্ষা দে তো"। সব্যসাচী সব শুনে শান্ত গলায় বললো "দেবো"। এরপর সব্যসাচী একদম শান্ত চিত্তে বাড়িতে ঢুকল। সুকন্যার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল যেনো শ্রাবণের কালো মেঘ তার মুখকে গ্রাস করেছে আর তার মায়ের মুখেও চিন্তার গভীর ভাঁজ পড়েছে। এরপর সে স্বগতোক্তির ঢঙে বলল " আমি ভাবতে পারছি না চিরঞ্জীত এমন একটা কাণ্ড ঘটাতে পারে, তোর সাথে আমার শত্রুতা কিন্তু তা বলে তুই আমাদের বিবাদের মধ্যে আমার বাচ্চা ছেলেটাকে টেনে আনবি, আমার নিরীহ ছেলেটাকে তুই এভাবে ফাঁসালি"। সুকন্যা ও তার শাশুড়ি যেনো নিজেদের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। তারা ধাতস্থ হতে কিছুটা সময় নিল তারপর সুকন্যা বলল " ভাবো একবার, আমার সোনা ছেলেটাকে কিনা এইভাবে অপদস্থ করলো, তোমার সঙ্গে ওনার শত্রুতার খেসারত কিনা আমার ছেলেকে দিতে হল"। ঋষভের ঠাকুমাও ঋষভের পক্ষ নিয়ে বলল " আমার দাদুভাই কখনও একাজ করতে পারে না, তুই দেখিস ওর যেনো কোনো ক্ষতি হয়ে না যায়"। সব্যসাচী বলল " হ্যাঁ আমি জানি তো মা, তুমি চিন্তা কর না, আমি তোমায় কথা দিচ্ছি যে আমি তোমার নাতির কোনো ক্ষতি হতে দেবো না"। ঋষভ বাবা-মা-ঠাকুমার পুরো কথোপকথনটা শুনে মনে একটু বল পেলো। সব্যসাচী ঋষভের গালে আলগা স্নেহজনিত টোকা মেরে বলল" তুই চিন্তা করিস না বাবা, আমি থাকতে তোর কোনো ক্ষতি হতে দেবো না"। সুকন্যার ধড়ে যেনো প্রাণ এলো, কত্তা যে বুঝেছে আমাদের ঋষভ কোনো দোষ করেনি এতেই ঢের হয়েছে বাকীটা ও ঠিক বুঝে নেবে। পরের দিন সব্যসাচী যথারীতি ইস্কুলে গেলো, ক্লাসও নিলো এবং অফ পিরিয়ডে টিচারস রুমেও বসলো, বেশ কিছু সহকর্মী বন্ধু চিরঞ্জীতের নামে তার কানও ভারী করল। আজ কিন্তু সে সবকিছুতেই নির্লিপ্ত থাকলো এবং সারাদিন

চিরঞ্জীতকে একটু এড়িয়েই চলল। এখন রাত দশটা বাজে। ঋষভ রাতের খাওয়া দাওয়ার পর বাকী থাকা কিছু হোমটাস্ক সারছে। সুকন্যা রান্নাঘরে টুকিটাকি কিছু কাজ করছে। ঘরে এখন শুধু বাপ আর বেটা। বাবা ছেলের সাথে ইয়ার্কি- মজা শুরু করল। পরিবেশটা একদম হালকা হয়ে যাওয়ার পর সস্নেহে ছেলেকে জিগ্যেস করল "তোর কি সায়েন্স টা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে" প্রশ্নটা শুনে ঋষভের বুকটা ছ্যাঁত করে উঠলো। ঋষভ আমতা আমতা করে কিছু একটা বলতে যাবে তখনই মোক্ষম প্রশ্নটা তার দিকে ধেয়ে এলো। " তুই চিরঞ্জীতের চোখ এড়িয়ে টুকলির কাগজটা কীভাবে সরালি?" ঋষভের যেনো পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে, সে নিতান্তই অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। সে বুঝতে পারলো তার শিক্ষক পিতার চোখ সব কিছু বুঝে ফেলেছে। এখন বাবার রক্তচক্ষুর সামনে দোষ কবুল করা ছাড়া কোনো গতি নেই। পরের দিন সব্যসাচী ইস্কুলে প্রধান শিক্ষকের ঘরে ঢুকল, দেখলো বাণীব্রত বাবুর পাশের চেয়ারে ইস্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির দন্ডমুন্ডের কর্তা বসে আছেন। সব্যসাচী বলল "স্যার চিরঞ্জীতকে ডেকে নিন, আজই তো ঋষভের ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্ত জানানোর দিন"। চিরঞ্জীত আসার পর সব্যসাচী শুরু করলো " স্যার ঋষভ সত্যই অন্যায় করেছে। ও যে টুকলি করছিলো সেটা ও কাল রাতে আমার কাছে স্বীকার করেছে। আপনি ও কে যথাযথ শাস্তি দিন।" ঘরে উপস্থিত সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেলো। বাণীব্রত বাবু বলল " আমি জানতাম সব্যসাচী তুমি এরকমই কিছু একটা সিদ্ধান্ত জানাবে কারণ তোমার সততার ওপর আমার পূর্ণ আস্থা ছিল তাই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভারটা আমি তোমার ওপরই ছেড়েছিলাম। তবে আমরা ভেবেছি যেহেতু ঋষভ প্রথমবার এই অন্যায় করেছে তাই ও কে আমরা সতর্ক করে ছেড়ে দেবো, ওর ক্লাস প্রোমোশনটা আটকাবো না। তাছাড়া দেখলাম ওর হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষাতে সায়েন্সে ভালো মার্কই আছে"। এসব শুনে সব্যসাচী বলল " তাহলে স্যার ঋষভ আমার ছেলে বলে ও এই অতিরিক্ত সুবিধাটুকু পাচ্ছে নাহলে গত বছর ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভাতে তো সিদ্ধান্ত নেওয়াই হয়েছিলো যে বাৎসরিক পরীক্ষায় কোনো ছাত্রছাত্রী অসদুপায় অবলম্বন করলে তাকে চরম শাস্তি স্বরূপ ঐ ক্লাসেই আরো একবছর রেখে দেওয়া হবে। ঋষভ একই দোষ করেছে তাই ওর একই শাস্তি পাওয়া উচিত। এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভারটা যখন আপনি আমাকে দিয়েছেন তখন আমার পুরো সিদ্ধান্তটাই আপনার শোনা উচিত"। সব্যসাচীর কঠিন মনোভাবের কাছে বাণীব্রত বাবু হার মানলেন। সহকর্মীদের টিকা টিপ্পনী সব্যসাচীর কানে আসছে " সততার পরকাষ্ঠা, নিজে মহান হওয়ার জন্য ছেলেটাকে বলির পাঁঠা করল.....ইত্যাদি"। সব্যসাচী কিন্তু নিজের বিবেকের কাছে পরিষ্কার। সে এই সিদ্ধান্তটা নেওয়ার আগে অনেকবার নিজের মনকে প্রশ্ন করেছে যে সে ঠিক করছে কিনা। প্রতিবারই সে উত্তর পেয়েছে হ্যাঁ এটাই একমাত্র পথ। দীর্ঘমেয়াদে ঋষভের উন্নত চরিত্র গঠনের জন্য এছাড়া আর কোনো পথ তার কাছে খোলা ছিল না। বাড়িতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সুকন্যা বলল "তুমি এত বড় অভিনেতা আমি জানতাম না"। মা বললেন " তুই এটা কি করলি বাবা"! সব্যসাচী সব শুনে বলল " ঋষভের ভবিষ্যতের কথা ভেবে এই অভিনয়টুকু আমাকে করতে হল নাহলে ও ভয় পেয়ে যেত এবং আমার কাছে সত্যিটা স্বীকার করত না। আর মা, আমি তোমায় কথা দিয়েছিলাম যে ওর কোনো ক্ষতি হতে দেবো না। এই সিদ্ধান্তটা না নিলে ঋষভের বিরাট ক্ষতি হয়ে যেতো। ওর উন্নত চরিত্র গঠন বাধাপ্রাপ্ত হতো"। এরপর সব্যসাচী ঘরে ঢুকে ঋষভের মাথার এলোমেলো চুলগুলোতে হাত বুলিয়ে বলল " এবার থেকে সব বিষয় আমি তোকে পড়াবো। পরের বছর তোকে ক্লাসের তিনজনের মধ্যে একজন করবো। এটা তোর বাবা হিসাবে নয় বরং তোর শিক্ষক হিসাবে আমার চ্যালেঞ্জ"। ঋষভ বাবার বুকে মুখ গুঁজলো।

গুচ্ছকবিতা

অরুণ চক্রবর্তী

কী হবে ভেবে

অসময়ে জেগে উঠে শুনছি, পাহারাদারের বাঁশি,
কুকুরেরাও সজাগ করছে,
রাত জেগে তারা,
আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে।

দিনে কি আমরা নিরাপদ?
দ্বিপদ জীবেদের তাণ্ডবে কতটা নিশ্চত,
সময়ের স্রোতে সব একাকার।

অচেনা জগত এক, সময়ের স্রোতে গা ভাসানো,
নীরব দর্শকের ভূমিকায় অসহায় মানুষ,
প্রতিবাদের ভাষা ক্ষীণ,
প্রতিরোধের বার্তাবাহকেরা দিশেহারা।

স্ফুলিঙ্গ জ্বলছে হৃদয়ে,
জাগ্রত জনতাকে পথ দেখাতে পারবে কারা?
রয়েছে নিভৃতে জ্বলন্ত নক্ষত্রেরা,
দিন বদলের কাণ্ডারী অপেক্ষমান।

একটা কবিতা লিখতে চাই

একটা কবিতা লিখতে চাই, ভাষা খুঁজে পাইনা,
লুকিয়ে থাকে শব্দ,
পাইনা খুঁজে।

দেশপ্রেম – রাজনীতির গভীরে ডুবে
জাতীয়তাবোধ কোটের পকেটে,
হারিয়ে যাওয়া রঙিন স্বপ্ন খুঁজে বেড়াই।

রাস্তার মোড়ে যখন দেখি ক্ষুদিরামকে
নিয়ে যুবকেরা মালা দিচ্ছে,
বুক চিতিয়ে সীমান্তে সেনা প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে,
খুঁজে পাই –
খুঁজে পাই অনেক ভাষা।

রঞ্জন পাড়ুই

প্রেম সংগ্রাম

তুমি প্রেমে বসাও প্রহরা, কালে কাল
তুমি মনে মনে দিয়েছ আগল, করাল জাল।

ধর্ম-কারা করেছ খাড়া, যুগ যুগ
তন্ত্র-মন্ত্র-দোয়া-দরুদ , দিয়েছ হুজুগ ;

খড়্গ-তন্ত্রে নিভাতে চেয়েছ প্রেমের প্রদীপ
শাসন ভিতে গেঁড়েছ কত, নিষেদ বাঁধা দ্বীপ

আজ নয় আজ নয়, ফেলে আসা দিন
দাস-তন্ত্র লর্ড-তন্ত্র বাজার-তন্ত্র সব
একই দিন;

প্রেমের মন বাঁধা, হাত বাঁধা, পা বাঁধা
চোখ তুলে নাও, পাথর মার, দাও শুলি কত ধাঁধাঁ;
সেকাল একাল একই যাঁতাকল, মূল্য-দখল ফাঁদা।।

প্রেম-বচনে বিদ্ধ তুমি খ্রিষ্টকে দিলে শূল
ত্রস্ত হয়ে এই তো সেদিন মনসুর আলহাজকে করলে
গুম!

অবতার নামায় গিলেই ফেললে বুদ্ধকেও
তারও আগ-বেলাতে সভ্যতার সে প্রত্যুষে
ঋষি বাণীকেও করেছ তোমার ফেউ।

পারোনি কেবল ইউসুফ-জেলেখা ঠেকাতে
পারোনি মোজেসকে আটকাতে।
চরম হারে বন্দি হলে মরুর বুকে: প্রেম ও প্রতিকার ;
কটা বছর কাটতে দিয়ে আবার ছড়ালে মোহজাল --
নিষিদ্ধ প্রেম-বাণী-সংগীত
তোমার হাদিস-কাদিসে ফুঁৎকার।

কাল গোনা শেষে, হাজার বছর পর
ধরণী পেল আবার প্রেম-মণিহার;
জার্মান প্রেমেই দিলে বিংশের বিপ্লব উপহার!

মুখ লুকোনো তুমি, ধ্রুব নিশান নামালে
নখ-দন্ত আস্ফালনে করলে শুরু তান্ডব!
প্রেমহীন নির্মম, একচ্ছত্র রব!

কাল-প্রবাহে জেগে উঠে একদিন
প্রেম-অস্ত্রে শানদেয়, ওই যে প্রেমিক
ভারত মহাসাগর তীরে
তোমার জাল কাটে, জাল বোনে ধীরে
বিশ্ব-ক্যানভাসে দেখি, কেবল চাঁদ ফুল আর পাখি
কোথা সে দুষ্ট পাশবিক!

কাল সমরে হারায় নীল-নির্মম
জেগে রয় শান্ত-সবুজ চরাচর।।

দিল্লি চলো!

কার জন্য এ রণসাজ!
জলকামান, রোড-ব্লক, ডিভাইডার, বেরিকেড আর
কুচকাওয়াজ!

খালি হাত-পা খালি গা, মাঠের লোক
তাদের সাথে লড়তে দেখ, তোমার রোখ
শীতের বেলা ঠান্ডা মেখে মানুষগুলো হাঁটছে দেখ,
স্লোগান মাখা রাস্তা চলে দিল্লি চল!

স্পর্ধা কত! দিল্লি যাবি?
সর্বনাশা ভাবনা কেন, অক্কা পাবি!

হরিয়ানার কুরুক্ষেত্রে কৃষক ধোঁকে,
জলকামান আর বেরিকেডের ফাঁদের ঠেকে!

চাই কী তারা? ছি ছি মান গেল ছাই!
দেখ সবাই বর্ডার না পেরোয়...

বন্দি, বন্দি কর, সব কটাকে
দাও পাঠিয়ে প্রয়োজনে মামলা ঠুকে!

আমার আইন আমার পুলিশ আমার লেঠেল
বলে কিনা বদলাতে তা এত ঘেঁটেল!

বেশ করেছি, কৃষি মুক্তি!
যতই বল, কর্পোরেটের বাজার যুক্তি(!)

লাভ কিছু নেই, লাভ কিছু নেই হাম্বা ডাকে
পাঠিয়ে দেব যাকে যখন শ্বশান ঘাটে...

পুবের সূর্য তবু ওঠে, ভুলেই থাক
অন্ধকারের নিকশ হাতে, নিজেকে ঢাকো

রাত পোহালে, সূর্য তোমায় দেখিয়ে দেবে
চিনিয়ে দেবে, জানিয়ে দেবে, ধরিয়ে দেবে

তখন কোথায় ঢাকবে বলো, নগ্নতার লজ্জা মাখা দৃষ্টি
তোমার?
দিল্লি তখন অনেক নিকট
শ্বেত রঙ এর হন্যে খোঁজ মিলবে নাকো
সূর্য ওঠা ভোরের রঙ রক্ত যে গো!

ক্রোড়পত্র

লক ডাউন পর্বের রচনা

গল্প-কবিতা-নিবন্ধ

গল্প

আব্দুল মোমিন	৫ টি গল্প	২৭
কিংশুক সন্ন্যাসী	২ টি গল্প	৩৫
বরুণ শ্যেন	৫ টি গল্প	৩৭
শ্রীচেতনিক	১৪টি গল্প	৪২
কস্তুরী	৫টি গল্প	৫৫
ফিরোজ অনীক	১২টি গল্প	৬২
তানিয়া খাতুন	১০টি গল্প	৭৬
ইকবাল হোসেন	৪টি গল্প	৮৬
সুকৃতি	৬টি গল্প	৯০
তুষার ভট্টাচার্য	৩টি গল্প	৯৭
ভাস্বর রুজ	২টি গল্প	১০০
নীলকণ্ঠ	৫টি গল্প	১০২
প্রভাস গোস্বামী	১টি গল্প	১০৬

কবিতা

শ্রীচেতনিক	১০৭
রঞ্জন পাড়ুই	১১০
আল আমিন	১১৩
পিয়ারুল ইসলাম	১১৪
রাজেশ	১১৫
বিলাস	১১৬

সম্পাদকীয় নিবন্ধ

ধর্ষণ ও প্রতিবাদ	১১৭
নয়া শ্রম আইন	১১৯
নতুন কৃষি আইন	১২১
চাকুরি	১২৩
অর্থনীতির মহাধস	১২৫
রক্ষণকামী বিজ্ঞান ও ধর্ম	১২৭

গল্প

আব্দুল মোমিন এর গল্প

আঁচ

মাঝেরহাট থেকে ইডেন গার্ডেন যাওয়ার স্টাফ স্পেশাল ট্রেনের জন্য 5 নম্বর প্লাটফর্মে করোনা ভয় সত্ত্বেও দলে দলে লোক দাঁড়িয়ে আছে। দুজন শাকসবজির আকাশছোঁয়া দাম নিয়ে কথা বলছে। বলছে, কৃষকরা এবার প্রচুর দাম পাচ্ছে। আমরা চাকুরিজীবী মানুষ, কী করে এত দাম দিয়ে শাকসবজি কিনব । এই ব্যাপারে সরকার কেন নজর দিচ্ছে না? পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অমিত তাদের গল্প শুনতে থাকে। অমিতকে দেখে ওই ব্যক্তি বলে, কী বলো ভাই, শাকসবজির এত দাম! আলু 35 টাকা কেজি, পিয়াজ 40 টাকা কেজি। আগুন লেগেছে বাজারে। শাকসবজিতে হাত দেওয়া যাচ্ছে না। কৃষকরা দাম পাচ্ছে আর আমরা চাকুরিজীবী মানুষ, মাইনে ছাড়া তো আর আমাদের তেমন কিছু নেই। তাতে কি সংসার চলে। দিদি বলছে আলু কুড়ি টাকা কেজি। কোথায় আলু কুড়ি টাকা? দিদির কথা কেউ শোনে?

সাড়ে 10 টার ট্রেন চলে আসে। সকলেই ট্রেনে ওঠে পড়ে। চাকুরিজীবী দুজন সামনের ভেন্ডরেই উঠে বসে। অমিত ওদের সামনে হ্যাঙ্গার ধরে দাড়িয়ে থাকে। চাকুরিজীবী দুজনের গল্প ট্রেনেও চলতে থাকে। তাদের পাশের সিটে পরনে পরিষ্কার সাদার মধ্যে নীল সরু ডোরা কাটা জামা, আগের দিনের ঢোলাঢালা কালো প্যান্ট সঙ্গে খাকি রঙের খাদির বেল্ট দিয়ে ইন করা, পায়ে কালো ফাইবারের হালকা চটি যার আঙ্গুলের আংটি কাটা, গোড়ালির দিকটা ক্ষয়ে খুব পাতলা হয়ে গেছে। কালো বর্ণের 45 বছরের এক মানুষ শুষ্ক জড়ো হওয়া ত্বক, বকরা চোয়াল দেখে মনে হচ্ছে 60 বছরের বৃদ্ধ।

—বাবু, আমি আলু বেঁচেছি 150 টাকা প্যাকেট আর পেঁয়াজ বেঁচেছি 8 টাকা কেজি। আমি তো দাম পাইনি? আমি 7 বিঘা জমি চাষ করি। আমি, আমার বউ আর ছেলে প্রায় দিনরাত জমিতে কাজ করি। কোনো রকমে দুবেলা খাবার জোটে। ছেলেটাকে পড়াতে পর্যন্ত পারলাম না। দেখুন না আমার নাতনি খুব অসুস্থ, সাহায্য তো দূর গাড়ি ভাড়াটাও নেই। তাই একটু সেজেকুজে এই (স্টাফ স্পেশাল) ট্রেনে চেপেছি।

—পাচ্ছেন না তো সবজির এতো দাম কী করে হচ্ছে?

ভদ্রলোকের কথা শুনে অমিত বলে, কৃষকরা ফসলের দাম পাচ্ছে না। দাম পাচ্ছে বিক্রেতা আর ক্রেতার মধ্যভোগীরা। মধ্যভোগীরা ফসল ওঠার সময় ফসলের দাম কমিয়ে মজুত করছে আর দেড় দুমাস যেতে না যেতেই ফসলের দাম আকাশ ছোঁয়া। প্রশাসন মধ্যভোগীদের কিছু বলছে না । তাদের মজুত খাদ্য সিজ করছে না। হিম ঘরগুলো সিল করছে না। কারণ কেন্দ্র সরকারের দল বা রাজ্য সরকারের দল তাদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা পায়।

বিপরীত দিকে বসে থাকা গৌর বর্ণের, গণেশের মতো ভুঁড়ি, চোখে কালো চশমা, সাদা রঙের মেটাল ঘড়ি বারবার হাত ঝাকিয়ে ঠিক করছে আর তার বন্ধুকে বলছে, দিদিই ট্রেন চালানোর পারমিশন দিচ্ছে না। তার জন্যই সকলকে দূর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

অমিতের কথোপকথন শুনে গৌর বর্ণের ব্যক্তি অমিতের পাশের হ্যাঙ্গার ধরে দাঁড়িয়ে কৃষকের উদ্দেশ্যে বলতে থাকে, আমাদের প্রধানমন্ত্রী কৃষি বিল পাস করেছে। কৃষকরা এবার স্বাধীনভাবে ফসল বেচতে পারবে। কৃষক হা করে শুনতে থাকে। কিছুই বুঝতে পারছে না।

গৌর ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আর কৃষক নিয়ে বলার মধ্যে ছেদ টানার জন্য তার দিকে ঘুরে অমিত

বলেন, একটু আগে আপনার বন্ধুকে বলছিলেন, দিদি ট্রেন চালানোর পারমিশন দিচ্ছে না । আপনি বলেন পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া আর কোথায় সাধারণ নাগরিকের জন্য ট্রেন চলছে? শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন চালানোর জন্য রাজ্য সরকারের কি কোন পারমিশন লেগেছিল? রেল কেন্দ্র সরকারের, তাতে রাজ্য সরকারের করার কী আছে?

অমিতের কথা শুনে ভ্যাবাচাকা খেয়ে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে কৃষকের কথা বন্ধ করে গৌরবর্ণ ব্যক্তি বলে, মুম্বাই চলছে?

অমিত তার চোখে চোখ রেখে বলে, সেটা কি সাধারণ নাগরিকের জন্য? আর কোন কোন রাজ্যে সাধারণ নাগরিকের জন্য ট্রেন চলাচল করছে? কেন চলছেনা? চাকুরিজীবীদের অফিস যেতে হচ্ছে, সাধারণ নাগরিকদের কাজে বের হতে হচ্ছে। যাত্রীবাহী গাড়িতে সাধারণ মানুষ ঠাসাঠাসি করে বাঁদরঝোলা করে যাতায়াত করছে । কোথাও কি ডিসটেন্স মেনটেন করা যাচ্ছে? নাকি ট্রেন বন্ধ রাখার অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে?

বিনাবাক্যে শুনতে থাকা গৌরবর্ণ ব্যক্তির বন্ধু অফিস ব্যাগ কাঁধে নিয়ে অমিতের পাশে হ্যাঙ্গার ধরে দাঁড়িয়ে বলে, তাইতো! দেশে কোথাও তো সাধারণ নাগরিকের জন্য ট্রেন চলছে না। মিথ্যে কথা বলতে গিয়ে ধরা পড়ে যাওয়ায় নিরীহতার ভান করে নির্বিকার হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

গলা দিয়ে আগুন বেরিয়ে আসার মত করে অমিত আবার বলে, কৃষকদের যে স্বাধীনতার কথা বলছেন, সেখানে আমি একটু বলছি, আমাদের দেশের মোট ফসলের মাত্র 6 শতাংশ সরকার কৃষকদের থেকে কেনে। এই সরকারই মাণ্ডিগুলির সংস্কার আর সংখ্যা বৃদ্ধি না করে সেগুলোর উপর আরো বিভিন্ন প্রকার কর বসিয়ে সেগুলিকে ধ্বংস করে বেসরকারি সংস্থাগুলিকে সুবিধা পাইয়ে দিচ্ছে। তাতে বেসরকারি সংস্থাগুলি ফসল মজুত রেখে কৃত্রিমভাবে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য 99গুন বৃদ্ধি করতে পারবে। আপনি বলুন আমাদের দেশের কতজন কৃষক পশ্চিমবঙ্গ থেকে উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ গিয়ে ফসল বিক্রি করতে পারবে? স্বাধীনতা! ওরা তো নিজের গ্রাম ছাড়া অন্য গ্রামে গিয়েই ফসল বিক্রি করতে পারে না। আর হ্যাঁ আপনাদেরও তো স্বাধীনতা রয়েছে 50, 60 km গিয়ে গ্রামের কম দামের বাজারে গিয়ে ফসল কেনার, সবজি কেনার। তাতে আপনাদেরও আগুনের ছ্যাকা লাগবেনা, টাটকা সতেজ সব পাবেন আর কৃষকরাও সরাসরি দাম পাবে।

দরিদ্র কৃষকটি অমিতের সব কথা শুনে দাঁড়ানোর জন্য হ্যাঙ্গার ধরার চেষ্টা করে কিন্তু হাতে না পেয়ে ট্রেনের গায়ে হাত দিয়ে দাড়ায়। সকলের মধ্যে নিস্তব্ধতা আসে। শুধু লোকাল ট্রেনের বিকট আওয়াজ শোনা যায়। ইডেন গার্ডেন স্টেশনে ট্রেন থামলে সবাই নেমে যায়।

পেটি

মাস্টার, কিরণ, রাজু একটি ডাইনিং এর মেঝেতে বসে গল্প করছে । মাস্টারের বেশ ভুঁড়ি থাকার কারণে ভালোভাবে বসতে না পেরে প্রাচীরে ঠেস দিয়ে পা দুটি রাজুর দিকে ছড়িয়ে দিয়ে বসে মোবাইলে সিনেমা দেখছে। রাজু নামায পড়ার মতো করে বসে বটি দিয়ে মরিচ, পেঁয়াজ কাটছে আর কিরণ ডাইনিং এর পাশে সিঁড়ির ধাপিতে বসে মোবাইলে লুডু গেম খেলছে। ডাক্তারের বউ জুলি রান্নাঘরে সকলকে খাবার পরিবেশনের জন্য ব্যস্ত আছে। কিছুক্ষণ পর জুলি কয়েকটি আলু সিদ্ধ রাজুকে দিল পেঁয়াজ মরিচ দিয়ে আলুভর্তা করার জন্য। জুলি রান্না করে ওভেন ধরিয়ে প্রেশার কুকার চাপিয়ে দিয়ে ভাতের হাড়ি, থালা, জলের বোতল একে একে ডাইনিং এর মেঝেতে রাখে। সবশেষে প্রেসার কুকারটি নিয়ে এসে মাস্টারকে বলে - তুমি পা দুটি সরাও না সবাই খেতে বসবে তো। রাজু তোমার আলুভর্তা হলো? কিরণদা নিচে এসো,খেতে বসবে।

কিরণ - কী সবজি করেছ?

জুলি- মাংস আলুতে কষা।

কিরণ - প্রতিদিন মাংস! তোমরা সবজি ডাল করো না?

জুলি - তোমার দাদা মাংস না হলে ভাত খায় না। সবজি পাতেই নেবে না।

কিরণ - আপনি একজন মাস্টার মানুষ। ভালোভাবেই জানেন সবজির গুনাগুন। আর আপনি মাংস ছাড়া ভাত খান না। (মাস্টারের দিকে তাকিয়ে)

জুলি শোনো কালকে আমার জন্য অল্প ডাল আর সবজি রান্না করবে তো।(জুলির দিকে তাকিয়ে)

খাওয়া শেষে মাস্টার আর কিরণ দ্বিতলার ঘরে চলে যায়। মাস্টার বিছানায় শুয়ে যায়।

মাস্টার - এস কিরণ শুয়ে যাও।

কিরণ - না। খাওয়ার পর পনেরো থেকে কুড়ি মিনিট না শুয়ায় ভালো। বরং চলাফেরা করলে খাবার ভালোভাবে পাচিত হয়। আর এজন্যই আপনার ভুঁড়ি বেড়েই যাচ্ছে। মাস্টারদা একটা কথা বলি এই করোনার সময় আপনি সতর্ক ভাবে চলেন। মুখে মাস্ক আর ঘনঘন স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন। কলকাতায় করোনার সংক্রমণ বেশ ছড়াচ্ছে। আর আপনাদের বাড়িতে যে এত মানুষের আনাগোনা তাতে সংক্রামিত হওয়ার অনেক সম্ভাবনা আছে। কে কোথা থেকে আসছে তার ঠিক ঠিকানা নেই। মানুষের আসা-যাওয়া টা বন্ধ করার চেষ্টা করেন।

মাস্টার - ধুর! আমাদের করোনা হবে না।

কিরণ - কেন হবে না?

মাস্টার- মুসলিমদের কোথাও করোনা হচ্ছে শুনতে পাচ্ছ?

কিরণ - রোগ কোনো জাত দেখেনা। তাহলে সৌদি আরব, ইরান, ইরাক মুসলিম দেশ। সেখানে কেন করোনা মহামারী দেখা দিচ্ছে ?

(এই কথা শুনে মাস্টার বিছানা থেকে উঠে যায়। বিছানার তলা থেকে একটি জলের বোতল নিয়ে জল খায়। তারপর ঘরের বাইরে থেকে হেঁটে এসে আবার শুয়ে মোবাইল টিপতে থাকে।)

মাস্টার- আরব আর আরব আছে নাকি? সেখানে সিনেমাহল তৈরি হচ্ছে।

কিরণ - আপনি সিনেমাহলের কথা বলছেন, আপনার দৃষ্টিতে সিনেমা দেখা খারাপ। তাহলে আপনি কেন সিনেমা দেখেন? আর সৌদি আরব যে ইসলাম অনুযায়ী চলছে না তাহলে লক্ষ লক্ষ মানুষ কেন সেখানে হজ করতে যায়?

(মাস্টার উঠে বসে যেভাবে সদ্য বসতে শেখার শিশুরা পা ছড়িয়ে বসে, ভুড়ি চুলকায়, লুঙ্গিটা ভালো করে বাঁধে, হালকা শীতের দিন ঘরে ফ্যান চলছিল তা সত্ত্বেও গরম লাগছে বলে বিছানা থেকে উঠে গিয়ে জানালাটা খুলে দেয়।)

মাস্টার - তুমি নাস্তিকের মত কথা বলছো।

(কিরণ রেগে যায়, পায়চারি বন্ধ করে খাটে ঠেস দিয়ে দাড়ায়)

কিরণ - তাহলে আপনি বলেন হজের কোটি কোটি টাকা কিভাবে সমাজের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে?

উত্তর না দিয়েই বাথরুম যেতে হবে বলে মাস্টার নিচে চলে যায়।

মিনিট পাঁচেক পর জুলি কাশতে কাশতে ঘরে ঢুকে।

কিরণ - তোমার(জুলি) বেশ সর্দি কাশি হয়েছে দেখছি। সর্দি-কাশি কবে থেকে?

জুলি - চোদ্দো পনেরো দিন থেকে হচ্ছে।

কিরণ - ওষুধ খাচ্ছো না?

জুলি- মাস্টারকে বারবার বলছি কিন্তু শুনেই না। আজ যেন বেশি মাথাটা ভারী ভারী করছে।

ওঠো দেখি বিছানা ঠিক করে দিই।

(জুলি বিছানা ঠিক করে দিয়ে জামা-কাপড় ভাঁজ করে আলমারিতে রাখতে থাকে।)

মাস্টার বাথরুম থেকে এসে ঘরের বাইরের বারান্দায় পায়চারী করছে।

কিরণ - ডাক্তারদা ভেতরে আসুন। জুলির বেশ সর্দি কাশি হচ্ছে। গুরুত্ব দিয়ে ব্যাপারটা দেখুন। এগুলো আবার করোনার লক্ষণ। বেশি কিছু হয়ে গেলে হাসপাতাল হাসপাতাল দৌড়ে বেড়াতে হবে। এখন হাসপাতালে পেসেন্ট ভর্তি নিচ্ছে না। তখন বিশাল সমস্যা দেখা দিবে।

মাস্টার - রোগ কি করে ভালো হবে। নিয়ম করে তো ওষুধ খায় না। জিজ্ঞেস করো এখনো কতটা ওষুধ বাকি আছে।

জুলি- ওষুধ দুদিন আগেই শেষ হয়ে গেছে।

(কিরণ আলাদা ঘরে ঘুমাতে চলে যায়।)

দিন কয়েক পর একটি দোকানে মাস্টার আর মাস্টারের বন্ধু গল্প করছেন। কিরণ তাদের গল্প শুনছে।

বন্ধু- যতীন ডাক্তার চিকিৎসা বাবদ মারা গেলেন। এত রোগী দেখতেন যে তিনি সবসময় চাপ এর মধ্যেই থাকতেন। তিনি টাকা ছাড়া কিছু চিনতেন না । আর অনেক মহিলার সাথে তার সম্পর্ক ছিল।

(যতীন ডাক্তারের চেম্বারে মাস্টারের বন্ধু কাজ করে)

মাস্টার - বেশ কয়েক দিন থেকে তার জ্বর সর্দি কাশি হচ্ছে। তিনি নিজেই সেগুলোর কি ট্রিটমেন্ট করতেন না?

বন্ধু - রাত্রি দশটার সময় তার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। তার পরিচিত বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে নিয়ে যায়। কিন্তু তারা করোনা ভয়ে এডমিশন নেয় নি। আটটা বেসরকারি হাসপাতাল ঘুরে শেষে সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসা শুরু হওয়ার আগেই তিনি মারা যান।

(কিছুক্ষণ গল্প করেই মাস্টারের বন্ধু চলে যান।)

দিন দুয়েক পরে সন্ধ্যেবেলায় হঠাৎ পাশের ঘরে কান্নার আওয়াজ শুনতে পাই। কিরণ দ্রুত সে ঘরে যায়। জুলি খাটের উপর হেলান দিয়ে বুকে হাত ঘষছে আর কান্না করছে আর মাথা এদিক ওদিক করছে।

কিরণ- কী হয়েছে ? জুলি ওরকম করছে কেন?

মাস্টার লুঙ্গি পরে খালি গায়ে জুলির পায়ে হাত দিয়ে বসে আছে। কোনো কথা বলছে না। ফ্যালফ্যাল করে একবার কিরণের দিকে তাকাচ্ছে আর একবার জুলির দিকে তাকাচ্ছে।

জুলি বুকের ব্যথা আর শ্বাস প্রশ্বাসের সমস্যা আরও বেড়ে চলেছে।

কিরণ - মাস্টার ওঠেন জামা প্যান্ট পরে নিন । শীঘ্রই ডাক্তার-খানা নিয়ে যেতে হবে। একটি এম্বুলেন্স বা গাড়ির ব্যবস্থা করুন।

মাস্টার দুই একজনকে ফোন করার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদেরকে ফোনে পাই না। মাস্টার অস্থির হয়ে পড়ে। কিরণ এদিক ওদিক করে। বুঝতেই পারছে না মাস্টার কেন একটি গাড়ির ব্যবস্থা করছে না। একটি নেবুলাইজার মেশিন তার মুখে লাগিয়েছে । কিন্তু তাতে সমস্যা কমছে না। পাশের বাড়ির মানুষ জন এসে হাজির। তারাও হা করে তাকে দেখছে। কারো মুখে কোন কথা নেই। মাস্টার এসে কিরণকে বলে - কোথায় নিয়ে যাব? কেউতো এডমিশন নেবে না? ঘুরে ঘুরেই হয়তো মারা যাবে।

প্রায় ঘন্টা খানেক পর জুলি কিছুটা সুস্থ হয়। পাশের বাড়ির মানুষ সব আস্তে আস্তে চলে যায়।

দিবাকর

বাবার ছোট ছেলে দিবাকর। দাদাদের আগেই বিয়ে হয়ে গেছে। দিবাকরের খামখেয়ালীপনার জন্য বাবা-মা তার মাসির মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেয় । বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় বাড়ি হওয়ায় যতদিন গরু পারাপার ছিল তত দিন তাদের কোন সমস্যা ছিল না। বর্ডার সিল হয়ে যাওয়ার কারণে গরু পারাপার বন্ধ হয়ে যায়। শুরু হয় আর্থিক অনটন। বাবা-মা ভাবে ছেলেকে পৃথক না করলে কাজ করে খাবে না। পৃথক করে দেয়।

ছোটবেলা থেকে আদরের ছেলে দিবাকরের কাজ করার অভ্যাস ছিল না। দিবাকর কী করবে ভেবে পায় না। অস্থিরতায় ভুগতে থাকে। শুরু হয় মদ, গাজা খাওয়া। সংসারে আরোও অভাব-অনটন বাড়তে থাকে। সমানে বাড়তে থাকে স্ত্রীকে মারধর। স্ত্রী, ছেলেমেয়ে কী খাচ্ছে কী করছে সব খোঁজখবর নেওয়া বন্ধ করে দেয়।

একদিন সন্ধ্যেবেলায় বন্ধুদের বৈঠকে একজন বলে, গোয়া থেকে কাজ করে অসীমরা অনেক টাকা এনেছে। দিবাকর তাদের সাথে যোগাযোগ করে। পাঁচ হাজার টাকা ধার নিয়ে তিন হাজার বাড়িতে দেয়, এক হাজার টাকা দিয়ে টিকিট কাটে, আর এক হাজার টাকা সঙ্গে নিয়ে গোয়া পাড়ি দেয়। ওখানে মাস দুয়েক কাজ করে ধার শোধ করে।

এখন প্রতিদিন রাত্রে স্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথা বলে। স্ত্রীকে আর বকে না, গালিগালাজ করে না। ছেলেমেয়েরা কী করছে, কী খাচ্ছে, স্কুল যাচ্ছে কিনা সমস্ত খোঁজখবর নেয়। বাবা-মায়ের খোঁজখবর নেয়। স্ত্রী ও ছেলে মেয়েদেরকে অনেকদিন কোনো পোশাক কিনে দেয়নি। তার ইচ্ছে পোশাক কিনে দেওয়ার। তাই প্রতিদিন অতিরিক্ত সময় ধরে কাজ করে।

করোনা সংক্রমণের কারণে হঠাৎ করে সরকার লকডাউন ঘোষণা করে। কাজ বন্ধ হয়ে যায়। দু-তিন দিন যেতে না যেতেই এলাকাবাসী শ্রমিকদের বাড়ির মালিককে চাপ। শ্রমিকরা যেন বাড়ি চলে যায়। রাত্রিবেলায় শ্রমিকরা ব্যাগপত্র নিয়ে হাঁটতে শুরু করে। কারণ সকাল বেলায় হাঁটলে পুলিশ দেখে নেবে আর বেধড়ক মারবে। দিনের বেলায় জমিতে, গাছের নিচে বা নদীর পাড়ে শুয়ে থাকে আর রাতের বেলায় রওনা দেয় বাড়ির উদ্দেশ্যে।

ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত ক্লান্ত শরীরে গাছে হেলান দিয়ে দিবাকর স্ত্রীকে ফোন করে বাড়ির খবর নেয়। স্ত্রী বলে আমি এই দিক ঠিক দেখে নেবো। তুমি ভালই ভালো বাড়ি ফিরে এসো।

শ্রমিকরা জানতে পারে গোয়া থেকে উড়িষ্যা পর্যন্ত এরোপ্লেন চলবে। পশ্চিমবঙ্গে প্লেন ওঠানামা করছে না। সবাই বাড়িতে ফোন করে টাকা পাঠানোর কথা বলে। কিন্তু দিবাকরের তো টাকা নেই। সে কীভাবে প্লেনের টিকিট কাটবে! সঙ্গে থাকা বন্ধু মিলন তার টিকিট কাটার টাকার ব্যবস্থা করে। প্লেনে করে উড়িষ্যা পৌঁছয় । শুরু হয় আবার রাত্রিতে হাঁটা। যেমনটি সীমান্তে সৈনিকরা সারিবদ্ধ ভাবে নীরবে টহল দেয়।

ক্ষুধা-তৃষ্ণায় প্রত্যেকে দুর্বল হয়ে পড়ে। একদিন পুলিশ তাদের তাড়া করে। সকলে পালিয়ে যায়। কিন্তু দিবাকর দুর্বল শীর্ণ হওয়ায় ধরা পড়ে যায়। বেধড়ক মার খায়। মারের আঘাতে পায়ের একটি হাড় ভেঙে যায়। আর হাঁটতে পারে না। পড়ে পড়ে শুধু কান্না করে। উড়িষ্যা পুলিশ তাকে হাজার পাঁচেক টাকা দেয় এবং তাদের সকলের জন্য বাড়ি যাওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা করে দেয়।

প্রথম দিন বাবা-মা ও মেজো ভাই ফল নিয়ে অসুস্থ ছেলেকে দেখতে আসে। পায়ের একটা বড় অপারেশন করতে হবে। অর্থের অভাবে অপারেশন করতে না পারায় দিবাকর চিরদিনের জন্য পঙ্গু হয়ে পড়ে।

মুর্শেদ ঠিকাদারের দিনরাত্রি

কলকাতায় তিন চার জায়গায় ঠিকাদার মুর্শেদ এর অধীনে প্রায় 500 জন শ্রমিক পাইপ লাইনের কাজ করে। সুগার আক্রান্ত গণেশের মতো ভুঁড়ি। মাথার চারপাশে রং করা কালো কুচকুচে লম্বা চুল দিয়ে টাক মাথা ঢেকে রাখে। ব্র্যান্ডেড চশমা, জুতো ও জামা প্যান্ট পরে। শ্রমিকদের সাথে গম্ভীর হয়ে, গালিগালাজ করে চেঁচিয়ে কথা বলে। মোড়ের মধ্যে চেঁচিয়ে মানুষ জড়ো করে অগ্রিম টাকা নেওয়া শ্রমিককে অপমানিত করে রসিকতা করে। শ্রমিকের মাথা পিছু টাকা কেটে আর কোম্পানির যন্ত্রপাতি বেচে বেশ টাকা জমিয়েছে।

কয়েক দিন থেকে ঠিকাদার মোড়ে তেমন আসছে না। প্রায় প্রতিদিনই তার স্ত্রীকে গাড়িতে করে ডাক্তারখানা নিয়ে যাচ্ছে। মোড়ে এলে মানুষের পাশে বসে থাকে কথাবার্তা বলে না, অধিক সময় একাই ঘুনসি মেরে বসে থাকে। কৌতূহলবশত কেউ তাকে কী হয়েছে জিজ্ঞাসা করলে, সে কিছু উত্তর দেয় না। দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছে।

একদিন তার স্ত্রী তাকে নিয়ে মৌলবির কাছে যায়। মুর্শেদ বলে, আমি রাতে ঘুমাতে পারিনা। স্বপ্নে কখনো বাঘ তাড়া করছে, কখনো মহিষ শিং দিয়ে গুঁতাচ্ছে। শুয়োর ঘোঁত- ঘোঁত করে। কালু মাস্তান আমাকে মেরে সমস্ত টাকা-পয়সা কেড়ে নিচ্ছে। আমি গরীব হয়ে গেছি। কে যেন আমার বুকের উপর চেপে বসে। কথা বলতে পারি না। শ্বাস নিতে পারি না।

আলগায় পেয়েছে ভেবে মৌলবি মুর্শেদের স্ত্রীর আনা এক বোতল তেল, এক বোতল জল, একটি কার পড়ে দেয় এবং তিনটি মাদুলি দেয়।

ঠিকাদার রোজ সকালে ও রাতে এক গ্লাস করে জল মিশিয়ে পড়া জল খায়। গলায় হাতে আর কোমরে মাদুলি বাঁধে। সারা গায়ে, মাথায় সব সময় তেল মেখে থাকে।

ডাক্তারের দেওয়া স্নায়ু নিষ্ক্রিয় করা ওষুধ খেয়ে কিছুটা সুস্থতা লাভ করে।

করোনা আবহে কন্ট্রাকটর টাকা দেয়নি বলে শ্রমিকদের টাকা আত্মসাতের কারবার তার চলতেই থাকে। টাকার জন্য শ্রমিকরা তার বাড়ি গেলে বিভিন্ন অছিলায় গালিগালাজ করে শ্রমিকদের তাড়িয়ে দেয়। সমানে আগের মতো স্বপ্নে চেতনা তাড়িত হতে থাকে আর গোঁ গোঁ করে ঘুমের মধ্যে চেঁচাতে থাকে। মৃত্যু ভয়ে সন্ধ্যা হলে বাড়ি থেকে একা বেরোতে পারে না। রাতে একা ঘুমাতে পারে না।

এই রকম সময়ে একদিন তার কাছে বাঁধা এক শ্রমিকের স্ত্রী এসে হাজির। সে তার স্বামীর মজুরি চায়তে এসেছে। কীসের টাকা, সব পেমেন্ট করে দিয়েছি ইত্যাদি বলে মেয়েটিকে সে বিদেয় করতে চায়।

মেয়েটি যাবার আগে তার উদ্দেশ্যে বলে, এভাবে ঘাম-জল এক করা টাকা মেরে নিলে, আল্লা একদিন ঠিকই তোমার বিচার করবেন।

আল্লা তার বিচার করেছিল কিনা জানা যায়নি। তবে কয়েক বছরের মধ্যে রাজনীতিতে যুক্ত হয়ে সে এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান হয়েছিল।

দিশা

টাক মাথা, হাতে হেলমেট, কাঁধে ব্যাগ 45 বছর বয়সি একজন মানুষ কলেজস্ট্রিট থেকে ধর্মতলাগামী বাসে গেটের সামনে সিনিয়ার সিটিজেন সিটে বসে আছেন। বাস ফাঁকা থাকায় ড্রাইভার এর পাশে লেডিস সিটে 40 বয়সের উর্ধ্বে কয়েকজন ব্যক্তি বসে আছেন। বাস কনডাক্টর গেটে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে থাকে– ধর্মতলা ধর্মতলা বাবুঘাট হাওড়া । কনডাক্টর হেলমেট ওয়ালা ব্যক্তির কাছে ভাড়া চাইতে গেলে ওই ব্যক্তি বলেন– তুমি যে বললে সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ধর্মতলায় পৌঁছে যাবে? এখন পৌনে ছয়টা বাজছে।

বাবু কাল লকডাউন। বিভিন্ন গাড়ি রাস্তার সাইডে পার্কিং করছে। তাই বেশি জ্যাম হচ্ছে। কী করবো বলেন তো? আপনারাও পারেন ধর্মতলার বাসটাই আর পাওয়া যাবে না। চারিদিকে মিথ্যাচারে ভর্তি হয়ে গেছে।

মাথা নিচু করে, মুখ কাচুমাচু করে ভাড়া নিয়ে কিছু না বলেই গেটে গিয়ে আবার চেঁচাতে থাকে, ধর্মতলা ধর্মতলা বাবুঘাট হাওড়া।

কিছুক্ষণ পর আবার ওই ব্যক্তি কনডাক্টরকে বলে– আপনাদের কারণে আমি আজ ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারবো না। আমার বাড়ি যেতে সমস্যা হয়ে যাবে। কনডাক্টর কিছু না বলে বাইরের দিকে মুখ করে চেঁচাতে থাকে।

মেঘলা আকাশের জন্য পৌনে ছটাতেই অন্ধকার হয়ে গেছে। বাস জ্যামে দাঁড়িয়ে আছে। গেট দিয়ে রাস্তার পাশে বড় বটগাছের নিচে বন্ধ ত্রিফলা ল্যাম্পপোস্ট দেখিয়ে একটু উচুস্বরে ওই ব্যক্তি ড্রাইভার এর পাশে লেডিস সিটে বসে থাকা মানুষদের দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করে- দেখেছেন চোরেদের অবস্থা, ল্যাম্পপোস্ট গুলো দিয়ে কী হয়েছে? মানুষের উপকার হয়েছে ? যা হয়েছে ওই পার্টিটার আর চোরেদের। মানুষ বুঝিয়ে দিবে, এবার ঠিক বুঝিয়ে দেবে ভোট দিয়ে। 'রাজা বলে একবার প্রজা বলে বারবার' প্রবাদের মতো লেডিস সিটে বসে থাকা মানুষগুলো সম্মিলিত ভাবে বলতে থাকে, হ্যাঁ হ্যাঁ এবার বুঝিয়ে দেবে।

কথোপকথন শুনে বাসের পেছনের সিটে বসে থাকা একটি কলেজ পড়ুয়া ছাত্র কালো রঙের বইয়ের ব্যাগ কাঁধ থেকে খুলে পায়ের উপর রেখে হেলমেট ওয়ালা মানুষটির পাশের সিটে বসে। হাতে সেনিটাইজার ঘষতে ঘষতে ছেলেটি সবার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করে– কাকে ভোট দেবেন? সকলে চুপ হয়ে যায়। মানুষটি ছেলেটার দিকে কিছুটা ঘুরে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে নরম কণ্ঠস্বরে জিজ্ঞাসা করে- তোমার নাম কী ভাই?

নামের সাথে প্রশ্নের কী কোনো সম্পর্ক আছে? আপনি বুঝি মুসলিম কাউকে খুঁজছেন? বলুন কাকে ভোট দেবেন?

সামনে পেছনে সবার দিকে তাকিয়ে, রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে, মাথার মাস্ক ঠিক করে হেলমেট ওয়ালা ব্যক্তিকে আবার বলে- আপনি যেসব নিয়ে আলোচনা করছেন বা অন্যরা যেসব নিয়ে আলোচনা করছে সে সবগুলিই হচ্ছে সমস্যা। যেসব সমস্যায় আমরা সকলে জর্জরিত। সেগুলো নিয়েই কাঁটাছেঁড়া করছি। আপনি বলুন এর সমাধান কী? কী হবে আমাদের পথ? কে দেখাবে আমাদের মানবতামুখীন পথের দিশা? কোন পথে আমরা চলবো? যাতে আমাদের বেকারত্বের সমাধান হবে, সার্বিকভাবে মানুষের উন্নতি ঘটবে। জাতি-ধর্মের নামে, আঞ্চলিকতার নামে, দলের নামে মেরুকরণ বন্ধ হবে।

তুমি বলো দিদি কী ঠিক কাজ করছেন?

না। দিদি ঠিক কাজ করছেন না। আপনি বলুন কে কাজ করছে? কাকে ক্ষমতায় নিয়ে আসতে চাইছেন।

তুমিই বলো আমাদের কী করতে হবে?

তাহলে আপনার কোনো সুচিন্তিত ভাবনা নেই। আপনিও একজন দিশাহারা মানুষ। আর দিশাহারা মানুষ কখনো মানুষকে মুক্তির পথ দেখাতে পারে না। আপনি বরং ওই দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষদের কে অন্ধকারের দিকে চালিত করছেন। যা একজন রক্ষ

করে থাকে।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতি মুক্ত ভারত গড়ে তোলায় সচেষ্ট হয়েছেন।

ওহ! আচ্ছা! তাহলে আপনি একটি দলের হয়ে অন্য দলের বিরুদ্ধে কথা বলছেন। আপনি আত্মখোলস থেকে অন্যের বিরুদ্ধে কথা বলছেন। লুকিয়ে থেকে কথা বলা রক্ষেরই কাজ।

আপনি বলুন কেন আপনার দলকে ভোট দেব? তারা মানুষের তথা দেশের উন্নতির জন্য কী রূপরেখা তৈরি করেছে? যা সকলে অনুসরণ করবে।

আরো কিছু পিঠে বইয়ের ব্যাগ ছাত্র ওই তর্ক করা ছাত্রের পাশে এসে দাড়ায় এবং ছাত্রটিকে সাপোর্ট করে। ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে হেলমেট এক হাত থেকে অন্য হাতে বদল করে মানুষটি কনডাক্টরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করে- আর কতক্ষণ লাগবে ধর্মতলা যেতে?

...স্যার এই জ্যাম পার হলেই ধর্মতলা।

আর আপনার জ্যাম! হেলমেট নিয়ে নেমে যায়। আর বলে আমার আগেই চলে আসলে আমাকে তুলে নিও।

কিছুক্ষণ পরেই জ্যাম খুলে যায়। কনডাক্টর হাসিমুখে ওই ব্যক্তিকে বারবার ডাকতে থাকে। কিন্তু তিনি আর বাসে ওঠেন না।

Mob: 9382128352

M/S Maa Tara Enterprise

(Contractor and Order Suppliers)

Prop:- Mangal Das

3rd Ghari North • P.O +P.S– Kakdip

DIST– S. 24 Parganas

Mob. 9382128352

কিংশুক সন্নাসী এর গল্প

কানা

আমি তো কোনো কালে বাজার যাইনি। তুই তো পুজোর শাড়ি দিতে চাইছিস। কানাই দুমাস আগে নিয়ে গিয়েছিল। কি জানি তার একটা কাগজে সই করতে হলো। বললো, বাঙ্কে তোমার একটা একাউন্ট করে দিলাম।-- মাধাই এর কথা শুনে মা বললো।

তিন ভাই এর মা সুরবালা মণ্ডলের বসত ভিটে সাকুল্যে ৩০ শতক। সেই জমি কানাই মাকে ভুলিয়ে লিখে নিয়েছে। যগাই ও মাধাইকে বাদ দিয়েই। তাদের মা লেখাপড়া জানেন না।

কয়েকদিন পর যগাই ও মাধাই মিলে তাদের মাকে লালবাগ বাজারে নিয়ে যায়। প্রথমে তারা মাকে সুন্দর শাড়ি কিনে দেয়। কায়দা করে জমি রেজিস্ট্রি করে। দুদিন বাদে তারাই প্রচার করে, কানাই মায়ের থেকে সব জমি লিখে নিয়েছে।

কানাই বলে হ্যাঁ, আমি লিখেছি, আমার যতটা অংশ আছে। তোমরা তো সবই লিখে নিয়েছো। মা তুমি এই কেন করেছো।

আমি কি লেখাপড়া জানি। তোরা যখন যা বলছিস, তখন তাই করছি।

আমি তো সব জমি নিই নি।

সেটা তোর দাদাকে বল।

দাদা ও তার ছোটো ভাই মিলে গ্রামের অন্যান্যদের নিজেদের বক্তব্যের সপক্ষে করতে শুরু করল।

কানাইও দেখলো কিছু করার নেই। সে ভাবে কীভাবে জমি নেওয়া যায়।

মামাকে ডেকে মাধাই সব বলল।

মামা বললেন, দেখ, তোর বাবা মারা যাওয়ার পর, আমি অনেকভাবেই তোদের সহযোগিতা করেছি। কিন্তু তোরা সকলে মিলে তোর মাকে, এমনকি আমাকেও না জানিয়ে এই জট পাকিয়ে ফেললি। একটা সমাধান কর। এখন একটা দলিল কর। সকলেই যাতে অংশ মোতাবেক থাকে।

মাধাই বলল, আমাদের পাকা দলিল কীভাবে বাদ যায়। যগাই বলল না, না, আর কোনো দলিল হবে না। সে আমাদের না জানিয়ে লিখেছিল। আমরাও লিখেছি। সে পারলে দলিল বাদ দিক। এর সমাধানের কী আছে?

কিছুদিন বাদে শোনা গেল। কানাই আবার কীভাবে সবই জমি তার মার থেকে নতুন দলিল করে লিখে নিয়েছে।

দালালদের চক্রে ভাই, ভাই এর শত্রু হল। দুই ভাই মিলে কানাই এর মাথা ফাটিয়ে দেয়। প্রতিবেশীরা তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে।

থানা-পুলিশ-কেশ-উকিল-ডাক্তার-মহুরির পেট বোঝায় করে তারা ক্ষান্ত দেয়। উপায়ান্তর না দেখে তিন ভাই এ মামার স্মরণাপন্ন হলে নিষ্পত্তি হয়।

মামা বলেন, জল পান করতেও করলি, কিন্তু ঘোলা করেই করলি।

সরীসৃপ

সেন্ট্যা রে সিমেন্টের দোকানে গেলি ন্যা, ক্যাল জি ছাদ ঢালাই করতে হবে।

আব্বা আমি তো ক্যাল সকালে গেছিল্যাম, সিমেন্ট আলা বলেছে চুরি করে মাল দিতে হবে। দাম বস্তায় ১০০ টাকা বেশি ল্যাগবে। লক ডাউন চলছে।

হ্যা রে রড যুদি আগে কিন্যা না থ্যাকতো, তাহলে তো আজ অনেক টাকা গাচ্ছা লাইগতো রে। কিন্তু প্রত্যেকদিন ঝড় ম্যাঘ করছে, মাথা গোঁজার যে চালা তুললি, তা তো এক ঝাপটায় উড়্যা যাবে। না না যেমন কর্‌্যা হোক ঢালাইট্যা না করলে থাকা যাবে না।

আব্বা তার কাছে তো আগেই ধার আছে। দোকানি বুল্যাছে, এই বাজারে ধার দিতে পারবে না। সবাই সিমেন্ট চাইছে।

তুই বেশি বকিস ন্যা। আগে যা তো। দ্যাখ কী বলে।

সেন্টু সিমেন্টের দোকানে যায়। ঘর ভেঙে পাকা ঘর করছে সেন্টুর বাবা পিয়ারুল। এক রকম জান মেরেই তার এই বাড়ি হচ্ছে।

আব্বা সিমেন্ট আলার সাথে কথা বুলল্যাম। দিবে কিন্তু লগদ টাকা লিবে। টাকা ছাড়া মাল দিবে না। সে বুল্যাছে, তার নাম যেন কাউকে না বুলি।

পিয়ারুল পরের দিন কোনো রকমে টাকা জোগাড় করে সিমেন্ট আনে। ঢালাই এর কাজ শুরু হয়। ঢালাই চলছে, এমন সময় ডাক আসে, পিয়ারুল ভাই, পিয়ারুল ভাই, এদিকে একটু আস্যেন।

কাপাসডাঙ্গার সুদখোর সাল্লাম এসে হাজির। এলাকার মাস্তান গোছের ব্যক্তি। চুরি ডাকাতিসহ নানান অসামাজিক কাজেও যোগ আছে বলে শোনা যায়। মেম্বার-প্রধানের দালাল রূপে থাকে।

কী বুলছেন সাল্লাম ভাই।

আপনি এই লকডাউনের মধ্যে ঢালাই করছেন। পুলিশ আসলে তো ধর্‌্যা লিয়্যা যাবে সবাইকে।

কী করবো ভাই, আজ সাতদিন থেকে সেন্টারিং হয়্যা পড়্যা আছে। ঝড়-ম্যাঘ হল্যে রডগিলি জং ধর্‌্যা যাবে।

সে তো ঠিক আছে, কিন্তু সরকার কী আপনার কথা শুনবে। দেখছেন না সব বন্ধ কর্‌্যা দিয়্যাছে। আমাদের কে নজর রাখত্যে বুল্যাছে প্রধান-মেম্মার। বার বার প্রচার হচ্ছে, আপনি শুনতে পাচ্ছেন না।

কী করবো ভাই, লোকজন লাগিয়্যা দিয়্যাছি।

কাজ বন্ধ করেন। শুনেন, এদিকে আসেন। দ্যাখেন এরকম কর্‌্যা কাজ করলে ঝামেলা। দেখি একটা বিড়ি দেখি। আমি সব ম্যানেজ করবো। আর কাউকে কিছু বুলবেন না। দেন ৫ হাজার টাকা দেন।

সাল্লাম ভাই, আপনারা তো জানেন, আমি সরকারি বাড়ি পাইনি। ব্যাটাটা বিদ্যাশে খাটতোক বল্যা কোনো রকমে এই দুখ্যান ঘর তুল্যাছি। সব দোকানে ধার আছে। আজ সিমেন্ট আনল্যাম তাও ধার কর্‌্যা। বেশি টাকা দিয়্যা।

কী বুলছেন সব। ওসব কথা কী আর পুলিশেরা শুনবে। সিভিকর্‌্যা সব ঘোরাঘুরি করছে। তাদের বুল্যাছি, আমি দেখছি। আর এই টাকা কি ভাবছেন আমি লিব।। সব থানাতে দিতে হবে।

পিয়ারুলের মাথাতে কিছু কুলায় না। তার ছেলে সেন্টু আসে। বাপ-ছেলে তর্কাতর্কি বেধেঁ যায়। ছেলে বলে, আমি তোমাকে কত কর্‌্যা মানা করল্যাম শুনল্যা না।

পিয়ারুলের স্ত্রী এসে সব শুনে বলে, যে টাকাটা ধার কর্‌্যা জোগাড় কর্‌্যাছো সেখ্যান থ্যাক্যা ২ হাজার টাকা না হয় দ্যাও।

সাল্লাম ভাই, নেন বিড়ি খান। এই ২ হাজার টাকা রাখেন।

কী বুলছেন তাই হয়। আমাকে তো বিপদে ফেল্যা দিলেন। থানাকে কী কর্‌্যা ম্যানেজ করবো।

আপনাকে আগেই তো বলল্যাম ভাই, ধারের উপর ঢালাই করছি। ঢালাই এর লোক গুল্যাকে এই টাকাটা দিবো বুল্যা রাখ্যাছিনু।

দ্যাখেন এই কথা আর কাউকে বুলবেন না। দেখি কী করা যায়।

সাল্লাম টাকা নিয়ে বাইক চড়ে কাপাসডাঙ্গার মোড়ের দিকে চলে যায়। যত তাড়াতাড়ি পারবেন ঢালাই শেষ করেন।

পিয়ারুল মনে মনে বলতে থাকে, শোরের বাচ্চারা যা না ঐ শিমুল ডাঙ্গার জাব্বারের ঢালাই এর টাকা লিতে।

বরুণ শ্যেন এর গল্প

আশীর্বাদ

অনন্যা সারারাত ঘুমোতে পারে না। দারুণ একটা এক্সাইটমেন্ট। কখনো চোখ খোলা রেখে, কখনো চোখ বন্ধ করে ভাবতে থাকে। নানা রকমের কল্পনার জাল বুনতে থাকে সে।

শ্বাশুড়ি মা তাকে দারুণ ভালোবাসে। কোনো কাজ করতে দিতে চায় না। অনন্যার খুব খারাপ লাগে। সে রান্না করতে ভালোবাসে। শ্বাশুড়ি মাকে অনেক বুঝিয়ে ম্যানেজ করে। শ্বশুর মশাই বড়ো বড়ো চিংড়ি নিয়ে এসেছে। অনন্যা নারিকেলের দুধ দিয়ে মালাইকারি করেছে। সবাই খুব প্রশংসা করছে। সৌভিক তো মিষ্টি হাসি দিয়ে চোখের ইশারায় তারিফও করে।

সৌভিক স্কুল যাচ্ছে পরিপাটি হয়ে। গলায় টাই পরিয়ে দেয় অনন্যা। সৌভিক জড়িয়ে ধরলে 'ধ্যাৎ!' বলে লজ্জায় দূরে সরে যায়। স্কুল থেকে সৌভিক বাসায় ফিরলে শ্বশুর শ্বাশুড়িকে কফি করে দিয়ে নিজেদের জন্য কফি নিয়ে সৌভিক ও সে ছাদে যায়। সন্ধ্যার আকাশে তখন আবির ছড়ানো। সৌভিক বারবার অনুরোধ করে গান শোনানোর জন্য। অনন্যা কফিতে একটা চুমুক দিয়ে চোখ বন্ধ করে শুরু করে.... 'এই সুন্দর স্বর্ণালি সন্ধ্যায়, এ কী বন্ধনে জড়ালে গো বন্ধু...'

'এই অনন্যা, দিদি' অনন্যার ছোট বোন অরণ্যা নাড়া দেয় অনন্যাকে। অনন্যার গান থেমে যায়, অরণ্যা বলে, 'এতো রাতে গান গাইছিস কেন? আমার ঘুম ভেঙে যাচ্ছে তো।'

সকালে ঘুম ভাঙতে একটু দেরি হয় অনন্যার। অন্যদিন খুব সকালেই ওঠে, রাত করে শুয়েছে বলেই হয়তো দেরি হল। চারিদিকে তখন একটা রৈ রৈ ভাব। বাড়ির বড়ো মেয়ের বিয়ের দিন হবে বলে কথা। পিসিমা , কাকিমারা সকাল থেকেই ব্যস্ত। অনন্যার একমাত্র বৌদি শিবানী অনন্যাকে দেখে টিপুনি কাটে, এই যে মাস্টারের বৌ, আমরা খেটে মরছি আর তুমি রাজরানির মতো ঘুমোচ্ছো।

সকলের সামনে এ ভাবে সম্বোধনে লজ্জা পায় অনন্যা। 'ডাকোনি কেন?' বলে সেও তাদের সঙ্গে যোগ দেয়।

দুপুরে সৌভিকের বাড়ির লোকদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে অনন্যাকে সকলের সামনে সাজিয়ে নিয়ে আসে তার বৌদি। বিয়ের দিন ঠিক হওয়ার আগে আশীর্বাদটা হয়ে যাবে। সব পর্ব মিটে গেলে ছেলের বাবা অনন্যাকে বলেন, মা বিয়ের পর তুমি আর গান করতে চেও না। ওসবে বাড়ির পরিবেশ নষ্ট হতে পারে।

অনন্যা অসহায় বোধ করে। কী বলবে বুঝতে পারে না। বাবার দিকে ছলছল চোখে চায় অনন্যা। হবু বেয়াই-এর কথা শুনে অনন্যার বাবা হরিমোহন বাবুও শকড। মেয়ের করুণ মুখ দেখে আর চুপ থাকতে পারলেন না। বললেন, আপনাদের অপমান করার জন্য বলছি না, তবে আপনি একজন শিক্ষিত, আপনার ছেলেও একজন স্কুল টিচার, এই রকম শিক্ষিত পরিবার থেকে এটা প্রত্যাশা করিনি! আমার মেয়ে ভালো গান গায়, যে পরিবার আমার মেয়ের গান কেড়ে নিতে চায়, ভালোলাগা কেড়ে নিতে চায়, সেখানে আমি আমার মেয়ের বিয়ে দেব না।

না এরপর আর অনন্যার বিয়ের দিন ঠিক হল না। সৌভিকের পরিবার আর কথা না বাড়িয়ে ফিরে গেল। রাতে অনন্যাকে ফোন করে সৌভিক। সৌভিক পরিচয় দিলে জানালার কাছে গিয়ে অনন্যা বলে, বলুন।

জানালার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো পড়তে থাকে অনন্যার মুখের উপর।

অপরিচিতা

একজন পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিহিতা মহিলা এসেই জানতে চাইল, বাবা কেমন আছো?

আমি সহাস্য মুখে জানালাম, ভালো আছি। আপনি কি আমাকে চেনেন!?

'না, আসলে তোমার মতোই আমার একটা ছেলে আছে। জানো ও খুব ভালো।'

'আচ্ছা, তো আপনার ছেলে কী করে?'

'একটা দোকান দিয়েছে। দোকানটা খুব ভালো চলে। দেখে শুনে একটা বিয়েও দিয়েছি।'

আমি সহাস্য মুখে বললাম, তা বেশ তো। আপনি এখানে বসুন।

পাশের ফাঁকা জায়গাটা দেখিয়ে দিলাম। উনি না বসেই বললেন, জানো, ছেলেটা বৌমাকে নিয়ে তার শ্বশুর বাড়ি গেছে...

আমি হাসি হাসি মুখে জানতে চাইলাম, কবে গেছে? মন খারাপ করছে নাকি ছেলে বৌমার জন্য?

'সে তো করছেই... তবে ওরা চলে আসবে খুব তাড়াতাড়ি।.... জানো, আজ সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয় নি।'

তার একথা শুনে অবাক হই। ছেলে শ্বশুর বাড়ি গেছে বেশ কথা। তার সঙ্গে না খেয়ে থাকার যোগটা মাথায় আসে না। ছেলে ব্যবসা করে, অভাবের তো কোনো কারণ থাকার কথা নয়!

পাশেই একটা স্টল ছিল। দশ টাকা দামের একটা কেকের প্যাকেট কিনে তার দিকে বাড়িয়ে দিলাম। উনি বললেন, তুমি খুব ভালো, কিন্তু আমাকে ভিখিরি ভাবছো না তো?

নানা প্রশ্নের ঝড় দূরে সরিয়ে ব্যস্ত হয়ে বললাম, না না। আপনি আমাকে আপনার ছেলের মতো বলেছেন, আমি কি তা ভাবতে পারি! তাছাড়া কোনো ভিখিরিই এমন সুন্দর ভাবে ভিক্ষে করতে পারবে না।

কেকের প্যাকেটটা কেটে আমার দিকে বাড়িয়ে দেয়, বাবা, তুমিও নাও।

আমি নিতে না চাইলে একরকম জোরাজোরি করে। স্বর্গবাসী মায়ের মুখটা আমার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে ওঠে। একটা কেকের পিস নিয়ে মুখে দিলে তবেই তিনি কেক খাওয়া শুরু করলেন।

'বাবা তোমাকে আর বিরক্ত করবো না, আসি, ভালো থেকো।' মহিলা চলে যায় হাসি মুখে। স্টলটি থেকে এক বোতল জল নিতে নিতে তার ব্যাপারে জানতে চাইলাম।

লোকটি জানায়, মহিলার স্বামী নেই। তার স্বামী ছিল জাত মাতাল। সরকারি চাকরি করতো একটা। কিন্তু বিশৃঙ্খল জীবন যাপন করে সব উড়িয়ে দিত। ছেলেকে মহিলা আগলে আগলে বড়ো করে। তার স্বামী মারা যাবার পর, অনেক কষ্ট করে একটা দোকান করে দেয় ছেলেকে। একটা বিয়েও দেয়। আর বিয়ে দেওয়ার পরই সমস্যা শুরু। এখন তারা অন্য যায়গায় ঘর নিয়ে থাকে। পেনশনের টাকা তারাই তোলে। মাঝে মাঝে কিছু হাতে তুলে দিয়ে যায়, ওই টুকুই! মহিলাকে দেখলে বোঝা যাবে না, কিন্তু উনি এখন একজন পাগলি মাত্র!

লোকটি দীর্ঘ শ্বাস ফেলে। আমি দূরের পানে চেয়ে মহিলাকে খুঁজতে থাকি।

প্লাটফর্মের সেডের কার্নিশে কয়েকটি পায়রার বাচ্চার এতক্ষণের কিচিরমিচির শব্দ একটি পায়রা উড়ে এসে বসতেই থেমে গেল।

বস

'এই যে পবিত্র, আয় আয়, ভেতরে আয়।' অম্লান পবিত্রকে ভেতরে ডেকে নেয়। 'দেখি, একটু সাইড দেবেন প্লিজ, একটু ভেতরে যাই' পবিত্র পাশ কাটিয়ে দুটো সিটের ফাঁকা স্পেসে দাঁড়ায়। 'তুই কষ্ট করে একটু দাঁড়া, একটু পর চেঞ্জ করি?' হাসি হাসি মুখ করে অম্লান বলে। পবিত্র বলে, ঠিক আছে। পাশে বসে থাকা এক ভদ্রলোক পবিত্রকে বললেন, আপনি এখানে বসুন আমি একটু দাঁড়ায়। 'আমি তো সবে উঠলাম, আপনি ...' পবিত্রের কথা শেষ হওয়ার আগেই ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়েছেন, বললেন, আমার একটু রিল্যাক্সেরও দরকার, আপনি বসুন।

'ধন্যবাদ' বলে পবিত্র সিটে বসে অম্লানের দিকে তাকিয়ে তার শরীর কেমন আছে জানতে চায়। 'শরীরটা খারাপ, সুগার প্রেসার বেড়েছে। তারপরও অফিস কামাই করা যাবে না। শালা চামার বসের পাল্লায় জীবনটা হেল হয়ে গেল।' নধর দেহধারী অম্লান তার বসের চোদ্দগুষ্টি উদ্ধার করে ছাড়ে। 'তোর তো নতুন বস আসছে, মালটা কেমন কিছু খোঁজ নিয়েছিস?'

অম্লানের কথায় পবিত্র এক গাল হেসে বলে, ভালো খারাপ নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই, তা তো জানই। যেই আসুক আমি আমার কাজ করে যাবো। অম্লান ব্যাঙ্গাত্মক হাসি দেয় এবং যা বলে তার সারসংক্ষেপ এই যে, দূর্নীতি আচ্ছন্ন বিশ্বে নিজের কাজ করা খুবই রিস্কের। পবিত্র আবার প্রসন্ন হাসি হেসে বলে, এই জন্যে কৌশল নিতে হবে। যা হচ্ছে হোক তুমি ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হও। দাঁড়িয়ে থাকা ভদ্রলোক দু'জনের কথা শুনছিলেন, পবিত্রকে বললেন, আপনার কথা খুব ইন্টারেস্টিং, কিছু মনে না করলে বিষয়টি একটু ক্লিয়ার করবেন।

পবিত্র বলল, নোংরা কাঁদা জল থেকে হাঁস তার খাবার সংগ্রহ করলেও তার দেহে যেমন কোনো নোংরা লাগেনা, ব্যাপারটা ঠিক এই রকম। যতদিন সমাজ কাঠামো না পালটাচ্ছে ততদিন নিজেকে বাঁচিয়ে মনের চর্চা করে যান। কিছুক্ষণ পর অম্লান মুর্শিদাবাদে নেমে যায়। ভদ্রলোকের সঙ্গে বহরমপুর স্টেশন পর্যন্ত পবিত্র কথা বলতে বলতে আসে। পবিত্র কী করে না করে তিনি সব জেনে নেন। পবিত্র জিজ্ঞেস করে জানতে পারে তিনিও কোনো কাজে বহরমপুরই যাচ্ছেন।

ভদ্রলোক খুব ভালো শ্রোতা, মনযোগ দিয়ে পবিত্রের সব কথা শুনছেন। মাঝে মাঝে দু একটা কথা বলছেন। পবিত্র চেয়ারে বসে একটা ফাইল নিয়ে কিছু কাগজ পত্র বের করে দেখছে। এমন সময় অফিসের পিয়ন এসে তাকে বলে যে বিডিও সাহেব তাকে ডাকছে। পবিত্র দরজা ঠেলে অনুমতি নিয়ে বিডিওর ঘরে প্রবেশ করে স্থির হয়ে যায়। ইনি! নতুন বিডিও! বসের আচরণ কেমন হওয়া দরকার, জনগণের সঙ্গে ব্যবহার কেমন হওয়া দরকার, পলিটিক্যাল ম্যাটার কী ভাবে হ্যান্ডেল করা যায় সে সব বিষয়ে যাকে সে জ্ঞান দিতে দিত আসলেন, তিনিই তার বস! চাকরি জীবনে এই প্রথম নিজেকে পবিত্রের অসহায় মনে হল।

'পবিত্র, দাঁড়িয়ে কেন? আসুন।' বিডিও সাহেবের কথায় একটু নড়ে উঠলো পবিত্র, ধাতস্থ হয়ে বলল, স্যার আমাকে ডেকেছেন? 'হ্যাঁ, বসুন, এক সঙ্গে চা খাব।'

দূরত্ব

একটা নতুন রোগের আবির্ভাব হয়েছে তা সকলেই জানে। একটি মারণ ভাইরাস এতো দ্রুত বিস্তার লাভ করছে যে কোনো ভাবেই তা ঠেকানো যাচ্ছে না। মানুষ তাই খুবই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। এমন অবস্থায় এক জোট হয়ে যে লড়াই করবে তারও উপায় নেই। এক জোট হওয়া খুবই বিপদের।

শরিফুল ইসলাম তার একমাত্র ছয় বছরের প্রাণপ্রীয় সন্তান কে বারবার করে বলে দিয়েছে সে যেন কোনো প্রকারেই বাড়ির বাইরে না যায়। তাঁর সহধর্মিণী, জাহানারা, তাকেও বলে দিয়েছে ছেলেকে চোখে চোখে রাখতে।

জাহানারা ভালো ভাবেই জানে যে অন্যথা হলে তাকে অশ্রাব্য গালাগালি সহ্য করতে হবে, তাই ছেলেকে কোনো ভাবেই বাইরে খেলা ধুলা করার অনুমতি দিত না জাহানারা।

শরিফুল নানা ধরনের দুই নম্বরি করে বড়ো লোক হয়েছেন। বাংলাদেশে হেরোইন, গরু পারাপারের সঙ্গে এখনো পরোক্ষভাবে যুক্ত। একটা হোটেল দিয়েছে শহরে, করোনা পরিস্থিতিতে তা বন্ধ হয়ে পড়েছে বললে ভুল হবে। সেখানে সেই আগের মতই অবৈধ মেলামেশার আশ্রয়স্থল। সন্ধ্যার সময় দিনের সমস্ত উপার্জন বুঝে নিয়ে এবং ম্যানেজার সাহেবকে পুলিশের সঙ্গে ঠিকমত যোগাযোগ রাখার পরামর্শ দিয়ে বাড়ি ফিরলেন।

বাড়ি ফিরে হাত মুখ ধুয়ে সবে খেতে বসেছেন এমন সময় পাশের ঘর থেকে তার ষাটোর্ধ মা এসে চেঁচাতে শুরু করলেন, 'তোর এক ছেলের জন্য সব শেষ হয়ে যাবে। কাজে থেকে সেলিম আজই ফিরেছে, আর তোর ছেলে সেখানে হাজির।'

শরিফুল বিস্ফারিত চোখে জাহানারার দিকে চাইলে জাহানারা বলে, 'চোখ এড়িয়ে বিকেলে বেরিয়ে গেছিল।' জাহানারা আরো বলতে যাচ্ছিল যে, তাদের ছেলে সেলিমদের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত ঠিক মত হতে পারে নি, আঙিনায় সবে গেছিল আর সেখান থেকেই সে তার ছেলেকে টেনে নিয়ে এসেছে। তাতে সেলিমের বাড়ির লোক মর্মাহত হলেও সে ছেলেকে নিয়ে এক মুহূর্ত সেখানে ছিলেন না। কিন্তু এসব কথা শোনার জন্য শরিফুল সাহেব আর স্থির থাকলেন না, 'শালি' বলেই ভাতের থালা ছুড়ে মারলেন জাহানারাকে। কপাল কেটে ঝরঝর করে রক্ত পড়ার মতই অনবরত অকথ্য গালিগালাজ চলতে থাকল।

সকাল বেলায় জাহানারা একবারের জন্য ছেলের হাত ধরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল । নির্বিকার শরিফুল সোফায় পা তুলে টিভি দেখছেন। উত্তর প্রদেশের বিকাশ দুবে নামে এক ব্যক্তির এনকাউন্টারে মৃত্যুর খবর প্রচারিত হচ্ছে সংবাদে।

ড্রাইভার

সুব্রত একজন ড্রাইভার। খুব ভালো গাড়ি চালায়। অফিসের সকলেই খুব ভালো বাসে। শুধু তার মালিক চাপে রাখে। চাকরি খেয়ে নেবার ভয় দেখায়। মালিক সম্প্রদায় বুঝি এমনই হয়।

'শোন, তেল চুরির স্পর্ধা দেখাবি না। আর গাড়ির যত্ন নিবি ভালো ভাবে।' মালিকের ঝাঁঝালো কথায় শুধু মাথা নেড়ে আশ্বস্ত করে সুদীপ্ত।

তিনশো পঁয়ষট্টি দিনই সুদীপ্তের ডিউটি। যেদিন কোনো কারণে ছুটি নেয় সুদীপ্ত, সে দিনগুলোর মাইনে কেটে নেয় মালিক। সুদীপ্ত কোনো দিন কোনো কথা বলে না, ভাবে ভগবান বুঝি তার জীবনটা কষ্টেই মুড়ে রেখেছে।

অনেকে তাকে বলে, কষ্ট করলে কেষ্ট মেলে, দেখিস তোরও দিন ফিরবে।' সুদীপ্তের কাছে এসব কথার মূল্য নেই। তার বিশ্বাস, গরীবদের কষ্টই চিরসঙ্গী।

সেদিন হঠাৎ খবর এলো, তার মেয়ে পড়ে গিয়ে হাত ভেঙেছে। বড়ো বাবুকে বলতেই ছুটি হয়ে গেল। হাতে পাঁচশো টাকা গুঁজে দিয়ে বলে, 'গাড়িটা নিয়ে যা, মেয়ের অবস্থা জানাবি।'

খুব দ্রুত বাড়ি পৌঁছে সেই গাড়িতে করেই মেয়েকে নিয়ে বেসরকারি হাসপাতাল পৌঁছালো। ডাক্তার দেখেই বলে, অপারেশন করতে হবে।

'অপারেশন! ডাক্তার বাবু খরচ কেমন হবে?' ডাক্তারের কথা মত পঞ্চাশ হাজারের কাছাকাছি খরচ হবে। সুদীপ্তের মাথা ধরে যায়।

'হ্যাঁ গো, টাকার ব্যবস্থা হবে কোথা থেকে' বৌয়ের কথায় মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে। ঠাস করে এক চড় কষিয়ে দেয়। বলে, 'বাড়িতে করিসটা কী, একটা মেয়ে তাও দেখে রাখতে পারিস না?'

সুদীপ্তের বৌ গালে এক হাত রেখে ছলছল চোখ নিয়ে বলে, 'বিয়ের পর তুমি একটা আংটি করে দিয়েছিলে, সোনা বলতে ওটাই সম্বল, ওটা বিক্রি করে কিছু হবে। আর বাকিটা এদিক ওদিক থেকে...'

অপরাধ বোধে সুদীপ্তের চোখে জল আসে। চোখের জল আড়াল করে দ্রুত বেরিয়ে যায় সুদীপ্ত। গাড়ি নিয়ে মালিকের বাড়ি যায়। দু মাসের মাইনে পাবে। ষোলো হাজার টাকা। মালিক মাইনের কথা শুনেই তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে। বলে, 'টাকা চাওয়ার বেলায় ষোলো আনা, কাজের বেলায় লবডঙ্কা।'

সুদীপ্ত নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করে। বলে, 'দেখুন প্রয়োজনে আপনি অন্য ড্রাইভার রাখুন, আমাকে আমার পাওনা টাকা বুঝিয়ে দেন।'

'ও শালা, কথার দেখছি ওজন বেড়েছে। আমি অন্য ড্রাইভারই রাখবো। তুমি এখন বিদেয় হও।'

'আমার টাকা?' সুদীপ্তের কথার জবাবে মালিক বলে, 'ওটা ভুলে যাও।'

সুদীপ্তের মাথায় আগুন উঠে যায়, পাশেই একটা বাঁশের খুঁটি ছিল, সেটা এক টানে ভেঙে নিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, 'শালা, তুই যদি এখনই আমার টাকা না দিস তাহলে তোর মাথা আমি ছাতু করে দেব।'

সুদীপ্তের হঠাৎ রুদ্র মুর্তি ধারণে মালিক ভয় পেয়ে যায়। সুদীপ্তের চোখ দিয়ে তখন আগুন ঝরছে।

শ্রীচেতনিক এর গল্প

বেকার পাঁচালী

শুয়োরের বাচ্চারা খালি রাজনীতি রাজনীতি করে! আমাদের মত বেকাররা কেবল তাদের পিছেই ঘুরে মরে। বয়স পেরিয়ে যায়। জীবন শুরুই করতে পারছি না। একটা চাকুরি? কে দেবে? একটা কাজ! - তিক্ত মুখে এক নি:শ্বাসে কথাগুলি বলে ফেলল রাজু। রাজু হালদার।

সন্ধ্যায় পল্টু, বিশু, জাব্বার, রঞ্জিত আর রাজু আখের মিলের কাছের বারান্দায় আড্ডা দিচ্ছিল। সব্বাই ২০১৫-১৬ এর গ্রাজুয়েট। বাড়িতে প্রত্যেকের নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের সব অনুষঙ্গই মজুত।

চাকুরি, একটা চাকুরি! জীবন শুরু করা। প্রেমের পরিণতি! স্বপ্নের বাস্তবায়ন। ছাপোষা স্বপ্ন। খুব বড় কিছু নয়। কেউ মাস্টার্স, বিএড। কেউ ডিএলএড।

জাব্বার বলল, রাজা-রাণি- বাদশা সবই তো যোগ-সাজোশ রে ভাই! এই দেখ না রাজা বলল, নিয়োগ তো নয়ই উলটে ৫০ উর্ধের লোকগুলোকে নাকি ভিআরএস নিতে বাধ্য করবে। রাণির নবান্ন থেকেও শোনা যাচ্ছে অতিশীঘ্রই কর্মী সংকোচন করা হবে। শূন্য পদের অবলুপ্তি!

বিশু বলল, বাদশা? কাকে মিন করছিস?

রাজু বলল, এদের বাপ, বড় কত্তা রে, ট্রাম্প! সেখানেও একই খেল! ওর জমানায় লোকে কাজ পাওয়া দূরের কথা চল্লিশ লক্ষ লোক কাজ হারিয়েছে!

রঞ্জিত এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। সে বললে, বাবার শরীরটা ভাল যাচ্ছে নারে। লোকটা মাঠে খেটে খেটেই শেষ! আমার পেছনেই সব কটা টাকাও শেষ করে দিল! তার একথায় কারুর মুখ দিয়েই কোনো কথা সরলো না।

প্রসঙ্গ পালটে রঞ্জিত বলল, কাল অমিতাভ খবর দিয়েছিল, কী যেন আলোচনা আছে। আগামীকাল। তোরা যাবি?

কী আলোচনা, কোথায়? বিশু বলল। রঞ্জিত বললে ওই যে নাকুড় তলায়। একটা স্টাডি সেন্টার চালায়। সেখানে প্রতি পক্ষে আলোচনা হয়। বারিদপুরের মাস্টার মশাই আসেন। রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি এই সবই আলোচ্য থাকে!

—ধুর! ওসব জ্ঞান ফলানো শোনার সময় নেই। পল্টু বলল।

—হ্যা, তাই তো! তোর যেন কত কাজ? শালা বেকারদের আবার কী কাজ বে? সময় সময় করছিস! ওখানে একদিন গেছিলাম। উনারা তো ঠিকই করছেন। আমাদের জানা দরকার কেন, কারা, কীভাবে এই অন্ধকার নিয়ে আসছে আমাদের জীবনে। যে অর্থনীতি আমাদের জীবনকে চালিত করে তার সাথে রাজনীতি ওয়ালা রাজা-রাণিদের কী সম্পর্ক? জানিস?

—বিশু বলল, ঠিক বলেছিস! যাওয়া দরকার। শুধু তাই নয়। চাকুরি হবে না বলে জীবন তো নষ্ট করা যায় না! রতন মাস্টার উদ্যোগ নিচ্ছে। একটা কারখানা খুলবে। নেইল মেকিং কারখানা।

—ইন্টারেস্টিং। আমরাও তো একটা উদ্যোগ নিতে পারি। চলনা, সবাই কিছু কিছু ইনভেস্ট করে একটা ব্যবসা দাঁড় করাই!

—জাব্বার, কী রে আমরা পারব না?

—চল কাল থেকে একটু জীবনের পাঠ নিই আগে। আমি বলি কি, স্যারের স্টাডিতেই আগে যায়। স্ব-নির্ভরতা কী জিনিস আগে সেটা জানি। তার পর উদ্যোগ।

সবাই রাজি হয়।

পরের বিকেলের স্টাডি সেন্টার। স্যার লেকচার দিচ্ছেন, বেকারত্বের কারণ নিয়ে।

রাজুরা শুনতে পাচ্ছে, শ্রম-মূল্য-মূল্যবিনিময়ের কথা। আর মূল্য কীভাবে পুঁজির পাহাড়ে রূপ নেয়! সামাজিক সম্পদ অর্থাৎ লক্ষ্মীর ভাঁড় কীভাবে শূন্য হয়। আর তা কীভাবে কোন ইঁদুর-সুড়ঙ্গ দিয়ে কেমন করে অ্যান্টি-সোশ্যাল গণেশের ভুঁড়ি মোটা করে। এই বিশ্লেষণটিই যারা আর্থসমাজের কাছে হাজির করে সেই শক্তিই সরস্বতী। সারস্বত আলোচনার সারমর্মই হল আর্থসামাজিক যন্ত্রণার কারণ ও তার প্রতিকার বাচক ইঙ্গিত জ্ঞাপন। উনি বলে চলেছেন, রাজুরা দেখতে পাচ্ছে জীবনের নিয়ম আর তাদের সামনের রাস্তা পরিস্কার হয়ে যাচ্ছে!

ছু কিত কিত প্রেম

–স্বাগতা, জানিস আমাদের প্রেমটা সবার মত না। আলাদা, ব্যতিক্রমী। তাই ব্রেক আপও তেমনি। কারুর প্রতি কারুর অভিযোগ নেই।

–ও সব্বাই তাই বলে! বেশি ন্যাকা সাজিস না, বিদিশা!

– নারে, ওটা আসলে বলা যায় প্লেটনিক লাভ!

–সে আবার কীরে? বিশুদ্ধ প্রেম? নাথিং কারনাল ইন ইট? এই সব তো? এগুলি স্রেফ বলিস না, বুঝলি। জঘন্য লাগে!

– কেন, হতে পারে না?

–না, পারে না। পারার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ দেহহীন মন একটি অলীক ব্যাপার। ভেবেছিস কখনো? তোর মন আছে, কিন্তু শরীর নেই। তুই অশরীরী! প্রেতিনী! হা, হা।

ওসব বাদ দে। ছেড়েছিস কবে, ওকে? এই তো গতকালই দেখা হল। একগাদা গরল উগরে দিল তোর প্রতি। কাকে কী শোনাচ্ছিস?

আর রোহিতের সাথে তোর বাবা যে তোর বিয়ে ঠিক করছে, আমি জানি। আমি এও জানি, তুই এই বিয়েতে খুব খুশি। কারণ, তারা উচ্চঘর! না না, উচ্চ নয় তাদের টাকাকড়ির গুদামগুলি খুব ভরভরন্ত! আর এই জন্য তোকে রাজুর সাথে তোর মাখামাখিটা মানে প্রেমটা মানে ওই ৫ বছরের ছু কিত কিতটাকে প্লেটনিক বানাতে হচ্ছে। তাই না? এবার বল!

– তোকে বলেছে?

– না বললে, যেটা ব্যক্তিগত তাকে সামাজিক বানাতে যাব কেন? আমাকে এতটা নীচ ভাবা তোর উচিত নয়।

বিদিশার মুখটায় কে যেন কালি ঢেলে দিল। কোনো কথা না বলে রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে হনহন করে হাঁটা দিল। পেছন থেকে স্বাগতা বললে, আরে থাম, থাম। পালাচ্ছিস কেন? একেই বলে উচিৎ কথায় বন্ধু ব্যাজার!

বিএ সেকেন্ড ইয়ার থেকে রাজু মল্লিকের সাথে বিদিশা গুপ্ত আঠার মত লেগে আছে। ছেলেটি মেধাবী। ডানপিটে। দেখতে সুন্দর। বিদিশা কেন ওর বান্ধবীদের অনেকেই ওকে পছন্দ করত। কিন্তু বিদিশা গুপ্ত একটু ডাকাবুকো আর কিঞ্চিত বেশিমাত্রার ওপেন এন্ডেড হওয়ায় অন্যদের কপালে শিকে ছেড়েনি।

অনার্স শেষ করে মাস্টারস ফাইনাল ইয়ার রাজুর। পলিটিক্যাল সায়েন্স। নিডি পরিবার। চাকুরির সম্ভাবনার কথা কেউ জানে না।

আর তাতে বিদিশার বাবা রবীন্দ্র গুপ্ত যখন রোহিত শর্মার সাথে বিয়ের কথা বললেন বিদিশা না করেনি। কারণ সে জানে শর্মাদের ব্যবসা ও সম্পত্তির কথা।

বিদিশার বান্ধবী স্বাগতা কেবল নয়, সকলেই জানে দিঘা-মন্দারমণি-মংপুতে বিদিশা গুপ্ত আর রাজু মল্লিকের প্রেমের কুজনের কথা।

যথারীতি মন্ত্রপাঠ ও বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেল।

বলাবাহুল্য সেই বিয়েতে স্বাগতা নিমন্ত্রিত হয়নি।

রিপু

ঘোষ সাহেব রাজ্য পঞ্চায়েত দপ্তরের বিশেষ সচিব। তার অধীনে একটি সেল কাজ করছে আজ তিন বছর থেকে। আমলাদের জীবন ২৪*৭ ডিউটি। বউ কলকাতার কাছের একটি কলেজের শিক্ষিকা। একমাত্র মেয়ে ইকনোমিক্সে মাস্টার্স কমপ্লিট করে হার্ভার্ড থেকে পিএইচডি করছে।

সল্টলেকের ফ্ল্যাট বাড়িটায় এখন দুটি মাত্র প্রাণী। তাও ঘোষ সাহেব কখন বাড়ি ফেরেন ঠিক নেই। স্ত্রী সুনেত্রা দেবীর কলেজ সেই মার্চ থেকে বন্ধ। কিন্তু সরকারি দপ্তর তো বন্ধ নয়। আর ৪ বছর চাকুরি বাকি। ঘোষ সাহেব এর নামে দূর্নাম আছে। না, ঘুষ-ঘাস নিয়ে নয়। তবে নারী ঘটিত। অধস্তনদের বিশেষ সুযোগ পাইয়ে দেওয়ার নামে যৌন লাইসেন্স এই আর কী!

এনিয়ে দাম্পত্যেও বিস্তর ঝামেলা পোহাতে হয়েছে তাকে। ৫০ পেরিয়েছে বৌয়ের বয়স। আর সে তেমন একটা বাগড়া দেয় না।

এদিকে শর্মিষ্ঠা মেয়েটিকে নিয়ে হয়েছে মহাজ্বালা। সে পঞ্চায়েতের দায়িত্বপ্রাপ্ত সেলের স্টেট লেভেল কর্মকর্তা। প্রতিমুহূর্তে স্যার স্যার লেগেই আছে। যৌবনবতী স্মার্ট, ইংরেজিতে চোস্ত শর্মিষ্ঠা দেখতে মন্দ নয়। তার সাথে কয়েকবার রাজ্যে ও রাজ্যের বাইরে ট্যুর করেছে। অবশ্যই কাজের প্রয়োজনে।

কিছুদিন থেকেই ঘোষ সাহেবের স্বাভাবিক স্থিরতা যেন বিঘ্নিত। চঞ্চলতা কাজেও প্রভাব ফেলছে। কারণে অকারণে শর্মিষ্ঠাকে তলব করছেন।

শনিবার বিকেলে ফোনে তাকে জানালেন, আগামী সোমবার মেদিনীপুর জেলা সফরে যাবার কথা। তাকেও সঙ্গী হতে হবে।

জেলার কাজ সেরে সার্কিট হাউসে থাকার ব্যবস্থা। মাঝ রাতে শর্মিষ্ঠা স্যারকে কল করল। অতঃপর রাতের আঁধার আর কাম মিলেমিশে একাকার!

পরের দিন আবার কলকাতায় ফেরা। স্যারের চঞ্চলতা আর নেই।

তিনদিন বাদে। ইন্টারনেটে একটি ভিডিও ঘিরে ঘোষ সাহেবের এতদিনের অর্জিত সামাজিক মর্যাদা আর সম্মান ধুলাতে লুটিয়ে পড়ল। অফিসে দপ্তরের কলিগরা মুচমুচে নানা গল্পে পরিবেশ গরম করে তুলল। এক সহকর্মী মন্তব্য করলেন, এত বয়স হল লোকটার তবু ঘোড়া রোগ গেল না!

কয়েক দিন বাদে। অনিবার্য ভাবেই এসে গেল স্ত্রীর ডিভোর্স লেটার।

শকুন

পাড়ার মোড়ের শালিশি বৈঠকে রহমত মিঞা তার সাঙ্গপাঙ্গ সহ যথারীতি উপস্থিত। বিবদমান দুই পক্ষ চাচা ভাতিজা। কুড়ি বছর আদালতের চক্কর। জানুয়ারিতে রায় হয়েছে। চাচার পক্ষে। লকডাউনে কাগজ পেয়েছে দেরিতে। দু-পক্ষ ডাকেনি এ শালিশ। ডেকেছে চাচার ছেলে। চাচা বেঁচে নেই। কেন ডাকা? রহমতের এই পাণ্ডারা মিলেই তো ভাতিজাকে ও তাদেরই আরো কিছু আত্মীয়কে তোল্লাই দিয়ে এই কুড়ি বছরের কাণ্ড ঘটাল। সে তো রাজি ছিল ওদের ঘর-বাড়ি বানাবার জমি দিতে। কিন্তু তাতে কি রহমতের চলে? সে মুচকুন্দপুর গ্রামের জাঁদরেল নেতা যে! তাকে হিসেব করতে হবে না? চাচা লোকটি তো সেই কবে থেকে বিরোধী ভোট। কিন্তু ভাতিজা এন্ড কোং কে তোল্লা দিলে ভোটগুলি তো পাকা। হয়েও ছিল হিসেব মত।

দশ বছর আগে ক্ষমতার পালাবদলে রাজনৈতিক প্রতাপ না থাকলেও সামাজিক দখলদারি আজো রহমতদের হাতেই। সে মসজিদ কমিটির সেক্রেটারি। ঈদগাহ কমিটির সভাপতি, গোরস্থান কমিটির ক্যাশিয়ার। কোথায় সে নেই!

সেই রহমত, তার ভাই খলিল ডাক্তার আর পুরনো কমরেডদের কয়েকজন বহুকাল জুড়ে এলাকার কত না অঘটন-ঘটন কাণ্ডের কাণ্ডারী! তাতে লাভ বিস্তর। বিবদমান পক্ষগুলিকে লড়িয়ে দিতে পারলে জমিটা তার বা তাদের কব্জায়। এই করেই সে আজ বহু সম্পত্তির মালিক। তার কোয়াক ডাক্তার ভাই পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামের গরীবগুরবো লোকগুলির রক্ত চুষে আজ কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ও জমির মালিক। রাজনীতি গেলেও চাকুরি থেকে অবসর নেবার পর পুরনো আমিনি পেশা নতুন করে চালু করেছে রহমত। সঙ্গে জুটিয়েছে গ্রামীণ রাজনীতির মাতব্বরি করা আরো দুজনকে। যাদের একজন পেশায় ডিড রাইটার।

এদের কথা ভাবতে ভাবতে সফিক মজলিসে গিয়ে হাজির হোলো।

সফিক-মাস্টার মশাই,আমাকে আবার ডেকে পাঠানো কেন? এ তো পরিস্কার অর্ডার।

রহমত- সে ঠিক রে ভাই। একটি জায়গায় একটু খটকা লাগছে। তুই একটু জাজমেন্ট টা তর্জমা করে দে।

সফিক-(রাই এর কপিটি হাতে নিয়ে) সমস্ত দস্তাবেজ বিশ্লেষণ করে আদালত জানাচ্ছে, যে এই জমির সম্পূর্ণ মালিকানা রেহান সেখ এর। বিবাদী তার ভাতিজা ও আত্মীয়দের এই মর্মে সতর্ক করছে,এই জমির দখল নিতে বাধা দিলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে।

সালেক মুন্সী- বাঙলা জায়গাটা একটু যদি বল।

সফিক- কোর্ট ইংরেজিতে অর্ডার দেয়। ক্লার্করা তর্জমা ভুলভাল করে, সে দেখে লাভ নেই।

রহমত- তাহলে পরিস্কার হয়ে গেল। বাবা ঝন্টু পরিস্কার করে এবার বল,আমাদের কেন ডেকেছ?

ঝন্টু- আপনেরা গন্নিমান্নি মানুষ। আপনেরা বুলেন এখন কী করণীয়?

রহমত- তাহলে মৌলবি সাহেব,আপনি বলেন,কেস তো হেরে গেছেন। এরপর কি আপনি আপিল করবেন? নাকি আমরা দশজন যা করে দেব তা মানবেন।

লিয়াকত মৌলবি- কোর্টে যা হবার হবে।

রহমত- এ তো আচ্ছা বেকুব। আপনি তো কেসে হেরেছেন। আপনার বলা উচিত, দশ যা করবে মেনে নেব।

লিয়াকত- দ্যাখেন মাস্টার, আমি তো ওই কথায় বুলছি।

জবির মিঞা - আপনি তাই বলছেন? আরে আপনার লাগ্যা আমরা বস্যাছি। ঠিক কর্যা বলেন।

লিয়াকত- আমি তো বুলছি আপনেরা কিছু একটা কর্যা দেন।

সফিক- মাস্টার মশাই,মনে হচ্ছে,আপনারা জোর করে স্বীকারোক্তি নিচ্ছেন।

রহমত-(নিচু স্বরে সফিকের প্রতি) ভাইরে অনেক কিছুই করতে হয়। এদের নিয়ে কতবার বসতে হয়েছে জানিস?

রহমত- তাহলে সবাই শোনেন, দু পক্ষকেই দশদিনের সময় দেয়া হল। দশদিনের মধ্যে তারা আমাদের আবার ডাকুক। যদি ডাকে তাতে আমরা যা করে দেব,তা কিন্তু সব পক্ষকেই মেনে নিতে হবে। কী, তোমরা রাজি তো? ঝন্টু বলো।

ঝন্টু- আমি বুল্যাছি,ওদের উচ্ছেদ করবনা। বাড়ি করার জায়গা ওদের দিব।

মাস্টার- না,ওসব কথা না,আমরা যা করব তা মানবে কিনা বলো।

সফিক- ঝন্টু দুটো কথা বলতে পারে। এক,তারা ওদের যে কোনো জায়গায় বাড়ি করতে দেবে। দুই, শালিশ যেভাবে সুপারিশ করবে তা মেনে নেবে।

মাস্টার- না, না, শর্তসাপেক্ষে হবেনা।

হেলাল- না,কোনো শর্ত না, শালিশ যা বলবে তা মানবে কিনা বল।

ঝন্টু- আপনেরা যা করেন।

মিটিং শেষ। সবাই যে যার বাড়ি ফিরল। রহমত ভাবতে থাকল। তার প্ল্যান কি সফল হবে? মোড়ের মাথায় জায়গা। কমকরেও ১ বিঘে। লিয়াকতরা ১০ শতক জুড়ে আছে। এটাই যদি এদেরকে কাগজে কলমে করে দেওয়া যায়,তাহলে? সে মনে মনে হাসল। তার বড় ছেলেটার বাড়ি এখানে বানালে কেমন হয়? সে জানে লিয়াকতদের কীভাবে রেলপারের বস্তিতে পাঠাতে হয়।

ভাড়াবাড়ি

ছেলেটি তিনদিন হল কুচবিহার এসেছে। একটি বেসরকারি কোম্পানির চাকুরি নিয়ে।

শহরটি ছোট। সাজানো গুছনো। কুচবিহারের রাজপরিবার পরিকল্পিত শহরটি। শহরের প্রতিটি রাস্তা বর্গাকার চৌহদ্দির। নিউ কুচবিহার স্টেশনে নেমে অটোরিক্সায় শহরে আসতে আসতে তার মনে হয়েছিল শহরটা কেমন যেন নিস্তরঙ্গ!

প্রথম দিন কাজে যোগ দিয়ে অফিসের ব্যবস্থাপনায় হোটেল ইলোরায় থাকার ব্যবস্থা হল। দিন দশেকের মধ্যে বাড়ি খুঁজে নিতে হবে।

অফিসে জনা পনেরো কলিগ। সবই বাংলা নামের, তাকে নিয়ে দুজন আরবী নামের। অ্যাকাউন্ট্যান্ট নির্মলদা বললেন, শোনো আলতামাস এখানে বাড়ি ভাড়া পাওয়াটা কঠিন। আগে ভাগেই চেস্টা কর।

কারণ তো বুঝতেই পারছ!

বাড়ি খোঁজা একের পর এক। সব ঠিক হয়ে যায় কিন্তু নামে এসেই আটকে যায়। হঠাৎ জেলাপরিষদের এক বন্ধু খবর দিলে শহরতলির এক প্রফেসরের বিধবা স্ত্রী বাড়ি ভাড়া দেবেন। দ্রুত যোগাযোগ কর।

সেদিনই আলতামাস ছুটলো। রাজবাড়ির পূর্বপ্রান্তে বাড়ি। মহিলা রিটায়ার্ড স্কুল শিক্ষিকা। বাড়িতে নিচের তলায় দুটি স্টাডি রুম। একটি ভাড়া দেবেন। ভাড়া ঠিক হল। নামেও গণ্ডগোল হল না। মহিলার একছেলে। সে ব্যাঙ্গালোরে থাকে। মাঝে মাঝে বাড়ি আসে।

তিনি উপর তলায় আলতামাসকে নিয়ে গেলেন। চা খাওয়ালেন। এবং জানালেন উনার মুসলমানদের নিয়ে কোনো ছুঁতমার্গ নেই।

পরের দিন থেকে থাকা শুরু। কয়েক দিন পর মাসিমাকে কী কারণে ডাকতে গিয়ে আলতামাস উপরের তলার ঠাকুর ঘরের পাশে চলে গেলে মাসিমা বিরক্ত হয়ে বললেন, দরকার হলে নিচে থেকেই ডেকো।

ফুল ও শয্যা কণ্টক

–মোনাল, তোমাকে না হেব্বি দেখাচ্ছে! চাঁদনি রাতে আমার ঘরেই চাঁদ!

–ন্যাকামি কোরোনা, বাবার কাছ থেকে কীভাবে টাকাটা নেওয়া যায়, দেখ।

–সে হবে ক্ষণ। আজকের রাতটি এই সব কথা বলার জন্য?

–শোনো বেশি ঢং কোরোনা! নিজের দিকে দেখ। আমাদের সংসার আমাদের গুছিয়ে নিতে হবেনা?

–আরে বাবা, আমি কি না বলেছি? বাবাকে বল, তোমার নামে যে গয়নাগুলি করেছিল, তোমায় দিয়ে দিতে। তাছাড়া এই সব নিয়ে আমি কী বলব বলোতো?

–তোমার কিছু বলার নেই?

–না, বিয়েতে আমি তো কিছু চাইনি! তোমাকেই শুধু চেয়েছিলাম, দুষ্টুমিভরা চোখে সায়ম বলল। ছাড়ত ওসব। জীবন তো সবে শুরু হচ্ছে, এখুনি এত টাকা টাকা করতে শুরু করলে?

–শোনো সায়ম, উদাসীন হয়ে থাকলে চলবে না। জীবনটা ছেলেখেলা না। অনেক কিছু প্রয়োজন জীবনের জন্য।

–না, ছেলেখেলা হতে যাবে কেন। জীবনের জন্য যা প্রয়োজন তা দুজনে মিলে করব। কী, করব না? তাই বলে আত্মমর্যাদা খুইয়ে পরের ধনে পোদ্দারি করতে যেতে পারব না। এটা তুমিও শুনে রাখ।

–তোমার মুরোদ কতটা সে তো আমি জানি! তাই তো বলছিলাম, মুখে বড় বড় কথা না বলে নিজেরটা বুঝে নাও। বাবা রিটায়ার করেছে। প্রভিডেন্ট ফান্ডের এতগুলো টাকা! অন্য ভায়েরা ছেড়ে দেবে ভেবেছ? আমি আমার বাপের বাড়ি দেখছি, ওদিকের কথা তো তোমায় বলিনি! তোমার বাবা মানে আমার শ্বশুর মশাই এর কথা বলছি।

দেড় বছরের সম্পর্ক! বিয়ের প্রথম রাতটিতেই মোনাল এর এমন ধারা কথা সিভিল ইঞ্জিনিয়র সায়ম আশা করেনি। তার কল্পনায় আজকের রাতটি ছিল অন্য তারে বাঁধা। তার কেটে গেল। রাত গাঢ় হলে কামনাঘন আঁধার তার নিজের নিয়মেই কাজ করল!

ওদিকে আকাশে চাঁদ তখন মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছে।

দ্বীপ

ছেলেটির মৃত্যুর খবর এল বিকেল ৩ টায়। আগাছা নাশক খেয়েছিল ভোর বেলায়। সদর হাসপাতাল থেকে জেলা হাসপাতাল। দুপুর ১২ টায় মৃত্যু। খয়রাডাঙা গ্রামের মনোজ। পেশায় একটি প্রেসের মালিক। গ্রামের প্রেস। ছোটখাট। চিঠি, হালখাতার ক্যালেন্ডার, ফ্লেক্স এই সব আর কি! তাতে উপার্জন নেহাত কম নয়। এই পেশায় থেকেই সে নিজের বাড়িটাও বানাল এই তো কিছু দিন আগে। এক মেয়ে এক ছেলে আর বউ। এই তার সংসার। বাবা মা আলাদা বাড়িতে থাকেন। চার ভাই তারাও প্রত্যেকে পৃথক সংসারে।

হাসি খুশি ছেলেটি হঠাৎ সুইসাইড কেন করল? ভাবতে ভাবতে মনোজের বাড়ির কাছের মোড়ে পৌছল রৌনক। অনেক দিন পরে এই মোড়ে তার আবার আসা।

মোড়ের আড্ডায় যথারীতি পরিচিত ছেলেদের ভিড়। নিতাই, সফিক, লালচাঁদ, দশরথ। কথা হচ্ছিল মনোজের মৃত্যু নিয়েই। রৌনক বলল, তোমাদের তো খুব কাছের ছেলে, কী এমন হল যে তাকে সুইসাইড করতে হল।

নিতাই—শুনছি কিছু অসুখ ছিল। ভাল হচ্ছিল না। সেখান থেকেই...

রৌনক- অসুখের জন্য সুইসাইড! এটি কি খুব বিশ্বাস্য কারণ, সফিক?

সফিক— দাদা, আর তো কিছু দেখছি না।
রৌনক- ওদের দাম্পত্য কেমন ছিল?
লালচাঁদ- খুবই বাজে। বউটা ভীষণ বদমেজাজি! প্রায়ই ঝামেলা লেগে থাকত।

- আচ্ছা, তোমরা বাদে ওর ঘনিষ্ঠ কোনো বন্ধু আছে?
- না, আমাদেরই আশপাশে থাকত।

রৌনক-অথচ ওর এই মৃত্যুর কারণ নিয়ে তোমাদের মধ্যেই দেখ কোনো স্পষ্টতা নেই। প্রতিদিনের এই মেলামেশায় মনের কাছাকাছি আমরা কেউ কারো নই! কেন নই?

সফিক- তার মানে, দাদা, আমরা সব্বাই এতটাই আত্মকেন্দ্রিক? আপনি এটি বলতে চাইছেন?

রৌনক—তাই দাঁড়াচ্ছে না? এই যে আজ এখানে বসেছি সব্বাই, জাস্ট টাইম পাস! কত কাছে অথচ কত দূরে! এর নাম বস্তু অর্থাৎ সত্য থেকে বিচ্ছিন্নতা। একে আমরা গণ বিচ্ছিন্নতা বলি আর সমাজ বিচ্ছিন্নতা বলি তাতে কী এলো গেলো!

সবার মাঝে এক অসহ নিরবতা নেমে এল।

রাত বাড়ছে চলি বলে রৌনক বিদায় নিল। বাকি ছেলেরা অন্ধকার মেখে আর কতক্ষণ বসে রইল জানা গেলনা।

আদালত ও অবমাননা

“Mistrust all who talk much of their justice! Verily, their souls lack more than honey. And when they call themselves the good and the just, do not forget that they would be pharisees, if only they had— power”
Friedrich Nietzsche

—ধর্মাবতার, বিনম্রতার সাথে জানাচ্ছি, আমি ক্ষমা প্রার্থনা করতে অপারগ! কারণ আমি যা লিখেছি তাতে মহামান্য আদালতের অবমাননা ঘটেনি। এটি আমার নাগরিক মত প্রকাশের অধিকারের প্রয়োগ মাত্র।
—ক্ষমা প্রার্থনা করুন, আপনি আদালত অবমাননা করেছেন! না হলে জানেন আমরা কি করতে পারি? আপনার লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত করতে পারি। আপনাকে জেলেও পাঠাতে পারি! আপনি প্রধান জুরিকে কটাক্ষ করেছেন! ভয়াল প্লেগ মহামারিতে আদালতের কাজ লিমিটেড করা হয়েছে, তাতেও আপনার গাত্রদাহ! আপনি ওই খোলা চিঠির মাধ্যমে গণ-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করতে চেয়েছেন। উসকানি দিয়েছেন!

—না, ধর্মাবতার আমি কেবল সত্য তুলে ধরেছি! যখন রাজার লোকজন রাজধানীর বুকে প্রজাদের জীবন ও সম্পত্তি হানিতে লিপ্ত ছিল আদালত নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েছে। একটিও স্বতঃপ্রণোদিত বিবৃতি জারি পর্যন্ত করেনি! যখন একের পর এক বিরুদ্ধ কণ্ঠস্বরকে দমন করার জন্য মিথ্যা মানলায় গ্রেফতার, বন্ধন, সাজা দেওয়া হয়েছে আদালত তার ভূমিকা রাজাকে সন্তুষ্ট করার কাজে লাগিয়েছে। প্রজার জন্য কিছুই করেনি। যখন ভিন গোত্র প্লেগ ছড়াচ্ছে বলে সেই গোত্রের লোকেদের বদনাম করেছে আদালত ন্যায় প্রতিষ্ঠায় কোনোই ভূমিকা নেয়নি। এতেই আদালতের মর্যাদা ভূলুন্ঠিত হয়েছে। মাননীয় ধর্মাবতার।

—আপনি ঔদ্ধত্যের সীমা ছাড়াচ্ছেন! এখনো স্বীকার করুন অপরাধ। প্রধান জুরির বিরুদ্ধে আপনার করা উক্তি আপনি প্রত্যাহার করুন। আপনি কি পৃথিবীর ইতিহাস অবহিত নন? আপনি জানেন না, ক্ষমতা আমাদেরই এবং আমরা ক্ষমতার?

—জানি, তাই তো আপনাদের এই আদালত সক্রেটিস এর মত মনীষীকে বিষ পাণে হত্যা করতে পেরেছিল। পেরেছিল ব্রুনোকে দণ্ডিত করতে, পেরেছিল গ্যালিলিওকে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করতে! কিন্তু ধর্মাবতার যে ইতিহাসের কথা বলছেন সেই ইতিহাস কি সেই আদালতকে ক্ষমা করেছে, তা ঘৃণিত হয়নি? সেই ইতিহাস কি আদালতের জন্য উজ্জ্বল কোনো দিক চিহ্ন নাকি দগদগে কলঙ্কমাখা অধ্যায়, মাননীয় ধর্মাবতার?

—তার মানে আপনি ক্ষমা চাইবেন না? দেখুন আজ গোটা পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে। সবদিকে কত শত উজ্জ্বল নক্ষত্র সমাবেশ! সুদূর মার্কিন মুলুক, ব্রিটেন, ইউরোপ, তুর্কি, রাশিয়া, নিকটবর্তী চিন, আর আমাদের এই হিন্দ সব খানেই তো সেই সব উজ্জ্বল নক্ষত্ররা তাদের অমলিন কিরণ সম্পাতে চারদিক কেবল আলো ঝলমলে করে দিচ্ছেন! আপনি কি তার কিছুই দেখেন না?

—দেখি ধর্মাবতার, ধর্মহীন অধর্মের অহং দেখতে পাই। আর পাই পেশি শক্তির আস্ফালন। যাদের উল্লেখ আপনি এই আদালত কক্ষে করছেন, তারা বানিয়াদের দ্বারা শ্রমকে বন্দি করছে। তারা ব্যাপক জনতার জীবনকে পঙ্কিলতার আবিলে নিক্ষেপ করে চলেছে। যাদের আপনি আলো ঝলমলে উজ্জ্বল নক্ষত্রের সাথে তুলনা করেছেন তারা ব্যাপক মানুষের অধিকারকে দলিত-মথিত করে চলেছে।

—অবান্তর কথায় আদালতের সময় নষ্ট করবেন না। আপনি আদালতের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করুন। এটাই আমাদের শেষ কথা। অন্যথায় কঠোর পদক্ষেপ নিতে আমরা বাধ্য হব। দেশের স্বার্থে, শৃঙ্খলার স্বার্থে, জনতার স্বার্থে আমাদের আদালতের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতেই হবে।

—ধর্মাবতার আমি নগন্য একজন নাগরিক মাত্র! সেই

নাগরিক অধিকারকে ভূলুণ্ঠিত করাকে আমি ন্যায় বলে মেনে নিতে পারিনা। আমি জানি যুগে যুগে আদালত শাসকের হাতিয়ার হয়েছে। আজ তার ব্যতিক্রম হবে সে আশা আমি করিনা।

আমার স্টেটমেন্ট এটাই, আমি ক্ষমা প্রার্থনার মতো কোনো কাজ করিনি। আমি আমার খোলা চিঠি জ্ঞানত সুস্থ মস্তিস্কে মানুষের নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় রচনা করেছি। মহামান্য আদালত যেকোনো শাস্তি আমায় দিতে পারেন, আমি হাসিমুখে তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত। কেবল স্মরণ করিয়ে দিতে চাই মহামান্য আদালতকে যে, এই আদালতের বিচারের বিচার, আমি নিশ্চিত, ইতিহাস করবে। আর সেই বিচার বড় কঠিন মহামান্য ধর্মাবতার!

আপনারা আমার শাস্তি ঘোষণা করতে পারেন।

বাতাসে ভাসে জাত

অফিসে চা খাওয়ার একটি ব্যবস্থা হল।

তিন তলায় অফিস। দোতলায় চা এর স্টল। এক মাঝবয়সী দম্পতি স্টলটি চালান। ওই তলায় পাঁচটি অফিস। এতগুলি অফিসে চা টিফিন সাপ্লাই করে তিন তলার আমাদের অফিসে চা দিতে আসা ওদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরা করার উদ্যোগ।

কাপ, প্লেট, সসপ্যান, গ্যাস, ওভেন সবকিছু এল যথারীতি।

পরের দিন অফিসে। অফিসে বস সহ মোট আট জন। ব্যানার্জি, দে, দাস, পাল, রায়, মণ্ডল এবং হোসেন। চা হল। বিস্কুট সহযোগ। সেল্ফ সারভিস। কাপ ধুতে গিয়ে দেখলাম কাপের নিচে নামের আদ্যাক্ষর মার্ক করা।

নরহরিদা আমাদের এই ক্যান্টিনের ব্যবস্থাপক। ওকে বললাম, কাপে মার্ক করতে কে বলল? বস? না, ব্যানার্জি ম্যাডাম।...

সেদিন অফিস ছুটির সামান্য আগে। সবাই তখন ডেস্কে বসে। শ্রীপদদা, চায়ের কাপ তো আমরা নিজেরাই ধুচ্ছি। সমস্যা তো নেই। তাহলে কাপে মার্ক করতে হল কেন? সবাই কেমন একটু সচকিত হয়ে উঠল। –দেখ, সবার রুচির কথা তো ভাবতে হবে। শ্রীপদদা খুব সিরিয়াস হয়ে গিয়ে বলল।

–কেন, রুচির সংজ্ঞা কি নামের আদ্যাক্ষর দিয়ে হয়? নাকি তা জীবনের সার্বিক রসবোধে?

–দেখো ভাই, অত কিছু ভেবে তো করা হয়নি।

–বেশ, নতুন এক সেট কাপ আনাও। বেশি ভাবারও দরকার নেই। কাপের নিচে আবার যেন মার্ক না পড়ে। কী বলো?

–আচ্ছা তাই হবে।

পরের দিন নতুন কাপ এলো বটে। কিন্তু চা আর হলো না।

থানার রাইটার

–আমি তো বুল্যাছি চাচা, থানায় একটা ফাঁকা ডায়েরি কর‍্যা দেন। ওই শালাকে ঠিকই জব্দ কর‍্যা দিব।
–না, বাছা সে বুজল্যাম। কিন্তু ফাঁকা ডাইরিতে হবে? রহমত্যা যে এই কাজ করছে তাতো আমি জানি।
–যা বুজেন না, তাই বকতে থাকেন, কেনে? আপনি কি সেডা প্রমাণ করতে পারবেন? যা বুলছি করেন। ক্যাল থানায় আসবেন। আমি ঠিকঠাক ধারা দিয়্যা কেস লিখ্যা দিব।
–ঠিক আছে বাপ, তুমি যা করবার কর‍্যা দ্যাও। রহমত্যা জানে জব্দ হয়।
–ঠিক আছে। সে আমি দেখব। আর শুনেন তিন হাজার লিয়্যা আসবেন।
–তিন হাজার? একটু কম কর বাপ।
–কী বলেন চাচা, বড়বাবুই তো ২৫০০ নিবে। আমাকে কি ৫০০ ডা টাকা দিবেন না? তিন হাজারই লাগবে।
–আচ্ছা। কডার সময় আসব?
–ঠিক ১১ টা।
মুন্সি জিল্লার জাহানের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে। তার সাথে ভাইপো রহমতের রেশারেশি। তার গাছের আম কে বা কারা ঢিল মেরে ঝরিয়ে দিচ্ছে। রহমত এই কাণ্ড করছে বলে তার স্থির বিশ্বাস। তাই সে রাইটার জাহানের কাছে এসেছিল পরামর্শ করতে।
এদিকে জাহান মিঞা জিল্লারকে বাড়ি থেকে বিদায় করে স্ত্রী সাইরাকে বলল, একটু হাজির বাড়ি যাছি, বলেই বেরিয়ে গেল। রাস্তায় রহমতের বাড়ি। বাইরে দাঁড়িয়ে ডাক দিল- রহমত, ও রহমত, রহামত্যা...
–কে?
–আমি জাহান রে, দরজা খোল। জাহান দরজা খুলে দেয়। বলে কী জাহান ভাই, কী খবর?
–খবর আমার তো ঠিক আছে। তোর যে অবস্থা খুব খারাপ সে খবর জানিস?
–কেনে, কী হয়্যাছে ভাই?
–তোর নামে তো মুন্সী কেস দিয়্যাছে রে? অন্যের সম্পত্তি নষ্ট সহ আরো মেলা ধারা।
–ভাই, আমি কী কর‍্যাছি? অর সাথে আমার বনিবনা নাই সে ঠিক। কিন্তু আমি তো তার কুনু ক্ষতি করিনি।
–সে কথায় আর পার আছে, একবার কেস হয়্যা গেলেই মজা বুঝবি।
–ভাই কী করব? পরামর্শ দ্যান।
–কী আর করবি, ক্যাল থানায় আয়। বড়বাবুর সাথে কথ্যা বুল্যা দেখি। দরকার হলে আমি কেস লিখ্যা দিব। আর শুন সম্পত্তি নষ্ট, মারাত্মক মামলা! তুই হাজার পাঁচেক টাকা লিয়্যা আসিস। কাজ কর‍্যা দিব।
–পাঁচ হাজার? অতটাকা আমি ক্যাল কী কর‍্যা দিব? বড় ম্যায়াডার লাগ্যা জামা কাপড় কিনতে হবে!
–আচ্ছা ঠিক আছে। তুই আমার কাছের লোক, ৪ হাজারে কর‍্যা দিব। বড় বাবুকে বুঝিয়্যা রাজি করাব, আর কী।
–ঠিক আছে, ভাই আমি ঝামেলা চাইনা। আমি জানে মুক্ত হই দেখেন।
–সে আমি দেখব, তুই ২ টায় থানায় আসিস। গেনু রে, বল্যা জাহান বেরিয়ে যায়। তার খুশি ধরেনা। দুই বকরা! কী ভাল দিন! বড়বাবুকে খুশি করতে হলে কী হবে? গোটা তিন হাজার তো পকেটে ঢুকবে!
জাহান বাড়ি ফেরে। বউ ভাত বেড়ে দেয়। জাহানকে খুব খুশি দেখে সে জিজ্ঞাসা করে কী ব্যাপার এত আনন্দ কিসের ল্যাগ্যা?
–তোমার একটা গয়না গঢ়্যাতে দিয়াছুনু, সেটা ক্যাল আনব।
–তাই? নাকি আরো বড় কিছু দান মার‍্যাছো?
–আরে না। তোমার যা লোভ না! খাওয়া সেরে কিছুক্ষণ হিসেব নিয়ে বসে। তারপর ঘুমাতে যায়। স্থুল শরীরের জাহান শুতে শুতেই নাক ডাকা আরম্ভ করে। বউ ডাকলেও সাড়া পায়না।
মধ্য রাতে হঠাৎ আঁ-আঁ, গোঁ-গোঁ, বাঁচাও বাঁচাও শব্দে বউ এর ঘুম ভেঙে যায়। দেখে জাহান ঘুমের ঘোরে এই কাণ্ড করছে। ধাক্কা দিয়ে জাগায়, বলে কিগো কী হয়েছে? স্বপ্ন দেখেছ? জাহানের ঘোর কাটেনা, সাঁতার জানলেও স্বপ্নে নদি থেকে কেন সে পার হতে পারছিলনা, ডুবে যাচ্ছিল সে ভেবে পায়না। বউকে বলে পানি দিতে। পানি খেয়ে আবার সে ঘুমিয়ে পড়ে। তখন অনেক রাত।

ব্যক্তি

—দেখ, এভাবে সিদ্ধান্ত নিলে তো হবে না। আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

—ভাল কথা। হলভাড়া নিতে হবে সেটা তো মিটিং এ নেয়া সিদ্ধান্ত, তাই না? তাহলে প্রবলেমটা কোথায়?

—তারপর, ওই যে পতাকা উত্তোলন। সেটা কে করবে? পতাকার ডিজাইন কী? কখন এসব সিদ্ধান্ত হল? আমি তো জানিনা।

—ওকে, পতাকার সিদ্ধান্তটা ওই মিটিং এ আসেনি। কিন্তু পরে এসেছে। এক কাজ কর পতাকা বিষয়ক দায়িত্বটা তুমি নাও। এর ডিজাইন, লোগো, কে উত্তোলন করবেন সবটাই তুমি দেখ, সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে। কী বল?

—না, না এভাবে হয় নাকি? আর তাছাড়া আমার তো এদিকে অনেকগুলি কাজ আছে। অফিসের মান্থলি মিটিং, স্যারকে ব্রিফ রিপোর্ট দেয়া। ডিস্ট্রিক্ট এ থাকা কত ঝামেলার তুমি তো বুঝবে না!

—তবেই দেখ, তুমি এই টুকু দায়িত্ব নিতে পারবে না। আবার এই বিষয়েই হরেক প্রশ্ন তুলে কাজে বাগড়া দেবে?

—গণতান্ত্রিক পদ্ধতির কথা বলাটা কি বাগড়া?

—যেকোনো তন্ত্র, সেটা বড় কথা নয়, কথা হল আমাদের অব্জেক্টিভ। তাতে ঐকমত্য। আছে তো? এবার রইল, টেকনিক্যালিটিজ। সেটা বড় হয় কী করে? যাক তোমার যা বলার আছে তুমি মিটিং এ বোলো।

কর্মচারী সংগঠনের একটি প্রগ্রাম নিয়ে দু কলিগের কথা। নির্বেদ মুখার্জী ও আব্দুল হাদি। পঞ্চায়েত বিভাগের কর্মচারীদের জেলায় কোনো সংগঠন নেই। মনোজিত বিশ্বাস, আব্দুল হাদি আর রতন গায়েন এই তিনজনের ভাবনা ও প্রয়াসের ফল হিসেবে আজ সংগঠনের রেজিস্ট্রেশন হয়েছে। নির্বেদ প্রথম থেকেই ছিল। কিন্তু সে অভিজ্ঞতাবাদী। কথায় কথায় এটি কী করে হবে, আমাদের কি কোনো অভিজ্ঞতা আছে, এত টাকা কলিগরা চাঁদা দেবেনা হরেক নেগেটিভ কথাবার্তা তার লেগেই থাকে।

কয়েকদিন পর সংগঠনের প্রথম জেলা কনভেনশন। জেলা কমিটির তরফে মিটিং এ তার রূপরেখা ঠিক হয়েছে। কিন্তু মুখার্জীর যেন কিছুই পছন্দ হচ্ছে না। কনভেনশনের ঠিক দিন তিনেক আগে। মুখার্জীর কাছে হাদির ফোন আসে।

—মুখার্জী তাহলে আয়োজন তো এক প্রকার কমপ্লিট।

—হ্যা, ভাই। আমি তো অত সময় দিতে পারলাম না। যা হোক দেখ সব যেন ঠিকঠাক হয়।

—জেলার আমলাদের অনেককেই ডাকা হয়েছে। দেখা যাক কজন আসে?

—সবাই আসবে না।

এই ভাবে কথোপকথন শেষ হয়। মুখার্জীর কেবলই মনে হতে থাকে, তার কথা কোনো গুরুত্ব পাচ্ছে না। সে একবার জেনারেল সেক্রেটারিকে ফোন করে। তাকেও কিছু কথা শোনায়। কিন্তু সেও কিছু সমর্থন সূচক বলে না।

কনভেনশনের দিন। সবাই এসে হাজির। একে একে গেস্টরা আসছেন। সংগঠনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য ও অন্যান্য মেম্বার হাজির হয়েছে। কিন্তু মুখার্জীর দেখা নেই। সবার নজরে বিষয়টি পড়লেও কেউ কিছু মন্তব্য করে না। সুষ্ঠু ভাবেই সব সম্পন্ন হয়।

সন্ধ্যায় হাদির ফোনে মুখার্জী ফোন করে জানায়, তার শ্বশুর শাশুড়ি আসায় সে আসতে পারেনি। কনভেনশন পরবর্তী মিটিং। জেনারেল সেক্রেটারি বক্তব্য রাখছেন।

—আমাদের সংগঠনকে সামনের আরো শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হলে প্রথমেই দরকার সাংগঠনিক শিক্ষা। আর তা ব্যক্তিকেই নিতে হবে। ব্যক্তি চরিত্রে ঈর্ষা, হীনতা, কাঙালী, অবিশ্বাস, সন্দেহ হরেক সেন্টিমেন্ট সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখতে হবে। তবেই আমরা বলিষ্ঠ সংগঠন গড়ে তুলতে পারব। পিছনের সারিতে বসা মুখার্জী তার পাশে বসা শুভাশিস কে বলে, শুধু মুখে বড় বড় কথা বললে হয় না!

রক্ত

বাপ জোগানদারি করত। ছেলে তিনটি স্কুলের চৌহদ্দি পেরতে পারেনি। ছিঁচকে চুরি এবং জোগানদারি মজুর। লোকটির চেহারায় তার তেমন একটি ভাবও লক্ষ্য করতে পারা যেত। এখন সে বাড়ি বাড়ি ঘাস বিক্রি করে।

তিন ছেলেই পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে ভিন রাজ্যে রাজমিস্ত্রির কাজ করে। ছোট ছেলেটির নাম লাল মহম্মদ। লালু নামেই পরিচিত। সে এখন মিস্ত্রিগিরি করতেই করতেই ছোটখাটো ঠিকাদার। মানে লেবার সাপ্লায়ার। সেখান থেকেই আরো কিছু শহুরে আধাশহুরে ছিঁচকে গ্যাং ঘনিষ্ঠতা। কিছু অতিরিক্ত টাকাকড়ি। ভগবানগোলা ব্লকের প্রত্যন্ত লহরপাড়া গ্রাম ছেড়ে এখন সে লালবাগে একটু জমি কিনেছে। বাড়িও একটা করে ফেলেছে।

গ্রামে বাঁশের খাপলার বাড়িটিকে সরকারি আবাস যোজনার টাকায় নিজের কিছু যোগ দিয়ে তিনকামরার বাড়ি বানিয়ে ছিল গতবছর।

সেই বাড়ি বানাবার কিছু টাকা ধার ছিল হার্ডওয়ার দোকানির কাছে। তাই দিতে এসেছে সে।

—বাবুদা, ও বাবুদা কোথায় গেলে?

—ও লালু, বস। আসছি গোডাউন থেকে।

দোকানী বাবু সেখ অন্য কাস্টমারকে গোডাউন থেকে মাল দিয়ে দোকানে ফেরে।

—বল। কই তোর এত দিনে সময় হল?

—আরে, আমার এখন অনেক কাজ ভাই। তুমি তো জান লালবাগে বাড়ি করেছি।

—তা, তুই অন্য কিছু ব্যবসা করছিস নাকি ওই ঠিকাদারি?

—ওটাও আছে। আমি এখন অন্য তালে আছি। যাক, এই নাও তোমার ৮৭৯০ টাকা। টাকা তো আর মেরে নিইনি!

—তুই তো বেশ কথা শিখে গেছিস রে, দেখছি। তোকে কখন বললাম, টাকা মারার কথা?

—কত টাকা ইনকাম কর এই ব্যবসায়? আমাকে জ্ঞান দিতে এসোনা।

লালু আর দাঁড়ায় না। সঙ্গের ষণ্ডামার্কা ছোকরাটিকে ডাক দিয়ে রয়্যাল মোটর বাইক স্টার্ট দেয়। গ্রামের রাস্তায় ২০-৩০ কিমির বেশি গতিতে বাইক চলেনা যেখানে, সেখানে ওর বাইক হুশ করে বেরিয়ে গেল। এখানের ভাই দুটি বাবা-মা এর কারো সাথেই সে যোগাযোগ রাখেনা। দোকানের বেঞ্চটিতে গিয়ে বসতে বসতে বাবু বলে। সঙ্গে এমন্তব্য করতেও ভোলেনা, ছোটলোকে বিষয় পেলে বাপকে বলে শালা!

তিনদিন পরে। হঠাৎ খবর এল মোটর বাইক অ্যাক্সিডেন্টে ছেলেটি মারা গেছে। বহরমপুর-জিয়াগঞ্জ রোডে। লাশ এলো বিকেলে। দাফন হয়ে গেল রাতে। দুর্ঘটনায় মৃত্যু বলে কৌতুহলী লোকের ভিড় হল ভালই।

কয়েকদিন পর থানার লোকেরা এসে কীসব খোঁজ খবর করল। জানা গেল রেলের ওয়াগন ব্রেকার চক্রের সাথে লালু যুক্ত ছিল।

সংস্কার

—সমীরদা, দেখ ধর্ম আর দর্শন এক জিনিস না। ধর্ম একগাদা সংস্কারের বাহন। দর্শন কিন্তু ওসব সংস্কার-টংস্কারকে পাত্তা দেয়না।

—হ্যাঁ, একদম ঠিক বলেছ।

—যেমন দেখ, ভারতীয় দর্শন। এতে কী বলে? একটি জীবন ধারার কথা বলে। এ কোনো ছকের কথা বলে না।

—কেমন?

—এই যে দেখ না, প্রতিমাগুলি। দর্শন কী বলল? দর্শন বলল, এগুলি এক একটি মডেল। কীসের? চেতনার মডেল। আর মডেল তো আপেক্ষিক, তাই না? কিন্তু আপেক্ষিক যা তাতে তো মানব তৃপ্তি-অন্বেষা মুক্তি পায় না। তাই অনাপেক্ষিক দূর্গাপ্রতিমা।

—বেশ, খুব সুন্দর। তারপর?

—অত উৎসাহিত হয়োনা। কিন্তু এই মডেল যুক্ত অথবা মডেল লেস প্রতিমাগুলির সামনে মাথা নত করলেই কি সেই মডেল বা মডেললেসনেস অর্জন হয়? হয় না। তাই দর্শন কী বলল তার জন্য চায় সাধনা।

—আর ধর্ম কী করল? এই তত্ত্বের সারবত্তাকে গুলি মেরে সেই মডেল, ননমডেল কেন্দ্রিক সংস্কারের রীতি বানিয়ে তাতে সেন্টি দিয়ে সমাজ-মনকে তাতে চুবিয়ে ছেড়ে দিল! যা এবার করে খেগে! খাচ্ছে!

—বুঝলাম। কিন্তু মানুষ কী করবে? তাকে কিছু না কিছু নিয়ে তো বাঁচতে হয়।

—একদমই তাই। তার জন্যই তো রক্ষণকামের এত আয়োজন! আর মানুষ কী নিয়ে বাঁচতে চায়? ভেবে দেখ, সে কোনো কাল্পনিকতা নিয়ে বাঁচতে চায়না। সে বাঁচে শ্রম ও তার মূল্য নিয়ে। যখন শ্রম ও মূল্যের জগৎটা তার হাতছাড়া আর অন্ধকার হয়ে যায় তখনই তুমি যাকে বললে কিছু, সেই কিছুর দরকার পড়ে। যার জোগান দর্শন ব্ল্যাকমেলার তার হাতে ঠিকই ধরিয়ে দেয়।

—আরে ধূর! চলেই তো এলাম।

সামনেই কাটোয়া স্টেশন। স্টেশনে ঢোকার ঠিক আগেই ছোট্ট একটি মন্দির। মন্দিরটি চোখে পড়তেই সমীরদা কপালে হাত ঠেকাল। তার সঙ্গী সহকর্মীর দৃষ্টি এড়াল না।

সে অতি বিরক্তি ভরে অস্ফুটে বলে উঠল, এত সহজে রাক্ষসের চিবিয়ে খাওয়া মগজ বস্তুভিত্তিক ফাংশন করে?...

কস্তুরী এর গল্প

বিকৃতি

সিউড়ি টাউন রবীন্দ্র পল্লীর তনিমা দেবীর প্রতিবেশী বছর পঞ্চাশের দ্বিজেনবাবু । মোটা টাকা মাইনে, বিশাল ব্যালকনি সহ তিনতলা বাড়ি। দুই ছেলে মেয়ে। সুখী পরিবার।

মাঝে মাঝেই দেখা যায় ব্যালকনিতে বসে দ্বিজেনবাবু স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করছেন। দ্বিজেনবাবুর স্ত্রী হাউসওয়াইফ। বাড়িতেই থাকেন, কিন্তু তার বাতের সমস্যার জন্য খুব একটা কাজ করতে পারেন না। উনিশ-কুড়ি বছরের ফর্সা, গোল মুখ, হৃষ্টপুষ্ট শরীর, ঠোঁটে লিপস্টিক লাগিয়ে দুই দিকে কলা করে চুল বেঁধে সেজেগুজে সাবিত্রী এসে দুবেলা কাজ করে দিয়ে যায়।

দ্বিজেনবাবুর ওয়াইফ বিকেলবেলা বাড়ির বাইরে মাঝেমাঝে প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে গল্প করতে নিচে নেমে আসেন। হেসে হেসে বলেন, ম্যানেজারবাবু আমার কোনো সাধই অপূর্ণ রাখে না। এই তো গত বিবাহ বার্ষিকীতে পনেরো হাজার টাকা দিয়ে কানজীভরাম শাড়ি, ডায়মন্ড এর রিং, দামি দামি প্রসাধনী উপহার দিলো। এক প্রতিবেশিনী বললেন, যাই বলেন বৌদি আপনি খুব লাকি। গর্বে মুখমন্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠলো সুতপা দেবীর।

ম্যানেজারবাবুর পাশের অফিসে কাজ করেন তানিমাদেবী। কলিগদের সঙ্গে দুপুরবেলা টিফিন করছেন আর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলছেন। এক সহকর্মী অখিল বললেন, জানেন তনিমা দি, কাল অফিসের টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিতে গিয়ে দেখি এক তরুণী গোষ্ঠীর কাজ নিয়ে ম্যানেজারবাবুর সামনের বেঞ্চে বসে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর রেজল্যুশন লিখছে। তিনি এমনভাবে তরুণীটির দিকে চেয়ে আছেন যেন চোখ দিয়েই তাকে গিলে খাবেন। আমার এক বন্ধু প্রদীপ ওই ব্যাঙ্কে এই কাজ করে। সে বলে ভদ্রলোকের ওই এক বাজে অভ্যেস। রাস্তায়, বাজারে পরিচিত, অল্প বয়সী মেয়ে দেখলেই ছুঁয়ে কথা বলা।

সুতপাদেবীর ছেলেমেয়ে কৃষ্ণনগর গেছে দিদিমার বাড়ি বেড়াতে। তিনিও অনেক দিন মায়ের বাড়ি যাননি। বাপের বাড়ি যাওয়ার জন্য তোড়জোড় শুরু করলেন। সাবিত্রীকে বুঝিয়ে দিলেন দাদাবাবুর যেন কোন অযত্ন না হয়, ব্রেকফাস্ট থেকে শুরু করে ডিনার পর্যন্ত। সাবিত্রী হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ায়।

ম্যানেজারবাবু নিজে গাড়ি ড্রাইভ করে রেখে এলেন স্ত্রীকে।

সপ্তাহখানেক মায়ের বাড়িতে সুতপাদেবী বেশ আনন্দে কাটাচ্ছেন। বোনকে দেখালেন জামাইবাবুর দেওয়া উপহার। বোন বলে দিদি তুই সত্যি কী সুখী রে!

মায়ের বাড়ির পাশে একটি বিশাল মেলা হয়। মেলায় ঘুরতে গিয়ে শান্তিনিকেতনের স্টল থেকে ম্যানেজারবাবুর জন্য বুটিক এর কাজ করা পাঞ্জাবি কিনলেন, ঘর সাজানোর জন্য ফুলদানি, সো পিস কিনলেন। দিন দশেক আরো সেখানে উৎসব চলবে বলে ছেলেমেয়েরা বাড়ি ফিরতে চাইলো না।

ম্যানেজারবাবুর অসুবিধার কথা ভেবে সুতপা একটি গাড়ি ভাড়া নিয়ে নিজেই বাড়ি ফিরলেন। তারকাছেও একগাছি চাবি থাকে। গেট খুলে উপরে দোতলার সিঁড়ি থেকে চাপা স্বরে কথা বলার আওয়াজ পায়। সুতপা বুঝতে পারে না কিসের আওয়াজ, কারণ এই সময় তো কারো থাকারই কথা নয়, এখন তো অফিস টাইম। দ্রুত পায়ে উপরে উঠতে থাকে সুতপা। তার শোবার ঘরের দরজা ভেতর থেকে ভেজানো। সাবিত্রী আর ম্যানেজারবাবুর হাসির শব্দ।

ধপাস করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সুতপা। চোখে অন্ধকার দেখে, অসাড় হয়ে আসে হাত পা, তিলতিল করে গড়ে তোলা তার পঁচিশ বছরের সাজানো স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়।

মফিদনের সংসার

দীর্ঘ পনেরো বছর বীরেন্দ্রনগর রেল কলোনিতে মফিদনের বসবাস। রেল লাইনের ধারে চাটাই-এর ঘরে শুয়ে প্রতিদিন ট্রেনে কতশত মানুষের যাওয়া আসা সে দেখে। আর শূন্য পানে চেয়ে থাকে। তিন মেয়ে নিয়ে তার খুব অভাবের মধ্যে দিন কাটে।

কয়েকজন মাস্টারের বাড়ির রান্নার কাজ করে সে সংসার চালায়। এবার অতিরিক্ত বর্ষায় তার চালার ঘরটুকুও ভেঙে পড়েছে। অভাবের সংসারে মফিদনের চালে পুঁইশাক, লালকুমড়ো অনেক ধরে আছে। তাদের ভারে চালটুকুও যেন আরও ভেঙে পড়েছে।

ট্রেনের আওয়াজে মফিদনের যেন ঘুম আসতে চায় না। সে ভাবতে থাকে এবার ঘরটুকু যেভাবেই হোক সংস্কার করবে। প্রয়োজনে আরও দু তিনটি বাড়ির কাজ ধরবে। তিন মেয়েকে নিয়ে মফিদন ঘরের মেঝেতে শোয়। কিন্তু কিছুতেই তার ঘুম আসতে চায় না। কী করে মেয়েদের টিউশনির খরচ, বই,পোশাক, চাল,ডাল কিনবে? নানান চিন্তায় সে দু চোখ এক করতে পারে না, তার বুক অজানা উৎকন্ঠায় কেঁপে উঠে। দুরে কাছারির বাগানে শিয়ালের ডাক শুনতে শুনতে কখন যেন তন্দ্রা চলে আসে মফিদনের চোখে।

হঠাৎ তার ছোট মেয়ে সরিফার কান্নায় ঘুম ভেঙে যায়, মা আমার পা টা জ্বলে যাচ্ছে বলে চিৎকার করে সরিফা। মফিদন দেখে পায়ের গোড়ালির নীচ দিয়ে রক্ত ঝরছে সরিফার। সে বুঝতে পারে না কী হয়েছে মেয়ের। বড়ো মেয়েকে ডাকে মফিদন। বলে, তুই বোস। কমলা খালাকে ডেকে নিয়ে আসি। এদিকে সরিফার কান্না আরও দ্বিগুন বেড়ে যায়। সে তার দিদিকে বলে, আমি আর বাঁচবো না দিদি, আমার সারা শরীর জ্বালা করছে। তহমিনা দেখে বোনের শরীর নীল হয়ে আসছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে মফিদন ছুটতে ছুটতে কমলা খালাকে নিয়ে ঘরে ঢোকে। সরিফার সারা শরীর নীল হয়ে গেছে দেখে কমলা খালা বলে, সাপে কেটেছে, তাড়াতাড়ি কানাপুকুর হাসপাতাল নিয়ে চলো। টোটোতে হাসপাতাল নিয়ে যেতে যেতে জ্ঞান হারায় সরিফা। আত্মজার অবস্থা দেখে মফিদন বুক ফাটা কান্না করে।

হাসপাতালে পৌঁছে কমলা খালা নার্সকে ডাকে। নার্স রুগীর অবস্থা দেখে ডাক্তারকে ডাকে। ডাক্তার তড়িঘড়ি এসে নাড়ি টিপে দেখে সরিফা আর জীবিত নেই,সে মারা গেছে।

হাসপাতালের চাতালে বসে মফিদন মাথা বাড়ায়, বুক বাড়ায় আর কাঁদতে থাকে। এই সংবাদ কলোনির শুভাকাঙ্ক্ষীরা মফিদনের মাতাল স্বামীকে দেয়। তার মাতাল লম্পট স্বামী জবির কলকাতায় রাজমিস্ত্রির কাজ করে। সে আসতে আসতে সরিফার লাশ কবরস্থ হয়ে যায়।

গভীর রাতে শূন্য বুকে পা ছড়িয়ে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মফিদন। একটি ফাঁকা ট্রেন হু হু আওয়াজ করে তার ঘরের পাস দিয়ে বেরিয়ে যায়। তার বুক থেকেও জমাটবাঁধা কান্না বেরিয়ে আসতে চায়। হঠাৎ সে দেখে জবির পেছনে দাড়িয়ে। কামনার লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার উপর। ঘেন্নায় রাগে উন্মত্ত হয়ে সামনে পড়ে থাকা চেলাকাঠ দিয়ে সে আঘাত করে জবিরকে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে পিছু হটে।

সমুদ্র সৈকতে

কুর্মিটোলা হাইস্কুলের ৩৫ বছরের শ্যামবর্ণা, মিষ্টি মুখাবয়বের শিক্ষিকা নবনীতা। নবনীতার সমুদ্র খুব প্রিয়। সে বারবার সমুদ্রের কাছে ছুটে যেতে চায়। প্রতি বছর পুজোর ছুটিতে তাকে যেতেই হবে দীঘা।

একদিন হঠাৎ হেডমাস্টার নবনীতাকে ডেকে বললেন -- D.I ভূগোলের ছাত্রছাত্রীদের Excursion এর জন্য কিছু টাকা বরাদ্দ করেছেন। তুমি একটা ট্যুর এর ব্যবস্থা করো। তা শুনে নবনীতা ভাবল এতো দেখছি মেঘ না চাইতেই জল। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বেশ হবে এবারের জার্নিটা। সেই মত নবনীতা ট্রেনের টিকিট, হোটেল বুক করে ফেলল। ডেট হল ১৭ ই নভেম্বর। ছাত্রছাত্রীদের বলে দিল, তোমরা বহরমপুর স্টেশনে ৭ টার সময় পৌঁছে যাবে। ভাগীরথী এক্সপ্রেসে শিয়ালদহ। সেখান থেকে বাসে হাওড়া, হাওড়া থেকে ২.৩০ মিনিটে তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেসে দীঘা।

নবনীতার এক সহকর্মী বিজনের বাড়ি কাঁথি শহরে। বিজন পূর্বের বুক করা হোটেল তরঙ্গ লহরীর ছাদে রান্নার লোক নিয়ে গিয়ে খাবারের ব্যবস্থা করে রাখে। নবনীতা ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ পৌঁছায়। স্নান খাওয়া বিশ্রাম সেরে সে ভ্রমনের একটা রুট ম্যাপ চক আউট করে রেখেছিল, বুঝিয়ে দিল বিজনকে। কখন ওল্ডদীঘা, নিউদীঘা, অমরাবতী পার্ক, মন্দারমনি, মোহনা, শঙ্করপুর, তাজপুর নিয়ে যেতে হবে। এসবের মধ্যে নবনীতা হাঁপিয়ে উঠেছে কখন সে একটু একা হবে।

সন্ধ্যাবেলা সমুদ্র সৈকতে গিয়ে একটা নিরিবিলি জায়গা খুঁজে নিয়ে বসলো। উত্তাল সমুদ্রের ভয়ংকর গর্জন সন্ধ্যার বাতাসে তাকে আনমনা করে তুললো। তার মন সমুদ্রের ঢেউ এর মতই আজ উথাল-পাথাল। সে ভাবতে থাকে সমুদ্রের কাছে তার বারবার কেন ছুটে আসা?

যখন সে ক্লাস এইট-এ পড়ে তখন একবার স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গে এসেছিল। তখন থেকেই সমুদ্রের প্রতি গভীর টান সে অনুভব করে। আনমনা অবসন্ন ক্লান্ত শরীর নিয়ে রুমে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

খুব ভোরে সমুদ্রের বুকের ভেতর থেকে সূর্যদোয় দেখতে আবার একা সমুদ্র সৈকতে এসে বসে। দেখতে থাকে অগণিত মানুষের চলাফেরা, অনেকে স্নান করছে, কেউ সমুদ্রে অনেকটা গভীরে টায়ার নিয়ে চলে যাচ্ছে স্নান করতে, কেউ উত্তাল ঢেউয়ের সঙ্গে লাফিয়ে উঠছে, কেউ আবার ভয়ে শুধু সমুদ্রের ঢেউয়ে পা দুটো ভিজিয়ে নিচ্ছে একটু ঢেউয়ের ছোঁয়া উপভোগ করার জন্য। কেউ কেউ আবার নোনা বালিতে লাভ চিহ্ন একে প্রিয়তম - প্রিয়তমার নাম লিখছে। কেউ আবার ঢেউ এর সাথে সেল্ফি তুলছে।

এমন সময় একদল কলেজ পড়ুয়ার কোলাহলে নবনীতার সম্বিৎ ফেরে। সে দেখে তাদের সঙ্গে বেশ কয়েকজন অধ্যাপক - অধ্যাপিকা তাদের মধ্যে একজন একচল্লিশ বিয়াল্লিশ বছরের মাঝারি লম্বা শ্যামবর্ণ, চশমা পরা একজন অধ্যাপক গভীরভাবে কী যেন বোঝাচ্ছেন। এক পলক দেখে নবনীতা চমকে ওঠে। শিহরণ জাগে তার দেহমনে। অনিমেষ দা না?

একুশ বছর আগে নবনীতা যখন এসেছিল শিক্ষকদের সাথে কিশোরী নবনীতাকে সাগরের উত্তাল ঢেউ আনমনা করে তুলেছিলো। সে একা-একা নোনা বালির তীর ধরে হাটতে হাটতে চলে গিয়েছিল বহু দুরে। যখন সে ফিরে দেখে তার শিক্ষক ও সঙ্গী সাথীরা তার সাথে নেই। তখন ভয়ে তার বুক কেঁপে ওঠে। কী করে হোটেলে ফিরবে? সে তো পথঘাট কিছুই চেনে না! সে কাঁদতে থাকে, সেই সময় দেবদূতের মত দেখা হয় আশুতোষ কলেজের B.A ভূগোলের প্রথম বর্ষের ছাত্র অনিমেষের। অনিমেষও কলেজের Excursion এ এসেছে। অনিমেষ জানতে চায়, তুমি কাঁদছো কেন?

-- আমি পথ হারিয়েছি।

-- কাঁদার কিছু নেই, বল তোমরা কোন হোটেলে উঠেছো।
-- তরঙ্গলহরী, নিউ দীঘা।
--আরে আমরা তো পাশের হোটেলেই আছি ক্ষণিকাতে - তোমাকে পৌঁছে দিচ্ছি।
নবনীতা অনিমেষের দিকে অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে। তার চোখ দুটি এত গভীর যেন সাগরকেও হার মানায়। সেই সাগরের দীঘাতেই তার এক্সকারশন গন্তব্য চির-স্থির হয়ে গেল!
তারপর একুশটি বসন্ত দীঘার খোঁজে দীঘাতে আসা-যাওয়ার পালা।
আজ এতবছর পর কোনো দ্বিধাকে তার পথরোধ করতে দেবেনা। ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে গল্পরত অনিমেষের দিকে নবনীতা এগিয়ে গেল।

উলঙ্গ

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রী সোফিয়া কামাল। বিধবা মা খুব কষ্টে তাকে লেখাপড়া শেখায়। সোফিয়ার অদম্য ইচ্ছা লেখাপড়া শেষ করে যেভাবেই হোক তাকে একটা চাকরি জোগাড় করতেই হবে। বিধবা মায়ের সে ছাড়া আর কেউ নেই পৃথিবীতে। অনেক কষ্টে লক্ষ্য স্থির রেখে কোনোদিকে না তাকিয়ে পড়াশোনা করে যায়। অবসর সময়ে ভালোবেসে গান, আবৃত্তি চর্চা করে আর রবীন্দ্রনাথ পড়ে।
এম.এ পাশ করার পরে এস.এস.সি/এম.এস.সি দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করে। প্রথমবার সফল হল না । দ্বিতীয়বার এম এস সি তে উত্তীর্ণ হয়ে ইন্টারভিউ দিয়ে মেধা তালিকায় চান্স পায়। কাউন্সিলিং এ কান্তিরপা হাইমাদ্রাসা চয়েস করে।
 বহু প্রতিক্ষিত সেই দিন, জয়েনিং 24 শে অক্টোবর। সারারাত আনন্দে বুকের ভেতর আন্দোলিত। রাত্রে ঠিক করল মায়ের একটা শাড়ি পরে জয়েন করতে যাবে। হালকা ঘিয়ে রঙের তসর শাড়ি, ফুল হাতা ব্লাউজ, চওড়া প্লেট, মার্জিত পরিধানে মাদ্রাসায় পৌছায়।
হেড মাস্টারমশাই আগে থেকেই জানতেন। জয়েনিং পর্বও শেষ করে ফেললেন দ্রুত। তারপর বললেন চলো স্টাফ রুমে সকলের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই। পরিচয় পর্ব শেষে তিনি একটা বক্তব্য রাখলেন...... তোমার নতুন জীবন ভালো হোক ইত্যাদি ইত্যাদি....। তারপরেই চোয়াল শক্ত করে বললেন - গায়ে পিঠে মাথায় কাপড় না দিয়ে মাদ্রাসা আসা চলবে না। এসব দেখে ছেলেমেয়েরা কি শিখবে? হিজাব পরে আসতে হবে।
হতভম্ব হয়ে যায় সোফিয়া। সে তো কোন অমার্জিত পোশাক পরিধান করেনি। তা সত্ত্বেও অন্যান্য শিক্ষকরা কোনোরকম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করলেন না। তার বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠলো। কত স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল সে। প্রথম দিনেই এমন তিক্ত অভিজ্ঞতা হবে ভাবতেই পারেনি। যথারীতি পরের দিন যথা সময়ে একই পোশাকে উপস্থিত। হেড মাস্টারমশাই এর রাগ এবং শ্যেণ দৃষ্টি সোফিয়ার অগোচরে থাকল না। স্টাফ রুমে এক কোনে একটা চেয়ারে গিয়ে বসল সোফিয়া। অল্পবিস্তর সৌজন্য বিনিময় হলো।
 সহ প্রধান শিক্ষক এসে বললেন আপনাকে দশম শ্রেণির ক্লাস টিচার করা হয়েছে। ঠিক আছে চলুন ক্লাস রুমটা দেখিয়ে দিন। ক্লাসে ছাত্র ছাত্রীদের পরিচয় পর্ব

তারপর পাঠদান। কিন্তু ক্লাসে স্টুডেন্টদের উপস্থিতির সংখ্যা খুবই কম। বেশ কড়া পদক্ষেপ নিল সোফিয়া ফুল উপস্থিতির জন্য। দিন কয়েকের মধ্যেই উপস্থিতির হার বাড়তে থাকে। একদিন ক্লাসে প্রায় কুড়ি থেকে পঁচিশ জন ছাত্র দাড়িয়ে। বসবার জায়গা পায়নি। সোফিয়া বিভিন্ন রুম ঘুরে দুটো বেঞ্চের বেশি জোগাড় করতে পারলো না। কোনো রুমেই সাফিসিয়েন্ট বেঞ্চ নেই। অগত্যা হেডমাস্টারকে বিষয়টি জানাতে হল। উনি ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, ফুল অ্যাটেনডেন্স এর জন্য চাপ দেবে না। অতিরিক্ত বেঞ্চ নেই। বিনীত স্বরে সোফিয়া বলল কেন মাস্টার মশাই ? নতুন জয়েন করেছ, ওসব তুমি বুঝবে না। যাও, ক্লাসে যাও, বেশি বাড়াবাড়ি করো না।

স্টাফ রুমে ঘটনাটা বলতেই মঞ্জুর সাহেব বললেন, সবেমাত্র এসেছেন ম্যাডাম, ধীরে ধীরে দেখবেন উনি কী জিনিস! শুরু হয়ে যায় নানান গুঞ্জন। কেউ বলেন উনি তো কাউকে একটা মগও কিনতে দেন না। কারণ সেখান থেকেও তো তাঁর কিছু উপরি উপার্জন হবে। আবার কেউ বলেন আজকাল শ্যালিকার সাথে হাওয়াও খেতে যাচ্ছেন পার্কে। বিল্ডিং এর সামগ্রিক চিত্র জীর্ণ শীর্ণ,কঙ্কালসার। অভিভাবক সভা, কালচারাল প্রোগ্রাম এসবের বালাই নেই। তা সত্ত্বেও উনার সামনে কেও কিছুই বলেন না।

কিন্তু অবর্তমানে নিন্দার ঝড় ওঠে স্টাফ রুমে। সোফিয়া আইনাল সাহেবকে বলেন আপনারা এত কিছু আড়ালে বলতে পারেন কিন্তু কোনো বিষয়েই তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করতে তো দেখিনা? অনেক সুবিধা পাওয়া যায় ম্যাডাম। যেমন আপনি স্কুলে না এসে সই করবেন,দিনের পর দিন ছুটি নেবেন কিন্তু মেডিকেল হবে না,ক্লাস কম নেবেন , ইচ্ছেমত বাড়ি যেতে পারবেন......। তুচ্ছ সুবিধা নেওয়ার জন্য প্রতিবাদ করবেন না!

একাদশ শ্রেণির ক্লাস নিচ্ছে সোফিয়া। মিড-ডে-মিল এর রান্না ঘর থেকে বেজায় চিৎকার শোনা যায়। সপ্তাহে বুধবার ডিম দেওয়া হয়। কিন্তু নির্ধারিত দিনে রান্নার মেনুতে ডিম না থাকায় হট্টগোল শুরু হয়। স্কুল সংলগ্ন প্রতিবেশিরা ছুটে আসে। এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে তারা জমায়েত হয়। তারা দাবী জানায় অন্যায়, বঞ্চনার বিচার হোক। উত্তেজিত জনতা হেড মাস্টার সহ স্টাফ রুমে তালা মেরে দেয়। যতক্ষণ এর বিচার না হয় আমরা খুলব না।

এদিকে ভিতরে ঝড় উঠেছে। প্রত্যেকে নিজেকে বাঁচানোর তাগিদ অনুভব করে। না, সেদিন আর কেউ চুপ থাকে নি।'আপনি বাঁচলে বাপের নাম।' কেউ বলে আপনি ধান্দাবাজ, প্রতারক। দিনের পর দিন আত্মসাৎ করেছেন স্কুলের সম্পদ। কেউ বলে আপনার জন্য আমাদের আজ এই অবস্থা। আমরা কেন ভুগবো আপনার জন্য। সবার সবকিছু বলা হলে সোফিয়া বলে —এই আপনার শালীনতার পরিচয় মাস্টার মশাই? আজ জনসম্মুখে আপনি উলঙ্গ।

লজ্জা

মা: কইরে এলিজা কী করছিস?
এলিজা: এইতো, বিছানা ঠিক করছি। বলো কী বলছো?
মা: আমি আজ তোর নানির বাড়ি যাবো, বাড়িটা দেখেশুনে থাকিস। তোর খালাও আসবে, ছোটো মামা, বড়ো মামাও থাকবে। নানির শরীরটাও ভালো নাই। আর কতই বা ভালো থাকবে, বয়স তো কম হলো না, আশির কাছাকাছি।
এলিজা: কখন আসবে? আমার টিউশন আছে। 4 টের সময় কৃষ্ণনগর এ স্যার এর বাড়িতে ইংরেজির স্পেশাল ক্লাস।
মা: বাড়িতে তালা দিয়ে পাশের বাড়িতে চাবি রেখে দিবি, আমার আসতে দেরি হবে।
এলিজা: স্যার এর বাড়ির উঠানে কামিনী ফুলের গন্ধ বাতাসকে ভরিয়ে দিয়েছে। শহরের পথে কোথাও আলোর অভাব নেই। দু পা এগুতেই খুব চেনা চেনা কণ্ঠের আওয়াজ ভেসে আসছে। একজন বক্তৃতা রাখছেন। ইসলামের প্রকৃত থিওরির উপর। লোকটি খুব তীক্ষ্ণ, যুক্তিবাদী।আমাদের পাশের গ্রামের মনসুর ভাই, তাঁকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি। মা ওখানে কী হলো বলো।
মা: তোর বড়ো মামা বলছে মা বেঁচে থাকতে হাজরি খানা দেবে, খানকার হুজুর বলেছে, মারা যাবার পর খানা করে কোনো লাভ নেই। বশির এর তো টাকার অভাব নাই, ডিলারির ব্যবসা রম রমিয়ে চলে। তিন তলা বাড়ি করেছে, ঘরে এ সি লাগিয়েছে, গোডাউন করেছে, কিছু জমি কিনেছে, ছেলেকে টাকা দিয়ে ব্যাঙ্গালোরে পড়তে পাঠিয়েছে।
এলিজা: মা, নানি তো এমনিই খুব ভালো মানুষ, এই সবের কী দরকার?
মা: বশির বলে এ সবই দাতা বাবার ইচ্ছা, ওসব ছাড়, হাতমুখ ধুয়ে পড়তে বস, তোর আবার সামনে চাকরির পরীক্ষা।
এলিজা: আজকে মনসুর ভাই এর একটা আলোচনা শুনে এলাম,প্রকৃত ইসলামিক জ্ঞান উনার আছে। খুব চর্চা করেন এই বিষয়ে।
মা: হ্যাঁ, শুনেছি ছেলেটি খুব ভালো বলে, ওকে তো সবাই ডাকে আলোচনা করার জন্য। কিন্তু যারা ডাকে তারাই বলে তাদের মনের কথা নাকি সে বলে না।
এলিজা: আমার সঙ্গে উনার ভালো পরিচয় আছে, সেদিন বলছিলেন তিন খলিফাকে কেন খুন করা হয়েছিল সে বিষয়ে। আমার উনার কথা শুনতে বেশ ভালো লাগে।
মা: তোর ছোট খালা গোলেনুর বলছিলো, চৈত্র মাসে গাড়ি ভাড়া করে দাতা বাবার মাজারে যাবে। কিছুদিন থেকে ওর বাড়িতে একটার পর একটা বিপদ লেগে আছে। তোর খালুর একসিডেন্টে পা ভেঙে আছে, দোকানে কাপড়ের বেচাকেনা ভালো নাই, তাই ও মানত করেছে একটা খাসি ও দশ কেজি মিষ্টি। দাতা বাবার কাছে কান্নাকাটি করবে, আপনি উদ্ধার করবে।
এলিজা: মা তুমি তো জানো, লাইব্রেরিয়ানের পরীক্ষা ই পাশ করে আছি, সামনেই ইন্টারভিউ।
মা: হ্যাঁ ভালোভাবে পড়, আমি মনে মনে একটা নিয়ত করে রেখেছি।
এলিজা: ঠিক আছে তুমি এখন থামো, আজ পিওন এসে চিঠি দিয়ে গেছে, পরশু ইন্টারভিউ হালিশহরে।
মা: যাবার সময় আমি যা বলে দেবো, তাই করবি, বুঝলি?
এলিজা: আমি রেডি, বেরিয়ে পড়ি তাহলে?
মা: সাবধানে যাবি, আর দাতা বাবাকে স্মরণ করবি।

সারা রাস্তা একটা চিন্তা মাথাকে অসাড় করে তুলেছে। মা যা বলে তাতে তো কোনো যুক্তি নেই, সবকিছুই অলৌকিক, ভিত্তিহীন। কিন্তু মনসুর ভাই এর অকাট্য যুক্তি তো খণ্ডন করা যায় না। ভাবতে ভাবতে মাথার ভিতর তালগোল পাকিয়ে যায়।

কাছেই গম্বুজ দেখা যায়, ঘোরের মধ্যে গাড়ি থেকে নেমে যায়, দশটি টাকা ভেতরে হাত বাড়িয়ে ফেলে দিয়ে ডোবার কচুরিপানা গুলির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকি, পরিচিত কণ্ঠের ডাকে ফিরে তাকায়, এলিজা শেষ পর্যন্ত তুমিও...! লজ্জায় মাথা নিচু করে রইলাম।

স্বপ্ন

সৃজিত : হ্যালো বনলতা, ঘুমিয়ে পড়লে?
বনলতা : না, পড়ছিলাম। বলো কী বলবে? এত রাত পর্যন্ত জেগে আছো, ঘুমোওনি?
সৃজিত: না, ঘুম আসছে না বনলতা।
বনলতা: কেন কী হয়েছে, আমাকে বলো।
সৃজিত: মনীষার কান্না, রুটিতে লেগে থাকা রক্তের দাগ, তোমার বাবার খুন, তোমার আমার কাজ না পাওয়া, আমায় অস্থির করছে বনলতা, আমায় পীড়া দিচ্ছে, আমার বুকের ভিতর রক্তক্ষরণ হচ্ছে।
বনলতা: তুমি যদি এমন করে বলো, আমি কোথায় যাবো বলতে পারো সৃজিত ! তুমি আমাকে মনে করিয়ে দিও না প্লিজ। আমার বাবার ছিন্নভিন্ন করা দেহ, রক্তাক্ত লাশ ...
সৃজিত: না বনলতা, এই যন্ত্রণা শুধু তোমার একার নয়। মনে করো নির্ভয়ার মায়ের কথা, মনে করো মনীষার মায়ের কথা, মনে করো রেললাইনে পিষে যাওয়া 17 জন শ্রমিকের কথা, মনে করো বনলতা, যে মায়ের পাঁচটি কন্যাসন্তান হয়েছে বলে ষষ্ঠ সন্তানটি ছেলে হবে কিনা ধারালো অস্ত্র দিয়ে পেট চিরে দেখা, মনে করো বৃদ্ধা মাকে ছেলের স্টেশন চত্ত্বরে ফেলে যাওয়া।
বনলতা: আমার ভালো লাগছে না। তুমি এমন করে বলো না প্লিজ, আমি খুব কষ্ট পাই। তোমায় একটা গান শোনাবো?
সৃজিত: শোনাও
বনলতা: মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে একেলা রয়েছো নীরব শয়ন পরে।

প্রিয়তম হে জাগো জাগো জাগো।
রুদ্ধদ্বারের বাহিরে দাঁড়ায়ে আমি একেলা স্বামী।

আমার বাবার কথা যখন খুব মনে পড়ে তখন আমি এই গানটি গাই।
সৃজিত: তুমি খুব ভালো গান করো। তুমি চাওনা বনলতা, এই পৃথিবীটা নন্দনকানন হোক!
বনলতা: কেন চাইবো না সৃজিত? তুমি আমার খোলা জানালা, তুমি আমার শরৎ মেঘের ভেলা, তুমি আমার মেঘহীন আকাশের পূর্ণিমা চাঁদ, তুমি আমার উদয়ন।
সৃজিত: তুমি বলছো আমায় উদয়ন? আমি কি পারবো বনলতা উদয়ন পন্ডিত হতে? যে উদয়ন হিরের খনির শ্রমিকদের মুক্তির পথ দেখিয়েছিল।
বনলতা: পারতেই হবে তোমাকে, সৃজিত। এই যন্ত্রণা আমি যে সইতে পারি না।
সৃজিত: শুধু আমাকেই পারতে হবে কেন বনলতা? তুমি তো কষ্ট পাও, অনুভব করো মানুষের যন্ত্রণা। তুমি আমার সহযোদ্ধা হতে পারো না? পারবে না বলো?
বনলতা: নিশ্চয় পারবো। তুমি আমি মিলে রচনা করবো শান্তির নীড়। আজ সুকান্তের সেই লাইনটি খুব খুব করে মনে পড়ছে, সৃজিত – যতক্ষন দেহে আছে প্রাণ, প্রাণপণে সরাবো এ পৃথিবীর জঞ্জাল ...এ বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি।
সৃজিত: হ্যাঁ, বনলতা, মনীষা যদি একবার তাঁর মায়ের সাথে শেষবারের মতো কথা বলতে পারতো কি বলতো জানো? ক্ষতবিক্ষত দেহ, কাটা জিভ নিয়ে ভালোভাবে হয়তো কথা বলতে পারতো না কিন্তু তবু বলার চেষ্টা করতো, মা আমার জন্য শোক কোরো না, তোমার মেরুদন্ড শক্ত করো, এমন প্রতিবাদ করো যেন তোমার প্রতিবাদ সারা পৃথিবীতে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে। যদিও তোমার প্রতিবাদের ভাষা কেড়ে নেবে রক্ষরা। তবু তুমি থামবে না।
বনলতা: সৃজিত, এতো তোমারই লড়াই। দানবতার বিরুদ্ধে লড়াই করে মানবতা প্রতিষ্ঠিত তোমাকে করতেই হবে। কৌরবদের যুগে যুগে পরাজিত করে অর্জুন।
সৃজিত: তুমি ঠিকই বলেছো বনলতা, তোমার উদয়ন, তার প্রভায় সমস্ত দানবিকতা পুড়িয়ে একটা নতুন ভোর উপহার দেবে।

ফিরোজ অনীক এর গল্প

কমেন্টর

'পার কমেন্ট দু-টাকা। অনেক কম মনে হয়, জানিস। দেখ, সেল সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, আমাদের দাম বাড়ছে না।

প্রথমে কত দিত মনে আছে?

পাঁচ টাকা।

এখন দেখ না সব কিছুর দাম বাড়ানো হচ্ছে আর আমাদের দাম কমছে।

আমরা তো পুরনো কর্মী এটলিস্ট আমাদের দামটা একটু বাড়ুক।' দুই বন্ধু কথা বলছিল এক পোড়ো মন্দিরের চাতালে। বয়স পঁচিশ- ছাব্বিশের কোঠায়। কথার ফাঁকে ফাঁকে ঝিঁঝিঁর ডাক শোনা যাচ্ছিল পাল্লা দিয়ে।

'এই চার বছরে কী কী হারালাম বলতে পারিস?'

সন্দীপ বলে, ' আমি চোর বনে গেছি। নিজের সামনে দাঁড়াতে পারিনা। এই বয়সে একটা চাকরি নেই। বি এস সি পাশ করেছি। মনে হয় এক সিঁধেল চোর আমি। কোনো আত্মসম্মান আছে? ভাল্ লাগে না বুঝলি.. মাঝে মাঝে মনে হয় ঐ মানুষটি তো সোশ্যাল মিডিয়ায় ঠিকই লিখেছেন অথছ ওকে ডিসটার্ব করতে হতে হবে। কারণ কী? না, পার কমেন্টে আমি দু-টাকা পাবো। নিজের মনুষ্যত্বকে বন্ধক রেখে দাস বনে গেছি।'

রতন বলে, ' আমরা কলেজ লাইফে এক সাথে আড্ডা দিতাম। মনিরুল আমার বেস্ট ফ্রেন্ড ছিল। ওর মায়ের রান্না আমার কাছে অমৃত । কতদিন চাচি আমাকে রেঁধে খাইয়েছে। সেই মনিরুলকে কারা পর করে দিল। প্রতিদিন কমেন্ট করি ' ওরা ' 'আমরা' করে। কোনো দিন ভাবিনি মনিরুল আমার শত্রু আমি মনিরুলের শত্রু। আমার তো মা নেই। ওর মা যখন আমাকে বাপজান বলে ডাকত বুকটা ভরে যেত। কী হলো বলত সন্দীপ, ওদেরকে আমি দূরে সরিয়ে দিলাম। এ কেমন চাকরি বন্ধু।'

সন্দীপ বলে ' এ চাকরিতে ওরা আমাদের বেশিদিন রাখবে না। আমরা জেনে গেছি ওদের কাণ্ড-কারখানা। ভেঙে গেছে আমাদের নেশা। আমরা স্হায়ী সম্মান জনক কাজ চাই। সেলের মিটিং এ আমি বলে ছিলাম। রাজ্য নেতৃত্ব কী বলল - আমরা ক্ষমতায় আসি আগে। আমি বলেছিলাম। কেন্দ্রীয় সরকার চাকরি রেল প্রতিরক্ষা কয়লা খনি কত কী তো আছে? সেখানেও তো চাকরি বন্ধ।'

কী উত্তর পেয়েছিলাম মনে আছে বন্ধু - -' যাও সেলের কাজ করতে হবে না। দেশ সেবার সুযোগ হেলায় হারাবে।'

কিন্তু আমার মনে হয়েছিল এ কী ধরণের দেশ সেবা? যেখানে মানুষ গৌন। ধর্ম পরিচয় নিয়ে মানুষকে ভাগ করার খেলাটা নাকি দেশ সেবা।

হ্যাঁ ভাই আমাকে কাল রাতে ফোনে অবশ্য বলেছে ব্লকে নতুন সেল কর্মীদের মনিটর। তাতে প্রতিদিন পাঁচ টাকা যুক্ত হবে। করোনায় বাপের ইনকাম বন্ধ। বয়স পঞ্চাশের উপরে। দিন রাতে ভয়ে ভয়ে থেকে মানুষটার প্রেশার বেড়ে গেছে। ছাঁটাইয়ের ভয়। অথচ রোজ আমরা কমেন্ট করছি। ছাঁটাই হোনা চাহিয়ে..'

ঐ মন্দিরে চত্বরে সকাল থেকে ভিড় থিকথিক করছে। পুলিশ এসেছে। রোজ রাতে এখানেই আড্ডা দিত রতন সন্দীপ। সন্দীপের রক্তাক্ত লাশ। পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ। বিরোধী দলের নামে পুলিশকে অভিযোগ করে স্হানীয় নেতৃত্ব।

রতন ভেবে পায় না কী করে কারা মারল সন্দীপকে। ভাবতে ভাবতে ফোন বেজে ওঠে রতনের।

জেলা থেকে ফোন, 'শোন ভালো আছিস তো? ব্লক থেকে লিস্ট পাঠানো হচ্ছে তোর কাছে। পুলিশকে অভিযোগ করবি ঐ নাম গুলোর বিরুদ্ধে। যেমন কাজ করছিলি করে যাবি। আর তুই নিশ্চয়ই চাস না সন্দীপের মতো.. তোরও..... ।'

বিষ-নারী

‘শাশুড়ি টাশুড়ি আমি পরোয়া করিনা। ওর কোনও মুছিদ্দি চলবে না। তোমার মাকে বলে দ্যাও দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নমাজ পড়তে যুতি পারে তাহিল্যে আমার সাথে কথা বুলতে আসবে না হলে খুটি হয়্যা বসে থাকবে। খাত্যে দিব না। অর কুনু যোগ্যতা আছে। যে আজ বাদ কাল মরবে এখন পনযত্তো উ নমাজ ধল্লে না। ক্যাথা সিলাই করবে। চশমা পিন্ধা বই পহিড়বে। বুলনু পির সাহেবের হাতে বায়াত হও। তাও নাকি হবে না। পির না মান্যে আল্লা আল্লা করেই বেহেশতে যাবে’– হাসিবা তার স্বামী মুজিবকে তীব্র ভর্ৎসনা করে শ্বাশুড়ির নামে অভিযোগ করে। বেচারা সারাদিন চায়ের দোকান চালিয়ে রাত দেশটায় ফেরে । ফিরেই প্রতিদিন দেখে একই চিত্র। আজ যে বেশি রকম কিছু ঘটেছে এ আশঙ্কা না করেই মুজাহার মুজিব বলে, ‘আমাকে দুটো খাতে দ্যাও। শরীল লিছে না...’

হাসিবা ঝাঁঝালো কন্ঠে ঝংকার দিয়ে ওঠে, ‘তোকে বিছ্যানেও লিবো না, খাতেও দিব না’।

মুজাহার জায়গায় বসে থাকতে পারে না । খুব বেশি অবাকও হয় না। কারণ বিগত পাঁচ বছর থেকে মা'র সাথে তার ঝামেলা রোজকার ঘটনা। আর মুজিব গাল-মন্দ জল ভাত। কথা বললে এই রাতেই বাপের বাড়ি যাবে। কতবার এমন ঘটেছে। মা পির মানবে না। ও জোর করে চাপাতে চায়। এর আগে মাকে হেসো নিয়ে কাটতে গিয়েছিল। মুজিব নিজেও পিরের মুরিদ নয়। ছেলে নবম শ্রেণিতে পড়ে।

বাপ দশ বছর আগে মারা গেছে। ছোট ভাই পৃথক। বউকে প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেও মন পায় না। সাথে মা খায়। মুজাহার বোঝে তার মায়ের কিছু দোষ আছে। কিন্তু সে যে কী করবে বুঝতে পারে না। রাগ মস্তকে উঠে যায়। সজোরে গালে এক থাপ্পড় কষিয়ে দেয়। মার খেয়ে কোনো শব্দ করে না হাসিবা। রাগে গর গর করতে বলে ‘তোখে মজা দেখাবো’।

পাশের ঘরে বাপকে জড়িয়ে ধরে ছেলে। মুজিব বলে, ‘কী লিবি বাপ.. কিছু বলবি..’

আব্বু, ‘মা না...থাক মা শুনলে মারবে আমাকে’।

‘কী হয়েছে বাপ...বল’। ‘আব্বু, মা দাদিকে মেরেছে। হাঁড়ি থেকে মাংস তুল্যে খেয়েছে। এই দেখো মাকে ধরতে গেলছিলাম। আমাকেও মেরেছে..’ বলে কান্না শুরু করে। তৌকির বলতে থাকে, ‘দুপ্পহরে মা নানির বাড়িতে ছিল। মালদার পির দাদু আসছে। পির দাদুর লাগ্যেই যত ঝামেলা। মা নানির ওখান থেকে আস্যেই দাদিকে মেরেছে। পির দাদু ভালো না’।

কোনো কথা না বলেই মুজাহার মুজিব বেরিয়ে মায়ের ঘরে যায়।

‘মা!’ বলে খুব কাঁদো কাঁদো গলায় ডাক দেয় মুজাহার।

‘আলি বাপ... আয়, ভাত খায়্যাছিস ব্যাটা... পির সাহেবের লাগ্যে রাঁধা গোস্ত আমি দুখ্যান খায়্যা লিয়্যাছি। বহু আসতে দেরি করছোলো।খুব ভোখ লাগাছোলো। বহু আমাকে বক্যাছে আমি কিছু মুনে করিনি বাপ’।

‘মা তোমার ঐ হাতটা ঢাক্যে থুয়্যাছো ক্যানে দেখি..’

কথা শেষ না হতেই মা বলে ওঠে, ‘কলতলায় পড়্যে গেলছুনু বাপ তোর বহুই তুলে আন্যেছে’। হাতটা দেখে মুজিব বলে, ‘আমার বাপজি তোমাকে কুনু দিন মিথ্যে বুলতে শিখ্যায়নি..... আমার বাপ একজন মুক্তিযোদ্ধা.....’

মা বাক রুদ্ধ হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরে মা বলে, ‘তোর বাপ বলতো আমাদের ছেলে যেন মুজিবের মত হয়... তোর বাপ কোনো দিন মহজিত যাতক না। আমাকে কুনু দিন জোর করেনি নমাজের লাগ্যে। শুধু বুলতক মানুষকে ভালো বাসলেই নেকি হয়।

হাসিবা আমাকে বোরখা পরতে বুলে। আর কত কি করতে বোলে। আমি কি খুবই খারাপ রে ব্যাটা? নমাজ তো পড়ি। কিন্তু পাঁচ বার তো পারি না... বাপ... আমি তো আল্লা আল্লা করি...আর এই বয়সে বাপ আমি

মুরিদ হতে পারব না'।

মুজিব মাকে রাতে খাওয়াতে পারে না। অনেক বলেও মা কিছুতেই খেতে চায় না। ডান হাতের বাহুতে গরম জ্বল দিয়ে শেক দেয়। মুজিব জানে সন্ধ্যা বেলায় খেয়ে নেওয়া অভ্যাস হাসিবার। তবু ছেলের ঘরে গিয়ে জিজ্ঞেস করে তোর মা খেয়েছে?' তৌকির বলে , 'পির দাদু এসেছিল দরজা লাগিয়ে খেয়েছে ওরা। আমি রান্না ঘরে গিয়ে একা খেয়েছি। আমি দাদির কাছে যাবো আব্বু? যা তুই ওখানেই ঘুমা'।

তৌকির ছুটোছুটি করে দাদির কাছে দৌড়ায়। মুজিব হাসিবার ঘরের দরজায় ধাক্কা দেয়। ও দরজা খোলে না। মুজিব আর রাতে খায় না। পাশেই ছেলের ঘরে শুয়ে ভাবতে থাকে পাঁচ বছর থেকে এই পির যাতায়াত শুরু করেছে। তখন থেকেই সংসারের এই হাল। কয়েকবার ওর উরুশে মালদাও গেছে। মুজিব শুনেছে হাসিবাকে নাকি এই এলাকার মুরিদ করার ভার দিয়েছে পির সাহেব। ভাবতেই কখন চোখ বুজে আসে।

রাত দুটোয় হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায় মুজিবের। দেখে দরজা খোলা। ঘরে বাইরে কোথাও নেই হাসিবা।

শ্বশুর বাড়িতে ছোট শালার নম্বরে ফোন করে জানতে পারে ওখানেও যায় নি। তবে আধ ঘণ্টা আগে পির সাহেব মালদার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে জানতে পারে শ্বাশুড়ির কাছ থেকে। মুজিব জানতে পারে ও আর ফিরবে না।

পরদিন পাড়ায় ঐ পিরের মুরিদরাই রটিয়ে দেয় মুজিবের বউ পীরত্ব লাভ করে মালদা পাড়ি দিয়েছে। আরো রটে স্বামী শাশুড়ির অত্যাচারের কারণে মালদায় এক খানকায় থাকে।

কিন্তু কেউ জানতে পারে না ওর মায়ের সাড়ে তিন ভরি সোনার গয়না এবং নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা হাসিবা যাবার সময় নিয়ে গেছে।

Mob: 9800426160

BHUINYA CONSTRUCTION

(Retailer, Works Contractor)

Prop:- Amal Bhuinya

VILL– EAST GOBINDAPUR • P.O +P.S– KAKDWIP
DIST– S. 24 PARGANAS • PIN-743347.
INDIA • WEST BENGAL

পুনর্জন্ম

আজ সে মরবে। কোনো পথ নেই। বউ ছেড়ে গেছে। বাবা মাকেও ঠিক মতো খেতে দিতে পারে না। কোনো কাজ নেই। হকারি বন্ধ ছমাস প্রায়। ক্লেদ অবমাননা অসম্মান নিয়ে বাঁচা। ট্রেন না চললে কীভাবে চলবে। ভাবতে ভাবতে গেঁদে কারসেডের দিকে এগোয় প্রহ্লাদ মন্ডল।

প্রহ্লাদ বার বছর বয়সে ট্রেনে হকারি শুরু করে। নুন ঝুরি দিয়ে শুরু। তখন বাবার হকারি লাইসেন্স দিয়ে সহানুভূতির খাতিরে এই কাজ শুরু। পক্ষাঘাত গ্রস্ত হয়ে বাবার বেঁচে থাকার নতুন অধ্যায়। এখন সেই ছোট্ট ছেলেটির বয়স আটাশ। নিজের হকারি লাইসেন্স করে নিয়েছিল ১৮ বছরেই।

অনেক চড়াই উতরাই পেরিয়ে রেল লাইনের ধারেই একটা মাথা গুঁজে বাঁচার ঠাঁই করে নিয়েছিল প্রহ্লাদ। একটা ঘর। একটা বারান্দা। অসুস্থ বাবা মা। বউ আর পাঁচ বছরের ছেলে নিয়ে ভালোই চলে যেত তাদের। গত মাসে চাপড় বস্তির নয়ন বেরা আত্মহত্যা করে ট্রেনের বগির মধ্যে। সেও হকার ছিল। প্রহ্লাদের খুব ভালো বন্ধু। আপদে বিপদে দুজনের পাশে থাকত। গত মাসে আত্মহত্যার পাঁচ দিন আগে এসেছিল প্রহ্লাদের কাছে। দুশো টাকা ধার চাইতে। দিতে ব্যর্থ হয়েছিল প্রহ্লাদ। নয়নের গত হবার পর নিজেকে ক্ষমা করতে পারে নি সে। সেই অপরাধে অপমানে জর্জরিত হয়ে কদিন বাড়ি আসেনি প্রহ্লাদ।

সন্ধ্যার আবছা আলো তখনও বিদ্যমান। ডুবন্ত সূর্য মিলিয়ে যেতে বসে শেষ রেশটুকু রেখে গেছে। পশ্চিম আকাশে যেন কাঠ কয়লা জ্বালানো আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছে। সেই আগুনের এক পলকা বুকে জ্বেলে নিয়ে কারসেড ধরে এগোতে থাকে প্রহ্লাদ। গায়ে পায়ে আগুন মেখে সে কারসেডে দাঁড়ানো ট্রেনের পাদানিতে পা দেয়।

লোকালে ট্রেনে গিজগিজে ভিড় ঠেলে ঘামের গন্ধের বিরক্তি , মিষ্টি মেয়েলি পারফিউমের গন্ধের স্মৃতি নেশাগ্রস্ত করে তোলে প্রহ্লাদকে। প্রহ্লাদ ট্রেনের ফ্যানে দড়ি বেঁধে বাঙ্কারের উপর উঠে পড়ে।

"একটি জীবন। একটি প্রাণ। সেই প্রাণ ব্যক্তি ইচ্ছে করে শেষ করে দিতে পারে না। ভগবান যে প্রাণ দিয়েছেন তাকে হত্যা করা পাপ " - - - নয়নের মৃত্যুর পর কথাগুলো বলেছিল কাসেম সাহেব। সবাই তাকে মাস্টার মশাই বলে ডাকেন। আজ উনার কথা গুলো খুব মনে পড়ছে।

গত বছর মন্টু বাহালিয়া ট্রেনে উঠতে গিয়ে দুটো পা ঢুকে যায় প্লাটফর্মের সাইডে। দুটো পা কেটে বাদ যায়। প্রহ্লাদ একদিন দেখতে যায় তাকে। এখনো সে বেঁচে আছে আত্ম সম্মানের সাথে। ধূপকাঠি কারখানায় কাজ করে।

বেরিয়ে আসতে দেখে পরশু মা বলে-" বাপ বউমাকে দেখে আয়। ও তো রাগ করে গেছে। শোন আমার বকনা গরুটা বেছে দে। গ্রামে গ্রামে নুন ঝুরি বেচতে শুরু কর। এভাবে আধপেট খেয়ে কীভাবে চলবে বাবা? তুই ছাড়া আমাদের তো কেউ নেই।"

ভাবতে ভাবতে কেঁদে ফেলে প্রহ্লাদ। কখন ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে যায়।

পূব আকাশ ঝলমলে রোদ উঠেছে। প্রহ্লাদের মুখে শরতের ঝকঝকে রোদ্দুর পড়ে। চোখ খুলে দেখে বেলা আটটা-নটা।ফ্যানে ঝুলন্ত দড়িটা ব্যাজার মুখে বেয়াড়ার মতো তাকিয়ে থাকে।

প্রহ্লাদ ট্রেন থেকে নেমে বাড়ির দিকে হাঁটতে শুর করে।

একটি লাশ ও কিছু ছায়া মানুষ

শেয়ালগুলোর আনাগোনা এ কদিনে অনেক বেড়েছে। পরশু ঈদ ছিল। মাংসের হাড়-হাড্ডি নিয়ে কাড়া-কাড়ি এখন শেয়ালের পর্যায়ে নেই। কুকুরের পর্যায়ে পৌঁছেছে। মাঝে আমবাগান। দুপাশে বাড়ি। জানলায় চোখ রেখেই ফটিক দেখে আলো আঁধারিতে চাঁদ জ্যোৎস্নায় তেনাদের অসম্ভব ছোটাছুটি।

রাত বাড়লেই ঘরের আলো বন্ধ করেই শেয়াল-শেয়াল, মানুষ-শেয়ালের নতুন খেলা আগ্রহ ভরে দেখতে থাকে ফটিক তার জানলার অনস্ক্রিন ফ্রেমে। সবাই ঘুমোলে দুপেয়ে মানুষগুলোর ছায়াতে ভরে যায় বাগানের এধার ওধার। ফটিক মাঝে মাঝে দেখে নিমগাছের আড়ালে ছায়াগুলো মিটিং করে আবার এদিক ওদিকে অদৃশ্য হয়ে যায়।

ফটিকের ছয়মাস রাত দিনে কোনো ফাঁক নেই। সমানে কাজ। অতিমারির আগে আকাশী এক বহুজাতিক কোম্পানির সিইওর সাথে চলে গেছে। যাওয়ার আগে বলে গেছিল, –"কোনো দিন তুমি আমার পেছনে আসবে না। তিন বছর তোমার সাথে ঘর করেছি। আর নয়। আমায় একটা শাড়িও কোনো দিন দিতে পারো নি। রইলো তোমার মেয়ে কনি" –এই শেষ কথা ছিল ফটিকের সাথে আকাশীর। আকাশীর বাবার বাড়িতে ফটিক সব কিছু জানিয়েও কিছু হয়নি। মাস খানেক পর পাড়ায় ফটিক শুনেছিল আকাশীকে ব্যবসায় নামিয়েছে সেই সিইও। তারপর আর কোনোদিন দুবছরের শিশুটিরও খোঁজ নেইনি সে। বৃদ্ধা মা ও দুবছরের শিশু নিয়ে দিন কাটছিল ফটিকের। ফটিক শুনেছে সেই সিইও বহরমপুরে থাকেন। তার আগের স্ত্রীও আছেন গ্রামের বাড়িতে।

রাত নামলে ফটিকের একটি কাজ কনিকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে মায়ের কাছে দিয়ে আসা। পরে অখন্ড সময়। রাত শেষ হয়না।

আজ ফটিক দেখে ছায়া মানুষগুলোর কাঁধে কোদাল-খুন্তির মতো কিছু। কাল রাতে লাস্ট দেখলো ছায়াদের সারবদ্ধ হাঁটতে। যেন খাটলিতে লাশ নিয়ে ছায়ারা হাঁটতে হাঁটতে ভ্যাট গাছের ঘন জঙ্গলে ভরা নিমতলায় পৌঁছল। ফটিক মোবাইল স্ক্রিনে দেখে রাত দুটো। কতক্ষণ ছায়ারা মিটিং করেছে ফটিক দেখেনি। সে ঘুমিয়ে গেছিলো।

পরদিন রাত ১১ টা, ১২টা, ১টা করে করে দুটো বাজলো। ছায়াগুলোর দেখা নেই। ফটিক অদ্ভুতভাবে লক্ষ্য করলো শেয়ালগুলো আশপাশ বাগানময় ছুটে বেড়াচ্ছে না। সবগুলো শেয়াল একসাথে ঐ নিমতলাতে জটলা করছে। মাঝে মাঝে লড়াই করছে। মনে হলো শেয়ালের সমাবেশ। ফটিক ভাবতে ভাবতে অবাক হলো ঐ মানুষগুলো তাহলে শেয়াল ছিল। তার দেখার ভুল। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে যায়।

সকালে অনেক দেরিতে ঘুম ভেঙ্গে দেখলো, সকাল ১০ টা। ঐ নিমতলাতে চোখ যেতে দেখল থানার গাড়ি। পাড়ার লোক থিকথিক করছে। পুলিশ একটা মরা-পচা লাশ উদ্ধার করেছে। পলিথিন মোড়া। পলিথিনের কিছু অংশ খোলা। আর একটা অবাক করা জিনিস ফটিক দেখল আট-দশটা শেয়ালের মৃতদেহ।

পুলিশ ফটিকের বাড়ির দিকে এগিয়ে এসে বলল, "আপনি ফটিকবাবু তো? বাড়ির পাশে এত বড় ঘটনা, আর আপনি ঘুমিয়ে আছেন? সারা রাত কোথায় ছিলেন?"

ফটিকের উত্তরের অপেক্ষা না করে থানার ওসি বলেন, "বাড়িতেই থাকবেন। দরকার পড়বে আপনার।

লোকে গুঞ্জন করছিল লাশের দেহে বিষ মাখানো ছিল। লাশটা একটা মেয়ে মানুষের।

হীরক রাজার উড়ন্ত বিচারালয়

প্রলয় 'হীরক রাজার দেশে' দেখছিল মোবাইলে। কারেন্ট নেই অনেক ক্ষণ। রাজা বলছেন, 'ঠিক--ঠিক ' মন্ত্রীরা তাল দিচ্ছিল - 'ঠিক'।হঠাৎ চার্জ শেষ। মোবাইলটা অফ হয়ে গেল। তার চোখ বন্ধ হয়ে এলো। "ঠিক - ঠিক, ঠিক-ঠিক, ঠিক-ঠিক" প্রলয় আওড়াচ্ছে। ক্রমেই গতি বেড়ে যাচ্ছে। প্যাসেঞ্জার থেকে এক্সপ্রেস। এখন রাজধানী-শতাব্দী ট্রেনের গতি তার উচ্চারণে।

হঠাৎ প্রলয় দেখলো বিচারালয় উড়ছে। বরাবর ট্রেন লাইন ধরে। উধাও ট্রেন। ট্রেনের লাইনে প্রলয়, ঐ ট্রেনের গতিতেই ছুটছে। আর তারস্বরে চিৎকার করছে - "কে আছো ধরো!ওকে ধরো! মহাধর্মাধীকরণ পালাচ্ছে! মহান বিচারক প্লিজ ধরো কেউ ওকে, অনর্থ হয়ে যাবে।!" প্রলয় ম্যাজিকের মতো দেখলো সেই রাজা! হীরকের রাজা ।তার দল বল সহ আর একটি ট্রেনে। "এ-তো বুলেট ট্রেন। এতো কাছে রাজা!" রাজাকে দেখে প্রলয় বলল, স্যার আমার একটা নিবেদন শুনুন। ঐ দেখুন মহা বিচারালয় উড়ে যাচ্ছে। প্লিজ স্যার একটু থামান। স্যার কাল কোর্টে একটা রায় হবার কথা। স্যার আমার চাকরিটা হওয়া দরকার। রায়ের ফয়সালা হয়ে গেলে চাকরিটা মাস্ট হয়ে যাবে। প্লিজ স্যার থামান।" রাজা চলন্ত জাপানী বুলেট গতি কিছুটা কমিয়ে পাশের লাইনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল, " কী কয়– গর্দভ নাকি? রায়দান? ফয়সালা? চাকরি? দেখতে পাস না ঘুড়ি ওড়াচ্ছি! গৃহমন্ত্রী এই উজবুকদের চাকরি চাই - এখনও বন্ধ হয়নি?একটা মন্তর চাই! গৃহমন্ত্রী বললেন– 'অনেক মন্ত্র তো রেডি, সুর করে প্রজাদের অধিকাংশ আওড়াচছে। কিছুকে শায়েস্তা করতে হবে এখনও'। রাজা বললেন-" শোন রে গর্দভ ঐ বিচারলয়ে মিটিং চলবে বেশ কিছু দিন ! বরং তুই বল্- 'চাকরি করে লাভ নাই খালি পেটে সুখ পায়!'– মন্তরটা খাসা, মুখস্থ করে নে। উড়ন্ত বিচারালয়! হা হা হা হা! মাঞ্জা দেওয়া ঘুড়ি!" বলেই রাজা তার জাপানি বুলেট ট্রেন আর মহাধর্মাধীকরণ নিয়ে ফুড়ত করে উড়ে গেল।

প্রলয় সমানে চেঁচাচ্ছে, প্লিজ সার,কালকের রায়টা খুউব জরুরি স্যার"-বলেই হঠাৎ কী যে হলো কাঁদতে কাঁদতে বলতে শুরু করল—"চাকরি করে লাভ নাই খালি পেটে সুখ পাই"। "প্রলয় কী রে অমন করছিস কেন? সন্ধ্যা বেলা এত ঘুম? ঘেমে তো একসা রে...এই নে তোর মোবাইল বন্ধ কেন? কৈলাশ ফোন করেছে।"

উঠে বসে মায়ের হাত থেকে ফোন নেয় প্রলয়-

–"বল কৈলাশ?"

–"আর হলো না রে!"--কৈলাশ বলে।

–"কী বলছিস কী হলো না?"

–"চাকরিটা আর হলো না। আদালত আবার রায়দান ছমাস পিছিয়ে দিয়েছে"- বলে ফোনটা কেটে দেয়। ঘোর কেটে যায়। ভেজা চোখ মুছে ফেলে প্রলয়। সূর্যাস্তের রং ছাপিয়ে 'উদয়ন' মাস্টারের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে প্রলয়ের চোখে।

লক ডাউন

ফতেপুর মোড়। পড়ন্ত বিকেলেও রোদের তেজ। লুঙ্গি শ্যান্ডো গেঞ্জি পরা দুজন লেবার কাজ করে ফিরছিলো ডিলারের বাড়ি থেকে।
হঠাৎ পুলিশ ভ্যান। দুজন পুলিশ নেমে তাড়া করলো।
"শালারা জানিস না লক ডাউন চলছে"
পালাতে পালাতে একজন বলল
" সার জানি তো--"
কথা শেষ হবার আগেই পিঠে পড়লো রুল্লার এর শক্ত ঘা, সাথে গালি ।
"বাড়ি তে খাবার নাই --- মুজারল ডিলার ডাকলো ---- তাই ---"
তার সঙ্গী প্রাণপণে পালিয়ে গিয়ে উঠেছে সন্তোষের মিষ্টির দোকানে।
ঐ দোকানের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ও চিৎকার করছে--- পালিয়ে আয় রে জাকির --কথা বুলিস ন্যা।'
এদিকে জাকিরের পিঠে ফের ঘা, 'শালারা ভাগ দেশের আইনশৃঙ্খলা মানিস না ....মহা মারিতে বাঁচতে চাইলে খেয়ে না খেয়ে বাড়িতে থাক, বুঝলি ...এর পর লক ডাউন পর্যন্ত যেন রাস্তায় না দেখি"।
পুলিশ ভ্যান চলে যায়।
জাকিরও মারের ঘায়ে কাতরাতে কাতরাতে গিয়ে ওঠে এ মিষ্টির দোকানে। মিষ্টি খাচ্ছিল খালেক মেম্বার । পুলিশের মারা ,এদের দৌড় দেওয়া সব কিছু পরোখ করে সে বলল, " দূর! তোদের জন্য এলাকায় সম্মান থাকে না। কদিন না খেলে কি মানুষ মরে রে...তোরা তো রেশনে চাল পাচ্ছিস তবু রাজমিস্ত্রির কাজে না গেলে চলছে না.."
হুমায়ুন মিস্ত্রি তাকিয়ে থাকে নির্বিকার। জাকির তখনো ব্যথায় অস্হির । খেঁকিয়ে ওঠে।
"না ভাই চলছে না-- সরকারকে বুলেন ভাই আমাদের কিছু টাকা দিতে।আর ডিলার তো আমাদের পাওনা চাল ডাল সবটা দিছে না..এমনি এমনি পুলিশের মার খাছি না ভাই..."
খালেক মেম্বার বলে--
"সন্তোষদা আরো দুটো মিষ্টি দিন আর আড়াইশো টক দই। দুপুরের খাবারটি অনেক রিচ ছিল -- মুজারুল ডিলারের বাড়িতে নেমতন্ন। মাঝে মাঝে উনি ভালো বেসে খাওয়ান। না করতে পারিনা। খাবারটা হজম হয়নি। ডিলার খুব ভালো মানুষ রে ..বদনাম করিস ন্যা। এই লক ডাউনের বাজারেও ওর বাড়ির চার তলার কাজে ডেকেছে, এ তো তোদের চৌদ্দ পুরুষের ভাগ্যি, যা বাড়ি যা ..
হুমায়ুন এতক্ষণ চুপ ছিল । হঠাৎ ফুঁসে ওঠে। বলে--
" কাজ করতেও পাবো না খেতেও পাবো না --
তাহলে কী করতে বলেন ভাই ?
চুরি ডাকাতি?"
মেম্বার গম্ভীর --" আইন হাতে তুলে নেবার জিনিস না। যা এখন বাড়ি যা। দেখি তোদের জন্য কী করতে পারি.."
হুমায়ুন ও জাকির ফতেপুর মোড় পার হয়ে চাঁদের পাড়ার দিকে এগিয়ে যায় । মোড়ে প্রায় প্রতিটি চায়ের দোকানে গুটি কয়েক যুবক, তরুণ মুরুব্বিরা ঝাপ ফেলে চা খাচ্ছে। হুমায়ুন চিৎকার করে বলে
" শালারা সব আইন দেখাচ্ছে ..."।

কোরবানির খাসি চোর

রবিউল মেম্বার তো জব কার্ডটাও করে দিতে চেয়েছিল। তখন চেন্নাইতে লেবারি করার জন্য সময়ে না আসতে পারায় কার্ডটাও হলো না । আজ চার মাস হাতে কোনো কাজ নাই।

কীভাবে দিন চলছে কেবল মাত্র সফি জানে। ময়না বিড়ি বেঁধে যা পায় তাতে কোনো ক্রমে তিনটা ছেলে মেয়ে মিলে চলে যায়। খাদ্য সুরক্ষার কার্ডটাও করতে পারেনি। ৯৮ সালের পদ্মার ভাঙনে বাপ-দাদার জমি জিরেত সব তলিয়ে যায়। তখন থেকেই কোনো প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নেই।

কদিন ময়না দেখতে পাচ্ছিল সফিকুল চুপচাপ থাকছে। পরশু-দিন রাত করে বাড়িতে ফিরলো। বাড়ির বাইরে সদাগর ঠিকাদার ফিস ফিস করে কী বলে চলে গেল। সফি ঘরে এসেই তিন হাজার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল- দশদিন চালিয়্যা লে.. ময়না কথা বলার আগেই বলে খাতে দে.. শুতবো..।

ময়না আর কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস করেনি। কয়েকদিন এই ভাবে কেটে গেলে ময়না টাকার কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে যায়। কিন্তু এত বড় অঘটন যে ঘটাবে সফি সে ভাবতেও পারেনি। জার্জিস মোড়লের কোরবানি চুরি গেছে আজ ভোর রাতে। দশাসই চেহারার খাসিটা কে চুরি করেছে এই খবর পাড়ায় চাউর হয়ে যায়। কিন্তু ময়নার স্বামী এমন করতে পারে? না খেয়ে কাটালেও তা হতে পারে না। ময়না অন্তত বিশ্বাস করেনা। সফির বাপ-মা মৃত। এতটুকু বয়সে বউ হয়ে এসেছে। সফির জন্য সে তার বাপের বাড়ি ছকননগর কতদিন যায়নি, মনে পড়ে না। আজ রাতে ও বাড়ি ফেরেনি। ময়নাকে বলে গেছিল চরবাবুপুর যাবে তার চাচার বাড়ি। কিন্তু সে এই জন্যই যে বাড়িতে ছিল না এখন বেশ বুঝতে পারে ময়না। গত জুম্মা বার সফি ময়নাকে বলে, এব্যের তো আমরা কুরম্যানি দিতে পারবো না.. জানিস ময়না রাস্তায় দেখ্যা আনু জার্জিস মুড়লের কত্ত বড় খাসি রে..

এক মুন গোস হবে... তুমি অ বাদ দ্যাও তো.... আমরা সামনে বার কুরম্যানি দিবো... এব্যের তো খাসিড্যা ধেড়িয়্যা মরে গ্যালো.. আমাকে দুট্যা ছোটো খাসি কিন্যা দ্যাও পুষবো.. প্রচন্ড রেগে যায় সফি--কুনঠে থাক্যে দিবো। টাকা কুঠে পাবো—তুই জানিস ন্যা.. আমার কুনু কাজ নাই...

বলে উঠে যায় সফি।

ভগবানগোলা থানার বারান্দার মেঝেতে বসে ভাবতে ভাবতে বুক মুখ রুদ্ধ হয়ে যায়.ময়নার... লোকটা এমন করতে পারলো..

সদাগরকে সফি চিনতে পারলো না.. কেবল চোখের অশ্রু নীরবে ঝরে যায় ময়নার। তার স্বামী চুরি করবে? তাও আবার কোরবানীর খাসি। আল্লাহ ক্ষমা করো। মাবুদ তোমার কাছে কী জবাব দিব?

কলোনির মানুষদের কোনো দিন মুখ দেখাতে পারব? কথাগুলো ভাবতে ভাবতে সে অজ্ঞান হয়ে যায়। থানা হাজতে সফিকুল। চোখ মুখ ফোলা। শরীরে কয়েকটি জায়গায় প্রচণ্ড মার হয়েছে। গণপ্রহারের ছাপ। পুলিশ না গেলে জীবিত ফিরত না। এক মহিলা কনস্টেবলের জলের ছিটায় জ্ঞান ফেরে ময়নার। কনস্টেবল বলেন - শোনো বাড়ি যাও । তোমার স্বামীর সদরে চালান হয়ে যাবে। এখানে বসে থেকে লাভ নাই।

ময়না সফিকুলের সাথে দেখা করবে বলেই থানায় এসেছিল।

মহিলা কনস্টেবল সফিকুলের সাথে দেখা করতে বলে। ময়না নীরবে চেয়ে রয়। কোনো কথা বলে না। সফির সাথে দেখাও করে না। থানার বারান্দা থেকে নামতে নামতে বলে- পুলিশ দিদি দেখেন যাথে ঈদের আগে উ ছাড়া না পায়। বলে চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে যায়।

ভালোবাসায় বিষ

—কমরেড মাত্র দুটো প্রাণ গেলো, ইটস এবসুলিউট মার্ডার। ইউ আর মার্ডারার কমরেড! —শুকনো চোখের জমানো অশ্রু এবসার্ড খরচ কমরেড।

অপ্রাপ্তির দীর্ঘ দিনের নেশা নিজের মেয়েকেও ছাড় দেয় না প্রাক্তন সেকুলার কমরেড। গায়ে তো ফোস্কা পড়ার কথা না বন্ধু! সেকুলার ও কমরেডী ভাবনা দুটোই ভুল ছিল না কমরেড? না হলে শেষে সনাতন ধর্মেই বা কেন আত্মসমর্পণ করলে?

বেশ ভালোই হলো— এবার দিল্লি থেকে এম এল এ সিটটা পাক্কা তোমার থাকছে। কনফার্ম? কী বলো? কোলকাতা হয়ে রাজধানী থেকে একটা ফোন মাথা ঘুরিয়ে দিল তোমার।

হে সনাতন বাম ভাবো, তোমরা কীসব সম্প্রীতির কথা বলতে না?

এই তার নমুনা কমরেড মেয়েকে মারলে, সাথে অপহরণ করে তার প্রেমিককেও? ছি!'

না! না! আমি টুম্পাকে হত্যা করিনি, চিৎকার করে ওঠে নরহরি রায়।

বাবা এসব কী বলছো? বিড় বিড় করে অনেকক্ষণ বকছো। আর চিৎকার করছো কেন? কলকাতা থেকে দলের নেতারা এসেছেন—নরহরির বড় ছেলে বলে। তুমি তো কোনো দিন নিষেধ করোনি ওদের মেলামেশা করতে—আর শেষে কীনা—টুম্পার মা ডুকরে কেঁদে ওঠে।

এই ঘৃণ্য রাজনীতি তোমার, তোমার এত লোভ! তুমি আমার মেয়েটাকে পার্টি অফিসে নিয়ে গেছিলে, তারপর তার লাশ ফিরলো! ভগবান তোমার পাপ ক্ষমা করতে পারে, আমি করব না।

সরফরাজকে ভালোবাসত টুম্পা তা তো সবাই জানে। তুমি তো একসময় ডাকসাইটে কমরেড। আজ না হয় দল বদল করেছো।

তুমি তো বলতে মানুষের কোনো জাত নেই। আর আজ তুমি দিন রাত ধর্ম নিয়ে দল করো! তোমার বিষ-বিদ্বেষী রাজনীতির খেলা আমার মেয়ের জীবন নিয়েছে!

তোমার বিষ-রাজনীতির সিঁড়ি আমার সংসারে বিষ ঢেলেছে। হায় রে, তোমাদের লোভের অগ্নি শিখা। সেই আগুনে বাস পুড়িয়ে মানুষ মেরে নেতা হবে। হ্যাঁ তুমি নেতা হও। আমি তোমার সাথে থাকবো না—এই বলে নরহরির সহধর্মীনি গৃহত্যাগ করে।

জানাযা

"হেফাজ চাচার জানাযা তাহলে হবে না? ইমাম সাহেব সারা রাত খুব গরম পড়েছে। লাশ সতেরো ঘন্টা হয়ে গেল। একজন কাউকে একটু বলুন। এই ব্লকের সব ইমাম সাহেব তো এখানে।"

"কে বললে হবে না? কী বলছো ? একটু ভেবে বললে? কাসেম সাহেবের আব্বা হুজুর কত বড় মাপের মানুষ! এখানে ইমামরা থাকবেন না তো কোথায় থাকবেন? "কিন্তু সাঁঝ রাতের মরা তো! কাসেমের আব্বা তো মারা গেছেন ভোরে। উনি কত বড় মানুষ তা আমরা জানি না ইমাম সাহেব। শুধু জানি তিনি এবং তার ছেলে খুব বড়ো বিড়ির ব্যবসায়ী। তাছাড়া কয়েকটা প্রাইভেট মিশন–স্কুলের ব্যবসাও তিনি করেন।

"দেখেন ইকবাল ভাই রাগ করবেন না? উনার আব্বা হুজুরেরে জানাযা হয়ে গেলেই তবে আপনার চাচার জানাযা হবে।"

ইকবালের মনটা খারাপ হয়ে যায়।সে বুঝতে পারে বিড়ি কোম্পানির মালিক কাসেম আহমেদের বাবার মৃত্যু আর তার চাচা সফদর আলির মৃত্যু এক নয়। দুজনেই প্রায় সমবয়সী। দু'জনের বয়স আশির কোঠায়। একজন ছিলেন কৃষক । আর একজন ঔরঙ্গাবাদের এক বিশাল বিড়ি কোম্পানির মালিক। কয়েকদিন আগেই কলকাতা থেকে চিকিৎসা করে ফিরেছেন। সুগার-প্রেসারের রোগী ছিলেন তিনি।তার তিন ছেলে ও দুই মেয়ের নামে কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তি। কলকাতায় নিজস্ব বাড়ি তিনটে। গাড়ি ছোটো বড় মিলিয়ে ১০ খানা। তার কোম্পানির বিড়ি বিদেশেও যায় শুনেছে তৌহিদ ইকবাল। ইকবালের ইলেক্ট্রিক ডিপার্টমেন্টে চাকরি। আপন চাচা হেফাজ আলি। মা-আব্বা তিন বছর বয়সী রেখে মারা যান। সেই চাচাই তাকে পড়া-শোনা করে বড় করেছেন। আজ এই চাচার জানাযা পড়ানো তার কর্তব্য।

কাসেম আহমেদের বাড়ির কাছেই টিনের চালার বাড়ি হেফাজ চাচার। সারাজীবন কৃষিই তার পেশা। দুই বিঘা মাঠান জমির উপর তার মরণ বাচন। চার মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। ছোটো ছেলে এম এ পাশ করেছে বাংলা বিষয়ে। সেই চাচা আর নেই। জানাযা পড়া ব্যাগর দাফন কাফন হচ্ছে না।

ইকবালের চাচি সারা রাত কাঁদছেন। মাঝে মাঝে দাঁত লেগে যাচ্ছে। তার শরীরের অবস্থাও ভালো নয়। ছেলে উমর মুখ নিচু করে বসে আব্বার সিথানে। ছোটো বোন ডুকরে কেঁদে ওঠে। আব্বা বেশিই ভালো বাসতো এই মেয়েকে। ওর নামটা তাই আদরি।

ইকবাল কাসেমের বাড়ি যায়। সেখানে দেখে সমস্ত ইমাম তালবিলিমরা সুর করে কোরআন পড়ছেন। কাসেম সাহেব বসে আছেন আরাম কেদারায়। পায়ের কাছ দুজন দারোয়ান।

"কী রে কিছু বলবি ..? "

"হ্যাঁ বলতেই এসেছি। হেফাজ চাচা কাল সাঁঝে মারা গেছেন। অনেক সময় তো চলে গেছে। তো জানাযা " কথা শেষ হবার আগেই কাসেম বলে ওঠেন-" তুই সামান্য একটি চাকরি করিস! এত কথা কী রে ? শোন্, বিকেলে জানাযা হবে আব্বার। তার পর দেখ যাবে। এখন যা! মন্ত্রী আসবেন বলে একটু দেরি হচ্ছে।"

ইকবাল মুখে কথা বলতে পারে না। প্রচন্ড রাগে মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়ে- "তুই তো একটা চামার রে! তুই গুন্ডা পুষিশ, মৌলবিও পুষিশ। তোর এরা পোষা কুত্তা। তোর কথা বাইরে যাবে এরা? "

ওখানেই কয়েক জন কনস্টেবল ছিলেন। কাসেমের ইশারায় ওকে গাড়িতে তোলে। কাসেম বলে-"তুই তো ধর্ম বিরোধী রে–কী মৌলবী সাহেব একটা ফতোয়া দিন। তুই আমার বিড়ি শ্রমিকদের খেপাচ্ছিস মজুরি বাড়ানোর জন্য। নেতা হবার জন্য। নেতা হবি? তোর নেতাগিরি বার করছি। কনস্টেবল –ওসিকে ফোন করো। কয়েক মাসের জেল। তার পর মজা বুঝবে।"

হেফাজ চাচার লাশ পড়ে রয়।

ঐ দিকে তিন তলার উপর থেকে সুরেলা কন্ঠে কোরান তেলাওয়াতের আওয়াজ শোনা যায়।

খতম

"মার্ক করে রাখতে পারিস ন্যা। অর বহুডাকে কে দেখবে বে.. গ্যান্দা বাচছা কোলে"– নীরব নিশ্চুপ পার্টি অফিসে রাত বারোটায় তীক্ষ্ণ গলায় ঝাঁঝালো ভর্ৎসনা করেন কলিম মাস্তান।

উল্টো দিকে তিনটি প্রাণি চুপ। এমন তীরস্কার তাদেরকে কখনো শুনতে হয় না। মামা বরং খুশি হন। কলিম উদ্দিনের এমন ভাগ্নে শ দেড়েক আছে। ভোট এগিয়ে আসতে ভাগ্নেরা তৎপর। মামা সব সময় পালটায় ক্ষমতার হাত ধরে। মামাকে ক্ষমতা খুব পছন্দ করে। মামা তো আসলে উমি চাঁদ – রায় দুর্লভ। কিং মেকার। মামার কদর খুব।

মামার মাথার বুদ্ধি তিন সেকেন্ডে খুলে যায়। বলে, যা রহিম্যার মাগিকে ডাক্যা লিয়ায়।

আধ ঘন্টার মধ্যেই চলে আসে, চম্পা। বলে 'এত রাতে ক্যানে ডাকলেন? ফরাজের বাপ সাঁঝে বারহিয়ে বাড়ি আসে নি। কুন্ ঠে গেলছে..দেখ্যাছেন ভাই?' কলিম কাঁদো কাঁদো গলায় বলে–" চম্পা, কত বললাম তোর ভাতারকে 'কৃষি বাঁচাও কৃষক বাঁচাও সমিতি' করা বন্ধ করতে। শেষে–এই দিন দেখতে হলো..

'কী হয়্যাছে ভাই?' –উদ্বিগ্ন চম্পা জিজ্ঞেস করে। 'রাজনীতি করতে যায়া নিরীহ লোকটাকে মরতে হলো.." কলিম আক্ষেপ করে। 'মঘা পুলিশকে খবর দিয়াছে ...আমি ফোন করেছিনু.. পুলিশ লাশ তুলতে আসবে..'

চম্পা চিৎকার দিয়ে কেঁদে ওঠে - আমার কী হবে গো? ফরাজের বাপ আমি কী লিয়্যা থাকব... বলেই বেঁহুশ হয়ে যায়–"

কলিম বলে, তোরা শুন হুঁশ হলে তোরা চম্পাকে বাড়িতে থুয়্যা আসিস–

মামা তাহিলে– আমরা ভুল লোককে মারিনি.. কালু বলে ওঠে।

ধূর পাগল–এই শালা আমার লাকে দম তুলে দিয়াছোলো গোটা এলাকায় ভোট ক্যাপচার করা মুশকিল হোছোলো... তোরা টেনশন লিশন্যা... আমি পাঠালছুনু রহিম্যাকে যাতে তোরা কাম খতম করতে পারিস...

যা এই মাগিকে বাড়িতে ফেলে আয়.... শালা কর এবার কৃষক সমিতি.. কলিম অফিস থেকে বের হয়ে যায়। একটা ফোন আসে। কলিমকে বলতে শোনা যায় –" হ্যাঁ স্যার এলাকা নিরাপদ। সব ভোট আমাদের "।

নিমগাছের ছায়া

তপ্ত গরম। ঘর্মাক্ত সকাল। ভোর রাতে উঠেছে শবনম। থালা-বাটি-হাড়ি বাসন ধুয়ে সকাল আটটার মধ্যে রান্না কমপ্লিট করেছে। এর মাঝে নাসিমের মোবাইলেও লক্ষ্য রেখেছে। রান্না ঘর থেকে মোবাইলের রিং টোন শোনা যায়। বুকের মধ্যে কেমন করে তার।

নাসিম ঘুম থেকে উঠে স্নানে ঢুকেছে। ওকে অফিসে পৌঁছতে হয় সকাল নটায়। ইতিমধ্যে ওর টিফিন রেডি করে ব্যাগে ঢুকিয়ে দিয়েছে। এটা প্রতিদিনের কাজ শবনমের। ওদের তিন বছর হলো বিয়ের। নাসিম অফিস চলে গেলে শূন্য হয়ে পড়ে সে। সাত-পাঁচ ভাবে। দিনে অন্তত দশবার ফোন করে। নাসিমের ফোন ওয়েটিং অথবা ব্যস্ত পেলে ভীষণ অস্হির হয়ে ওঠে শবনম।

তুমি আমার ফোন ধরছো না কেন? কতবার ফোন করেছি, দেখেছো? কিছু হয়েছে?

কী হবে? আমি তো লোহার মানুষ! আমার কী মন আছে? তুমি তো ওয়েটিং এ রেখে দিলে। একমাত্র তোমারই এম. ডি আছে। রাত দিন ফোন- ফোন।আর কেউ অফিস করে না।

অভিমানে ফুঁপিয়ে ওঠে শবনম। আমি অফিসের কাজেই ব্যস্ত ছিলাম। ফোনে কি শুধু এম ডি, আরো কতজনের সাথে কথা বলতে হয়।

তুমি জানো না সে সময় আমার কী হয়? শুধু ফাঁকা ফাঁকা লাগে! ভয় হয়!

শবনম এসব কী বলো। রাখো আমি ব্যস্ত আছি। রাতে এসে কথা বলব। বলে ফোন রেখে দেয় নাসিম। শবনম কান্নায় ভেঙে পড়ে। মানতে পারে না। নাসিম তো তার। ও এক বাক্যে কেন রেসপন্স করবে না। কেন তাকে ওয়টিং থাকতে হবে। ওর মনে হয় নাসিম তাকে অবহেলা করে। শবনম তো ওকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। ও ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রী ছিল। সে তো যথেষ্ট মন বোঝে। প্রফেসররা ওর খুব প্রশংসা করত। নিমগাছের কয়েকটা ডাল ছাদের উপর নেমেছে। এই নিমগাছের ছায়াতে প্রতিদিন নিজেকে শীতল করে শবনম। ভাদ্রের রোদে ছাতার মতো। কয়েকটা ডাল বেখাপ্পা। সাইজ করতে বাম হাতে ধরে ডান হাতে দা'র কোপ দেয়। ধারালো দা এর কোপ পড়ে বাম হাতের পরে। শবনম পা ছড়িয়ে প্যারাপিটে হেলান দিয়ে বসে পড়ে। বাম হাতের পেশি থেকে গল গল করে রক্ত পড়ে পড়ে জমাট বেধে গেছে। অচেতন অবস্থায় কতক্ষণ পড়েছিল খেয়াল নেই। তার ননদ দেখে এই অবস্থায়।

এখন নার্সিংহোমের বেডে। শবনমের হাতের চেটো দুটো ধরে বসে উদাসীন নাসিম। ডাক্তার বলছেন সমস্যা নেই। আর বেশিক্ষণ ঐ অবস্থায় থাকলে বিপদ হতে পারত। রাতেই বাড়ি ফেরে ওরা। কোম্পানির এমডির ফোন আসে শবনমের মোবাইলে। দুঃখিত— শবনম। আপনার এই দুর্ঘটনা ঘটল। অথচ নাসিম সাহেব কাছে নেই। ও তো এএমডি। ওকে কখন কোন জেলায় ছুটতে হয় ঠিক নেই। ওকে আজ হরিহর পাড়ার সাব অফিসে যেতে হয়েছে। ফলে পৌঁছতে দেরি হলো। আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন।

একদিন আমি আমার হাজব্যান্ড আপনার রান্না খেতে যাবো। আপনার গানও শুনব। খুব ভালো গান করেন শুনেছি। গুমট গরমের অবসান হয়। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে। নাসিমের বুকে মুখ রেখে কান্না শেষ হতে চায় না শবনমের।

সকালে সাড়ে আটটায় ফোন বেজে ওঠে নাসিমের মোবাইলে। শবনম ফোনটা নিয়ে গিয়ে দেয় নাসিমকে।

নিমগাছের ঝুঁকে পড়া ডাল গুলোর নিচে নাসিম দাড়ি সেভ করতে করতে বলে, তুমি ফোনটা ধরো। বলো, আজ অফিসে যাবো এক ঘন্টা পরে। সকালের সূর্যের ছটায় মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে শবনমের।

স্বপ্নের রাজপথ

লাল রাস্তা। টুকটুকে লাল। জুবিন হাঁটছে। আপ্লুত, অভিভূত।স্বপ্ন দেখা আর হাঁটা। একটা গান ভেসে আসছে-ফসলের মাঠ থেকে--

"আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায় লুকোচুরির খেলা "

আর একটু এগিয়ে আর একটা গান ভেসে এলো কারখানা থেকে। যেন আনন্দের কলতান। বাঁক ফিরতে দেখা মেলে সেই উঁচু চারতলা বাড়ির দিকে। কারা আল-কাতরা মাখিয়ে দিয়েছে সব দেওয়ালে। বাড়িতে কেউ নেই। এক বয়স্ক বৃদ্ধ বলল-

" বাবা কোথায় চলেছো?"

জুবিন - "রাস্তায় হাঁটছিলাম।"

"আপনি কি হাটতে পারবেন এই রাস্তায়?"

"না বাবা অভ্যস্ত নই.. তাছাড়া আমার ছেলের এই রাস্তা হাঁটতে নিষেধ"

"ঠিক আছে। থাকুন।" জুবিন এগিয়ে চলে। এগিয়ে চলে একই রাস্তা ধরে। দু - যুগ পার করেছে সে। তৃতীয় যুগে শেষের দিকে- জুবিন রাস্তায়। অবাক হয়ে জুবিন দেখলো সেই বৃদ্ধ। বেঁচে। কিন্তু বাড়ির আল-কাতরা কোথাও দেখা যাচ্ছে না। টুকটুকে লাল বাড়ি ।লাল রাস্তার ধারে। তখন ছিল চার তলা। এখন আকাশ চুম্বি।

রাস্তার কিছুটা অগ্রসর হলো। দেখলো লিকলিকে চেহারার শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনার জন্য সমাবেশ। তাতে অর্থমন্ত্রীর ভাষণ চলছে।

আর কিছুটা এগোতে দেখল দুটো মোষের গাড়ি। ফসল নিয়ে কাদায় পড়ে। গাড়োয়ান গাড়ি তুলতে না পেরে ফসল কাদায় ফেলে দিচ্ছে।

জুবিন অবাক। কৃষক জবাব দিল দাম নেই। এখানেই থাক।

তারপর রাস্তাই গেলে ভেসে। ভাঙ্গা চোরা পথ ধরে রাস্তায় কিছুটা এগিয়ে যেতেই জুবিন দেখলো, কারা যেন রাস্তা রিপেয়ার করছে বলছে—দীর্ঘ বছরের রাস্তা হাঁটার অযোগ্য। আমরা সারিয়ে দেব বন্ধুগণ। আপনারা এই রাস্তায় হাঁটবেন। আমরা কথা দিচ্ছি এই রাস্তা আপনাদেরই।

জুবিন ফের রাস্তা ধরলো। রাস্তার ধারে সেই লাল বাড়ি নেই। দেখলো রাতারাতি রং বদলে গেছে।

আরো কয়েক বছর হাঁটছে। দেখছে সেই একই দৃশ্য। মূহ্যমান জুবীন গোলক ধাঁধায় ঘুরে মরছে। ভাবছে কোনো রাস্তায় গেলে রাজপথে পৌঁছবে। এ-তো ওকে ভুলোতে ধরেছে। কিছুটা এগিয়ে মাঠের মাঝে একটা জায়গায় বসলো জুবিন। পূবালি বাতাশ গায়ে মেখে কমপ্লিট ইউটার্ন নিল সে।

মাটির কাঁচা রাস্তায় পা ফেলল জুবিন। মাটির কাছ থেকে সে শিখে নিতে চায় নতুন রাস্তার নির্মাণ প্রযুক্তি।

ফসলের দাম ও কৃষক

বাদলের চায়ের দোকান। দুপুর বেলা। দুজন মাঝ বয়সী কৃষক। মর্জেম সেখ, ফরমান আলি। সাথে বয়স আটাশের যুবক কাওসার।

কাওসার – চাচা ভুট্টা বেচলেন? কী দাম পেলেন আপনারা?

মর্জেম – বাপ্ কী বুলবো বলতে পারো। চার বিঘা জমি। ৪০ মন ভুট্টা। ৩২ হাজারে বেচলাম। বীজ ৬ হাজার। সার, তেল, বিষ, জল, কাটাই মাড়াই এ ২৮ হাজার।

ফরমান – এত ভালো ফলনে কী লাভ হলো মর্জেম ভাই। তেল বিষ সার কোম্পানি তো সব লিয়্যা গ্যালো। বাকিটুকু আড়তদার।

কাওসার – তাহলে তো এই দাঁড়ালো কৃষকের জমিটুকু শুধু তার। জমিতে ভাড়া খাটছে কৃষক।

মর্জেম – আমার বড় ইচ্ছা ছিল এবার টিন গুলান খুল্যা একটা ঘরে ছাদ করতে পারব। এঁদুরে তলে তলে সব কেমন – করে টান্যা লিলে মালুম হলো না।

ফরমানপাট বুন্যাছুনু। কাটাও হয়্যা গ্যালো। দু বিঘ্যা জমির পাট।একই দশা হবে। আমরা খাট্যা মরনু – শুধু হাতির প্যাট ভরাছি।

কাওসার – আচ্ছা এই অবস্থা তো প্রায় চল্লিশ বছর চলছে। এ থেকে কীভাবে বেরোতে পারবে কৃষক?

মর্জেম – কোম্পানির কাস্টমার আমরা। অরা মাল বেচে লাভ করছে। ফির ফসল বিনি পাস্যায় লুট্যা লিয়্যা যাছে। আমারেহ্ তো পা হাত বান্ধা। কুনু রাস্তা নাই?

কাওসার – আমরা যারাকে ভোট দিচ্ছি তারা কি কৃষকের এই সমস্যার কথা ভাববে না?

ফরমান – ভোটের আগে ওলাপালি করে অরা তো বোলে কৃষক না বাঁছলে দ্যাশ বাঁছবে না। পরে ভুল্যা যায়। চাষারা মরলেই কী আর বাঁচলে কী – এই ভাব্যা থাক্যে যায়।

মর্জেম – সভাই ওখানে যায়্যা তো রাবণ হয়্যা যায় বাপ। ফেরাউন!

কাওসার – তাহলে রাবণ তো কাউকে শান্তিতে থাকতে দিবে না।

ফরমান – তাহিল্যা কী করব এখন বাছা বোলো। সবকে তো দেখনু। তুমার কথা শুনি।

কাওসার – চাচা চাষ তো করতেই হবে কিন্তু চিনতে হবে নিজের ভেতরের চোরটাকে। সাথে সাথে সমাজের চোরের বিরুদ্ধে লড়াই সোজা হবে।

মর্জেম – কোম্পানির দালালি তাহিলে বন্দ হবে?

কাওসার – ফেরাউনের অত্যাচার কি একদিনে বন্ধ হয়্যাছোলো চাচা? চলেন আগে রাবণ চিনি।

তানিয়া খাতুন এর গল্প

চশমা

সকাল-সকাল পিয়ালীর চশমাটা ভেঙে গেল। ভাঙা ফ্রেমটা হাতে নিয়ে তার মাথায় প্রথমেই দুটো চিন্তা এলো – এক,আবার হাজার টাকা! দুই,নতুন চশমা না আসা পর্যন্ত সবই ঝাপসা দেখতে হবে। একবছর হলো পিয়ালীর ডিভোর্স হয়েছে, তারপর থেকে বাবার বাড়িতে থাকলেও বাবার থেকে হাত পেতে টাকা চায়তে কেমন যেন সংকোচ হয়। বাংলায় অনার্স পিয়ালী ডিভোর্সের পর আবার নেট/সেটের জন্য কোচিং-এ ভর্তি হয়, সেই সুবাদে বাবার দেওয়া হাতখরচা থেকে একহাজার টাকা বাঁচিয়ে রেখেছিলো সামনে সপ্তাহে কোচিংএর সবাই মিলে শান্তিনিকেতন যাবে বলে। কিন্তু এখন নতুন চশমা আনতে টাকাটা চলে যাবে। পরে যাওয়ার জন্য পলাশের দেওয়া কুসুম রঙের শাড়িটার দিকে তাকাতেই পিয়ালীর ফোনটা বেজে উঠল--

– বল তরু..

– এই শাড়ি পরে যাবি? আমি ভাবছি চুড়িদার পরে যাব।শাড়ি মেইনটেইন করতে পারব না।

– আমার যাওয়া হচ্ছে না রে। তোরা ঘুরে আয়।

– এগুলো একদম ভালোলাগেনা, আমরা সবাই মিলে সবকিছু ঠিক করলাম,আর এখন বলছিস যাবি না.. কেমন লাগে রে এরম কথার খেলাপ করতে?

– আসলে,আমার শরীরটা..

– থাক,রাখলাম।

সত্যি, কথার খেলাপই বটে! বছর দুয়েক আগে পলাশ এই ফ্রেমটা পছন্দ করে পিয়ালীকে কিনে দিয়েছিলো,পলাশ তখন বেকার,পিয়ালীর বাড়িতে ওকে মানলো না। পিয়ালীর ধুমধাম করে বিয়ে হলো উচ্চবংশে, উচ্চপদস্থ এক সরকারি অফিসারের সাথে। উচুবংশের মান রাখতে বিয়ের ছয়মাসের মাথায় ডিভোর্সও হয়ে গেলো। ডিভোর্সের পর কোনো অনুষ্ঠানে সে যায় না,তবে শান্তিনিকেতন যাওয়ার সুপ্ত ইচ্ছে তার ছিলো। কিন্তু বাঁধ সাধলো এই চশমা, দুবছর পর সে যেন প্রতিশোধ নিচ্ছে।

অনেকদিন পর এদিকের বাজারটাই বেরিয়ে পিয়ালীর সবকিছু যেন অচেনা লাগছে, এত দোকানপাট কবে হলো! চশমাটা সারাতে সে একটি বড়োসড়ো দোকানে ঢুকলো–

– (মাথা নীচু করে কাজ করতে থাকা এক ব্যক্তি বলল)বলুন, ফ্রেম কি সাথে এনেছেন? নাকি নতুন চশমা বানাবেন...

– পিয়ালীর বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো, পলাশ..শরীর কত খারাপ হয়ে গেছে!পিয়ালী কোনো কথা না বলে, ভাঙা চশমাটা পলাশের দিকে এগিয়ে দেয়।

– পলাশ কিছুক্ষণ পর চশমার ফ্রেমটা চেঞ্জ করে আনলো।

– কত দেব?

– লাগবে না।

– তারপরেও পিয়ালী একটি পাঁচশো টাকার নোট পলাশের দিকে এগিয়ে দেয়।

পিয়ালী বাড়ি এসে দেখে চশমার বাক্সে ঐ পাঁচশো টাকার নোটটা। দূরে রাখা কুসুম রঙের শাড়িটার দিকে তাকাতেই পিয়ালীর নতুন চশমা ঝাপসা হয়ে এলো।

ভালোর মুখোশ

–এই সুতপাদি, আজ বিকেলবেলা হোস্টেল সুপার মিটিং ডেকেছে, থাকছো তো? তুমি কিন্তু মাংসের সমস্যাটার কথা সুপারকে জানাবে।

–হ্যাঁ রে তমা, জানাতে হবে। বুধ-রবি দুদিন মাংসের দিনে একদিনও মাংস খেতে পাচ্ছি না, রোজ "মাংস শেষ" বলে হাতে একটা কাঁচা ডিম ধরিয়ে দিচ্ছে!

–আরে, ওই রান্নার মাসিটা তো চোর গো। দেখোনা, ঘর ঝাড় দিতে এলে ঝাড় দেওয়ার নাম নেই শুধু আমাদের জিনিসপত্রের দিকে কেমন ড্যাব-ড্যাব করে তাকায়।

–মাসির কেন দোষ দিচ্ছিস? সুপার যদি ঠিকঠাক মাংস দেয় তাহলে তো কম পড়ার কথা না।

–তা ঠিক। কিন্তু তুমি মাসিকেও একবার বোলো তো, ঠিকঠাক যেন ঘর ঝাড় দেয়, রান্নার তো ঐ ছিরি!

–মিটিং-এ সব সমস্যার কথা সবাই মিলেই বলব চল।

–তুমি এতো সুন্দর গুছিয়ে কথা বলো! তাই তোমাকে বলতে বলছি..

–থাক, হয়েছে।

মিটিং শেষে–

–সুতপাদি, তুমি জাস্ট ফাটিয়ে দিয়েছো। সুপারের মুখখানা তোমার কথায় কেমন লাল হয়ে গেছিলো। আর মিথ্যেবাদী মাসিটা কেমন ঝাড় দেওয়ার কথা অস্বীকার করলো। এদের সাথে পেরে ওঠা মুশকিল। তবে তুমি কিন্তু ল' নিয়ে পড়তে পারতে, এতো ভালো ঝগড়া করতে.. না মানে, যুক্তিপূর্ণ তর্ক করতে পারো।

–ওসব বাদ দে, কিন্তু তুই তো মুখ-ই খুললি না! সমস্যাগুলো যখন বলছিলাম তখন আমার সাথে "হ্যাঁ-না"টাও তো বলা যেতো নাকি?

–তুমি জানোইতো আমি সবার সাথে মিলেমিশে থাকতে চাই, কারো সাথে খারাপ ব্যবহার করতে পারিনা।

সুতপা চুপ করে গেল।

পরের দিন বুধবার সন্ধ্যেবেলা সুতপা তমাকে খুঁজছে, মাসির সাথে রান্নাঘরে ওর হাসির আওয়াজ শুনতে পেলে সুতপা তমাকে ডাক দিয়ে-- ," আমার রাতের মিলটা নিয়ে রাখিস, পড়তে গেলাম।" বলে বেরিয়ে যায়।

রাত্রে ওরা দুজন খেতে বসলে, সুতপা দেখে, পাতে আজ আবার মাংস নেই। কিন্তু তমার পাতে ঠিকই আছে। সুতপা বলে–

–তোর পাতের এই দু'টো লেগপিস কী বিকেলবেলা রান্নাঘরের সেই হাসির বিনিময়ে পাওয়া?

–সুতপাদি, তুমি তো জানোই আমি কারো সাথে খারাপ...

–জানি, তোকে খারাপ ব্যাবহার করতে আমি বলিনি। তুই সবার কাছে ভালো হয়ে থাকার জন্য যত যা পারিস কর। তবে এরপর থেকে নিজের সমস্যাটা অন্যের ঘাড়ে না চাপিয়ে, নিজের "ভালোত্ব" দিয়েই সমাধান করবি। আপাতত, তোর এই "ভালোত্ব"কে এই দু'পিস মাংসের সাথে মেখে ভালোভাবে খা।

উপহার

–মা,বিয়েবাড়ি যাবে না? দেখবে চলো সুচন্দ্রাকে কী মিষ্টি দেখাচ্ছে,সাক্ষাৎ মা লক্ষ্মী!

–লজ্জা করেনা? ধিংড়ি মেয়ে, ঢ্যাং ঢ্যাং করে আমাকে না জানিয়ে ওবাড়ি চলে গেলি? বাপটা বিছানায়, আর উনি বিয়েবাড়ির গল্প শোনাচ্ছেন! ওবাড়ি যে যাবি, কী হাতে করে যাবি একবার ভেবে দেখেছিস? সবই তো আমার চিন্তা!

–সুচন্দ্রার মা তো তোমাকে বলল, "বেণু তুই কোনো উপহার নিয়ে আসবি না,শুধু মিতুকে নিয়ে চলে আসিস। "সাথে আবার বাবার জন্য খাবার নিয়ে আসতেও বলেছে।

–ওটা করুণা করে বলা।বিয়েবাড়িতে কাউকে খালি হাতে আসতে দেখলি কি?

–না...সুচন্দ্রার সেই কলকাতার বন্ধুটা ওর পাশে বসে কে কী দিচ্ছে সেটা লিখছে দেখলাম।

–যা..রেডি হয়ে নে।

–থাক মা। ভিড় বাড়িতে আমাকে কেউ দেখেনি। আমরা বরং না যায়।

–বেশি পাকামো করতে হবেনা,যা বলছি তাই কর। মা–মেয়ে রেডি হয়ে

–দেখি মা, কী গিফট ম্যানেজ করলে।মায়ের হাত থেকে নিয়ে প্যাকেটটা খুলে দেখে মিতু বলে, মা! এই শাড়িটা তুমি সুচন্দ্রাকে দিয়ে দেবে! তোমার এতো প্রিয় শাড়ি! ভালোদিনে পরবে বলে একদিনও পরোনি! অন্যকিছু দাও, এইটা না।

–অন্য সব শাড়ির ভাঁজ ভাঙা। চল, দেরি হয়ে যাচ্ছে। না,বিয়েবাড়িতে ওদের আর গিফট নিয়ে অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয়নি। ওদের গিফটটা সুচন্দ্রা নিজ হাতেই হাসি মুখে নিয়েছে।

কিছুদিন পর সুচন্দ্রা ওর বরকে নিয়ে মিতুদের বাড়ি বেড়াতে এলে ফিরে যাওয়ার সময় একটি প্যাকেট বেণু কাকিমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে গেল।

বেণু প্যাকেটটি খুলে দেখে সেই শাড়িটা! সাথে একটা চিরকুট, তাতে লেখা–" কাকাবাবু যেদিন তোমার জন্য এই শাড়িটা আনে সেদিন মিতুর সাথে আমিও এবাড়ির উঠোনে খেলছিলাম।তোমার সেদিনের হাসি মুখটা আমি এখনো স্পষ্ট দেখতে পাই।তাই এই শাড়িটা আমাকে দিয়ে আমাকে তুমি এতোটা স্বার্থপর করে দিওনা। শাড়িটা আবার তুমি গ্রহণ করো, তোমার সেই পুরোনো হাসিটা ফিরিয়ে আনো। এটাই হবে আমার জন্য তোমার দেওয়া সেরা উপহার। আর শোনো, তোমার হাতের নারকেল নাড়ু আর আমের আচার দিও তো"

বেণু হাসি মুখে মিতুকে ডাকে,–"নারকেলগুলো কুরবি আয়,গরম পাকে আমার সাথে হাতে হাতে নাড়ুগুলো করে নিবি।"

চুরি

বল্টু এককালের জাত চোর।কিন্তু বিয়ের পরে বৌয়ের দিব্যির অত্যাচারে সে কাজে জং ধরেছে আজ বহুবছর। গতকাল বউ বাপের বাড়ি যাওয়ায় আজকের রাতটা বল্টুকে চুরির নেশায় পেয়েছে। না, কারো ক্ষতি করে দামি কিছু সে চুরি করবেনা, এতোগুলো দিব্যি লেগে বউটার কোনো ক্ষতি হোক তা সে চায়না। ওই এতোদিন পরে একটু কাজটা ঝালিয়ে নেওয়া আরকি। নারকেল গাছ বেয়ে দ্বিতল বাড়ির ছাদে উঠে সিঁড়িঘরের দরজা খোলা দেখে বল্টু ভীষণ অখুশি হয়। পৃথিবী থেকে কী চুরির ভয়-ডর সব উঠে গেল! মানুষ এতো কেয়ারলেস! যাইহোক,সিঁড়ি বেয়ে নেমে বল্টু সোজা রান্না ঘরে ঢুকে দেখে কড়াই এ খাসির মাংস। আহ.. কতদিন খাসি খাওয়া হয়না! কড়াইটা গরম করতে গ্যাসে বসিয়ে ফ্রিজটা খোলে; কোল্ডড্রিংস আর মাংস... একদম জমে যাবে। ইতিমধ্যে পাশেই একটা ঘর খোলা দেখে বল্টু ঢুকে পড়ে, সামনেই একটা মোবাইল পেয়ে যায়। না, মোবাইল সে চুরি করবেনা। শুধু আরাম করে গান শুনতে শুনতে মাংস খাবে। খাওয়া শেষেই ফেরত দিয়ে দেবে।

এ কী... কখন সকাল হলো!? সিঁড়ি ঘরের কোণা থেকে বল্টু নিজেকে আবিষ্কার করেই একটি কাককন্ঠী মহিলার কথা শুনতে পায় –" দিদি গো, সর্বনাশ হয়ে গেছে। তিনটে আইফোন, নগদ চল্লিশ হাজার টাকা সব চুরি হয়ে গেছে।" কিছুক্ষন পজ.. আবার শুরু.. "না-না, সোনাদানা সব আমি ব্যাঙ্কে রাখি,ভাগ্যিস রেখেছিলাম।"

এতো অপমান সইতে না পেরে বল্টু বেরিয়ে এসে মহিলাকে একনাগাড়ে বলে– "মানছি ভুল করেছি বউয়ের কথা না শুনে চুরি করতে এসে,তাই বলে এতো বড়ো অপবাদ? আমি শুধু মাত্র একটা ফোন উঠিয়েছি তাও গান শুনে ফেরত দিয়ে দিতাম।কখন যে চোখটা এঁটে এসেছে টেরই পায়নি।আপনাদের ফ্রিজে কোল্ডড্রিংসের বোতলে রাম-টাম মেশানো ছিলো বোধহয়। সবই দুনম্বরী!"

–তোমার সাহসতো কম না। বাবু,বাবুর বাবা... তাড়াতাড়ি এদিকে এসো,দেখো চোর এসেছে... পুলিশকে খবর দাও.. বলো, চার ভরি সোনা, ৫০ হাজার টাকা, তিনটে আইফোন চুরি করা চোর ধরা পড়েছে।

–আপনিতো দেখছি আমারই মা।

–মানে?

–চোরের মায়ের বড়ো গলা।শোনেন নি? আমার চুরিটা চুরি, আর আপনাদের চুরিটা ধরার কেউ নেই..."সত্যি"কে কেউ এভাবে চুরি করে! না-না, আপনারা চোর নন, ডাকাত!

–বাবুর বাবা, এক্ষুনি পুলিশ ডাকো।

–পুলিশ আসার আগে আপনাদের আইফোন থেকে একটা ফোন করে নিই দাঁড়ান–"হ্যাঁ বউ, রাগ করো না, আমি শুধু মাংস চুরি করে খেয়েছি। আর কিচ্ছু চুরি করিনি। তোমার দিব্যি।"

চমক

–আরে প্রদীপবাবু যে, এবছর অফিসের ম্যাগাজিনে আপনার লেখা পাচ্ছি তো?

–দেখি,আজকাল সময়ের বড্ড অভাব।

–আরে তা বললে হবে কীভাবে!ফেসবুকে চার -পাঁচ লাইনেই আপনি লাইকের বন্যা ডেকে আনেন। আর এ তো বাৎসরিক ম্যাগাজিন। আপনি মশায় জম্পেশ করে একটা ছোটগল্প লিখুন।

–(হেসে) বেশ-বেশ।

বাড়ি এসে প্রদীপবাবু ঘরের জানালা দরজা বন্ধ করে লেখার জন্য আলাদা একটা পৃথিবী তৈরি করে খাতা-পেন নিয়ে বসে পড়ল।ইতিমধ্যেই অফিসের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে প্রদীপবাবুর লেখা চেয়ে বেশ কয়েকজন নক করেছে।এতোজনের আশাকে নিরাশ করা যাবেনা,এমন একটা লেখা লিখতে হবে যা পড়ে সবাই যেন চমকে যায়!

প্রদীপবাবু গভীর মনোযোগ দিয়ে ভাবতে থাকে–"কী নিয়ে ছোটগল্প লেখা যায়!"

–উহুহ... গল্প লেখা ভীষণ টাফ।তার চেয়ে বরং কিছু ভারী শব্দ জুড়ে দিয়ে একটা গুরুগম্ভীর কবিতা লেখা যাক। প্রদীপবাবু লিখছেন–

"ভোরের ভেলায় অতন্দ্রিলা দিচ্ছে দেখো উঁকি..
শুকতারাটা বলছে হেসে, আমায় দিলে ফাঁকি।"

এগোচ্ছে..কবিতা এগোচ্ছে.. প্রদীপবাবু প্রচন্ড এক্সসাইটেট...ফাঁকির সাথে মিলিয়ে কোন বাক্য লেখা যায় ....ফাঁকি-রাখি-সাথী... গুড, এভাবে কবিতা প্রায় দশ লাইন নামানো গেছে।প্রদীপবাবুর চোখে মুখে আনন্দের ঝলকানি... এই ভারী কবিতা (আসলে ওটা অর্থহীন কিছু শব্দের সমাহার) কেউ না বুঝলেও বাহবা ঠিকই দেবে। প্রদীপবাবুর ওই বাহবাটুকুই দরকার, তবে হাবে ভাবে উনি নিজেকে লেখক/কবি প্রমাণের কোনো ত্রুটি রাখেন না। কিন্তু এ কী... দরজায় কে কড়া নাড়ে?দরজাটা খুলে দিয়ে–কী.. হলোটা কী.. দেখছোনা আমি একটা কাজে বিজি আছি ?

–তোমাকে ফেরার পথে মিনির জ্বরের ঔষুধ আনতে বলেছিলাম আনোনি।আবার এসে থেকে মেয়েটার একটা খোঁজও নাওনি।মেয়েটা ১০২° জ্বরের ঘোরে "বাবা" "বাবা" করছে।আর তার বাবা এদিকে–তুমি যাও, আমি কিছুক্ষণ পরেই আসছি–(রেগে গিয়ে) সরো দেখি ,কী নিয়ে এতো ব্যস্ত তুমি(প্রদীপবাবুর স্ত্রী হনহন করে গিয়ে লেখার খাতাটা হাতে তুলে নিয়ে বলে) এই তোমার ইমপর্টেন্ট কাজ?? কী এসব ছাইপাশ লিখেছো??

–আহা.. লেখার তুমি কী বুঝবে! রাখো ওটা,চলো মিনির কাছে।

–হ্যাঁ,যাচ্ছি। তার আগে তোমার ইম্পর্টেন্ট কাজটা শেষ করে দিই (বলেই লেখার পাতাটা ছিঁড়ে কুচি-কুচি করে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিলো)

–এ কী.. কী করলে তুমি?? জানো কতো কষ্ট করে কবিতাটা মিলিয়েছিলাম! আমার সব খাটুনি বেকার করে দিলে। আমারতো মনেও নেই পরপর কী কী লাইন লিখলাম।

কিছু উপায় না পেয়ে প্রদীপবাবু অফিসের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ম্যাসেজ করল,–"আমার মেয়ের ১০২°জ্বর, ওকে নিয়ে ব্যস্ত থাকায় অফিসের ম্যাগাজিনে আমি কোনো লেখা দিতে পারলাম না। আমাকে ক্ষমা করবেন।"

ত্রিশুল

–কী রে তিন্নি,কী করছিস?
–এইতো দাদা,কখন এলে? এসো, বসো।
–হলো কিছুক্ষণ; তা কী লিখছিস?
–(খাতাটা বন্ধ করে দিয়ে) কিছু না দাদা।
–উহুহ, দেখি খাতাটা... বয়ফ্রেন্ড? চিঠি-ফিটি লিখছিস নাকি?
–কী যে বলোনা তুমি! ঐ একটা গল্প লিখছিলাম।
–গল্প? পড়াশোনা বাদ দিয়ে গল্প লিখছিস? ওসব গল্প-টল্প পরে অনেক লেখা হবে,এখন শুধু মন দিয়ে পড়াশোনা কর।
–গত ছয়মাস আমি একটা পত্রিকায় লিখছি।
–তাই! তা কী পত্রিকা? টাকা পয়সা কিছু দেয় নাকি?
–"ত্রিশুল"
–নাম শুনিনিতো। তা তোর লেখার শখ থাকলে "দেশ" এ লেখ। তবে হ্যাঁ, "দেশ" কিন্তু যা তা লেখা ছাপায় না, লেখার কোয়ালিটি থাকা চায়। এখনকার এসব সস্তা ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা পত্রিকা নিয়ে এতো মেতে যাস না। দেখি, তোদের একটা পত্রিকা–আচ্ছা, নিয়ে যাও। পড়ার পর রিভিউ দাও, লেখার সমালোচনা করো, তারপর পত্রিকার কোয়ালিটি কোন গ্রেডের জানিও।
–মূল্য কুড়ি টাকা? একদম খুচরো নেই রে।
–কোনো অসুবিধে নেই দাদা। তুমি আগে পত্রিকাটি পড়ো, তারপর সমালোচনা করো। বেশ কিছুদিন দাদার কোনো সাড়া না পেয়ে তিন্নি ফোন করল–হ্যালো, দাদা.. পত্রিকাটা পড়েছ? তোমার না রিভিউ দেওয়ার কথা?
–একদম সময় পায়নি রে।তবে একদিন নিয়ে বসেছিলাম,যেসব কঠিন- কঠিন ভাষা! এক পৃষ্ঠাও পড়তে পারিনি। তোদের সম্পাদককে বলিস,সহজ ভাষায় লেখা প্রকাশ করতে, নাহলে মার্কেট পাবেনা।
–দাদা,সামনে দিন বাড়ি এলে পত্রিকার টাকাটা নিয়ে এসো। আর এ তো সহজপাঠের কথা, মূল্য সচেতন মানুষের কাছে পৃথিবীর কোনো বিষয়ই জটিল নয়।

ভাতের জাত

–তোমার নাম কী?

–শিউলি,তোমার?

–তৃষা সাহা। এই মেসে কতদিন আছো?

–এইতো গত পরশুদিন এসেছি। তোমাদের গতকাল দেখলাম।

–তুমি বাঙালী? টাইটেল কী? কোন ক্লাস?

–হ্যাঁ বাঙালী, শিউলি খাতুন, ফাস্ট ইয়ার। তোমার?

–আমি, অনিন্দিতা মানে যাকে তুমি দেখেছো বলছো, আমরা দুজনেই ফাস্ট ইয়ার। ভালোই হলো, আমাদের তিনজনের একসাথে কলেজ যাওয়া আসা হবে। আচ্ছা,তুমি সিওর বাঙালী? আমি জানি "খাতুনরা" মুসলিম হয়।

–হ্যাঁ,খাতুনরা মুসলিমই হয়।তবে বাংলায় বসবাসকারী হিন্দু-মুসলিম সকলেই বাঙালী।

–এ বাবা! আমি জানতাম না গো,তুমি কিছু মনে করোনা।

–(হালকা হেসে) না-না। দু'দিন পর থেকেই তো ক্লাস স্টার্ট।

–হ্যাঁ, একসাথে যাব কিন্তু। দুদিন পর কলেজ বেরোবার আগে

অনিন্দিতা–মাসি রান্না করতে এলো না,কলেজের প্রথম দিনই না খেয়ে যেতে হবে!

তৃষা– মাসিটা নিশ্চয় এতোগুলো মেয়ের রান্নার টাইম মেইনটেন করতে পারেনা।

অনিন্দিতা– বাদ দে,সব ফাঁকিবাজি।

শিউলি– আমি ভাত করেছি,সবার হয়ে যাবে। তৃষা– এ মা,না-না।তোমার ভাতে কম পড়বে। শিউলি–কম হবে না,ফিরে এসে খাওয়ার জন্য বেশি করেই ভাত বসিয়েছিলাম।

অনিন্দিতা– না-না,আজ আমার নিরামিষ, পেঁয়াজ খাওয়া যাবে না।

শিউলি– আলুসেদ্ধ মাখিনি এখনো,পেঁয়াজ ছাড়া মেখে দিচ্ছি।

অনিন্দিতা–না থাক। আমরা খাব না। মাসি নিশ্চয় এসে যাবে।

কলেজ থেকে ফেরার পথে অনিন্দিতা খাবার নিতে একটি "আদর্শ হিন্দু হোটেল" এ ঢুকলে ; হোটেলের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা তৃষাকে শিউলি জিজ্ঞেস করে,

–তুমি খাবার নেবে না?

–না, মেসে ফিরে তোমার থেকে খাবো।

–(আনন্দিত হয়ে) সত্যি খাবে?

–হ্যাঁ। আসলে তুমি যেভাবে গুছিয়ে রান্না করো, দেখেই খেতে ইচ্ছে হয়।

–কিন্তু আমি অতো ভালো রান্না জানিনা। কলকাতা এসেই রান্নায় হাতেখড়ি।

–জানো, আমি ভাবতাম মুসলিমরা অন্যরকম হয়,সবসময় ঘোমটাই থাকা,কারো সাথে কথা না বলা।

–তাহলে তোমার ধারণা ভুল প্রমাণ হয়েছে বলছো?

–(হেসে) হ্যাঁ,একদম ভুল।

মেসে ফিরে তৃষা-শিউলি খেতে বসে অনিন্দিতার গলা শুনতে পেল– "মা তুমি কালই এসে মাসি চেঞ্জ করে দিয়ে যাবে। খিদেয় পেটে ইঁদুর লাফাচ্ছে, হোটেলের খাবারও মুখে তোলা যাচ্ছে না"

তৃষা অনিন্দিতাকে হাঁক দিয়ে বলল,–

–আয়,আমাদের সাথে একটু খেয়ে নে।

–না রে, তোরাই খা। আজ আমার নিরামিষ।

আসল রূপ

—রুমকী, আর দশ মিনিট পর কোচিং সেন্টারের ঘরগুলোর ফ্যান-লাইট অফ করে সপগুলো গুটিয়ে বন্ধ করে দিস। আর শোন, পারলে ঘরগুলো একটু মুছে দিস।

—হ্যাঁ স্যার যাচ্ছি। সেতো আমি রোজ ভোরবেলা ঘরগুলো মুছে দিয়ে আসি।

—সে তুই রোজ ঘরগুলো মুছিস বলেই না বছর ঘুরতে না ঘুরতে খসখসে সিমেন্টের মেঝে অমন মসৃণ চকচকে হয়ে উঠেছে! তুই দেখিস, মা সরস্বতী তোকে কখনও অসন্তুষ্ট করবেন না। দেরি হয়ে যাচ্ছে, চলিরে। রুমকী বাঁশের খুঁটিটায় হাত রেখে রাস্তার ওপারে দোতলা কোচিং সেন্টারটির দিকে চেয়ে রইল এবং লজ্জিত হলো এই ভেবে যে সেই ক্লাস নাইন থেকে ইলেভেনে উঠে গেলেও স্যারের কোচিং-এ পড়ার ইচ্ছের কথা সে আজও মুখ ফুটে বলতে পারলো না। পাশের টালির ঘরটা থেকে রুমকীর মা বেরিয়ে এসে বলল,

—রোজ দুবেলা বেগার খেটে কী পাস তুই? শুধু শুধু ওখানে কেন যাস? গেলো পূজোতে ঐ মাস্টারেরা তোকে দুটো মিষ্টিও দেয়নি! দিয়েছে কি?

—আহ,মা! দেখলে স্যার বললেন, মা সরস্বতী আমার উপর তুষ্ট থাকবেন।

—ঐ কোচিং সেন্টার মা সরস্বতীর মন্দিরই যদি হয় তাহলে ওখানে ভর্তি হতে ওরা গরিব ছেলেপিলের থেকেও অতো টাকা নেয় কেন? আর তোকেই বা ওখানে পড়তে ডাকেনা কেন?

—(এ ব্যাপারে স্যারের সাথে আদৌ কোনো কথা না হলেও) রুমকী মাকে বলল, স্যার সামনে সপ্তাহে পড়তে ডেকেছেন। কিছুদিন পর রুমকীর মা স্যারকে বলল—

—সার, রুমকী এখানে পড়তে আসবে বলছিলো।

—এখানকার স্টুডেন্টদের ক্যোয়ালিটি A ক্লাস,রুমকী পারবে? ঠিক আছে, ভর্তির টাকাটা দিয়ে কাল পাঠিয়ে দিবেন।

—সার আপনি তো জানেন আমাদের চলে কীভাবে....

—বুঝতে পারছি। কিন্তু কিছু করার নেই, ভর্তির টাকাতে ছাড় দেওয়ার উপায় নেই।

পরেরদিন—

—রুমকী...ঘরগুলোতে পা দেওয়া যাচ্ছেনা, কিচকিচ করছে। যা তাড়াতাড়ি মুছে দিয়ে আয়।

—স্যার, মা সরস্বতী আমার উপর তুষ্ট। তাই মা আমার চোখ খুলে দিয়েছেন।

—মানে?

—রোজ দুবেলা কোচিং-এর ঘরগুলো পরিষ্কার করার জন্য মাসের শেষে আমার কত টাকা প্রাপ্য তা বলে দিলে ভালো হতো।

—ও...কোচিং-এ ভর্তি হতে ফি চাওয়ায় তোদের আসল রূপ বেরিয়ে এসেছে!

—না স্যার, কাজের মূল্য চাওয়াতে কোনো অপরাধ নেই। বরং মূল্য যারা আড়াল করে তাদের আসল রূপটাই জঘন্য।

হয়রান

–সুমন,TIC তোকে ক্যাল ইস্কুলে টাকা লিতে ডেক্যাছে।

–স্কুলে যেতে হবে কেন? এতোদিনতো অ্যাকাউন্টেই টাকা এসেছে।

–কী জানি বাপ! এতোদিন ঐ ইস্কুলে আমি মেম্বার আছি, এই নতুন TIC র মতো বজ্জাত আমি দুটা দেখিনি। তুই বাপ চিন্তা করিসন্যা, তোখে টাকা-পয়সা যেনে ঠিকঠাক দেয় তা আমি আলাদা কর্যা বুল্যাছি।

–সে ঠিকই আছে। কাজ করছি, তার মূল্য আমার প্রাপ্য, এতে আলাদা করে বলার কিছু আছে কি?

–এখন তো পনেরোদিন থেক্যা ইস্কুল বন্ধ, সামনে আরো কতদিন বন্ধ থ্যাকবে তা বোলা যাছে না। ঐ শালা TIC হাবে ভাবে যা বুঝালো তাতে সামনে মাস থেক্যা তোধেরকে আর টাকা পয়সা দিবে না।

–টাকা তো সে নিজের পকেট থেকে দিচ্ছে না। আর চুক্তিপত্র অনুযায়ী এখনো ছয়মাস ঐ স্কুলে আমরা আছি। ও আমাদের টাকা না দেওয়ার কে? কাজ করেছি, টাকা পাবোনা?

–সেতো গত দুইমাসের বেতন লিতে ক্যাল ড্যাকলো। সামনের মাসগুলোতে বোধায় আর...

–আচ্ছা ঠিক আছে কাকা, কাল স্কুলে গিয়ে আমি কথা বলে আসব। বাড়ির দিকে চলেন, চা খেয়ে যাবেন।

পরেরদিন সুমন এবং আরো দুজন TIC র ঘরে উপস্থিত হলো। TIC কিছুক্ষণ ব্যস্ত মুখের ভাব নিয়ে কাগজে কী সব হিসেব কষে সুমনদের দিকে মুখ তুলে বলল–

এই যে, তোমাদের দুইমাসের টাকা, দিতে দেরিই হয়ে গেল।

একজন টিচার বলল–

–টাকাটা অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করে দিলে এই 'করোনা'-র সময় আপনাকে আর কষ্ট করে স্কুলে আসতে হতো না।

না, না, কষ্ট কীসের। (হাত বাড়িয়ে দিয়ে) নাও, টাকাটা নাও। ঠিকঠাক আছে কিনা গুণে নাও। আমার একটু তাড়া আছে, বেরোতে হবে (TIC চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন)।

সুমন হেসে বলল–

–দীর্ঘ দুমাসের টাকা গুণতে একটু সময়তো লাগবেই। স্যার, একটু বসুন।

–(TIC র মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল) হতভম্ব হয়ে তিনি চেয়ারে বসে পড়লেন।

–সুমন একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ফ্যানের তলায় বসে আস্তে আস্তে দশ-বিশ পঞ্চাশের বান্ডিলের টাকাগুলো নির্বিকারে গোনা শুরু করলো।

পল্টুর জন্মদিন

রাত প্রায় এগারোটা। গলির মুখে একটি অটো থেকে পল্টুকে মা নামালো। অটোর ভাড়া মেটানোর জন্য জবা পল্টুকে কোল থেকে নামিয়ে রাস্তার এককোণে দাঁড় করালো। পল্টু চোখ রগড়াতে রগড়াতে যেন কিছুক্ষণ আগের মিনির জন্মদিনের ঝকঝকে আলো দেখতে পেল।আহ! কেকটা কী সুন্দর খেতে ছিল। খেতেই যখন দেবে তবে ঐটুকু কেন? হাতে যেন এখনও কেকের গন্ধটা লেগে আছে। পল্টু তার ছোট্ট হাতটা নাকের কাছে এনে ধরে।

–কী রে! আয়, চল, বাড়ি চল।

–(পল্টু তার মায়ের হাত ধরে হাঁটতে শুরু করল) মা...

–কী..?

–মিনির মতো আমার জন্মদিন আসে না কেন?

– আসবে।

–কই? এতোদিনে একদিনও আমি কেক কাটিনি। আমার জন্মদিন নেই?

–আছে।

–কবে?

–জ্বালাস না তো। বাড়ি চল। কাল খুব সকাল সকাল ওবাড়ি কাজে যেতে হবে। আজকের এত্তোগুলো বাসন কাল সাতটার মধ্যে মাজতে না পারলে ওদিকে মুখার্জিদের বাড়ি কাজে যেতে দেরি হয়ে যাবে। এই দুবাড়ি কাজটা আছে বলে তোদের বাপ-ছেলের মুখে দুটো ভাত তুলে দিতে পারছি।

–পল্টু কোনো উত্তর দিল না। বাধ্য ছেলের মতো মায়ের হাতটা ধরে বাড়ির দিকে হেঁটে চলল।

পরেরদিন সকালবেলা মিনিদের বাড়ি গিয়ে জবা জানতে পারলো, দাদাবাবুর অফিস এখন করোনার জন্য টানা একমাস ছুটি।তাই ওরা গ্রামের বাড়ি যাচ্ছে।অর্থাৎ অনির্দিষ্টকালের জন্য জবার কাজ বন্ধ! পল্টুর বাবার ওষুধ কী দিয়ে কিনবে জবা? জবা মিনির বাবার কাছে গিয়ে বলল–

–দাদাবাবু, মাইনেটা...

–হ্যাঁ, টেবিলের উপর রাখা আছে নিয়ে নিও।আর শোনো,ফ্রিজে যা খাবার আছে ওগুলো তুমি বাড়ি নিয়ে যেও। আমরা আজই বেরিয়ে পড়বো।

–আচ্ছা।

ফ্রিজে গতকালের কয়েকটুকরো কেক রাখা ছিলো। জবা সেটা নিয়ে দ্রুত বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলো।

–পল্টু..দেখ কী এনেছি!

–কেক! (পল্টু দৌড়ে গিয়ে একটি থালা নিয়ে এলো।)

–কী খুশি তো?

–হ্যাঁ।

–মা,আজ আমার জন্মদিন?

–হ্যাঁ, আজই তোর জন্মদিন।

–মোমবাতি কই?

–মোমবাতি নিভিয়ে কী হবে পাগল! তুই তো নিজেই আলো এনে ভোরে জন্মেছিলি।

–(পল্টু একমুখ হাসি নিয়ে) তাই?

জবা হ্যাঁ সূচক মাথা নেড়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে ভাবলো পার্থক্য একটাই এখন গরমকাল আর তখন ছিলো কনকনে শীত।

ইকবাল হোসেন এর গল্প

কুকুর

এই শহরের তিপান্নটা পথ কুকুর, সব গুলোই পঙ্গু, তাদের বাচিঁয়ে রেখেছে বয়স ৩২ এর মহারাণী, শহরে তার এ তিপান্নটা প্রাণী ভিন্ন কেউ নেই।

"..মহা শনিবার আসছি, বাড়ির আশেপাশেও যেন আমি কোন একটা কুকুর না দেখি"..পিসতুতো দাদার চিঠিটা পড়তে পড়তে জানালা দিয়ে তাকিয়ে রাস্তার ওপারে জানোয়ার তিনটাকে দেখতে পেল।

মহার বাড়ির সামনেটা ফাঁকা, টার্নিং এ একটা বিশাল বটগাছ। সন্ধ্যার পর এদিকে কেউ তেমন আসেনা। এখন রোজ আসে, তিন জন। মদ খায়, আর মহাকে ছিড়ে খেতে চায়। আশেপাশের বাড়ির সাহেব বাবুরা সব দেখেও দেখেনা।

পরের দিন শুক্রবার। কুকুর আর নিজের জন্য বাজার নিয়ে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

মহাকে যেতে দেখে একজন বলল, " দে না আর কত পঙ্গু কুকুর কে আদর করে খাওয়াবি! আমাদের একটু আদর করে খাওয়া না..হে হে।"

দৌড়ে দরজা বন্ধ করে, লজ্জায়, ঘৃণায়, ভয়ে কাঁপতে থাকে,হায়েনার মুখ ফিরতি হরিণীর মতো।

যেদিন সে সোশ্যালমিডিয়ায় সাহায্য চাইল, ওই নিরিহ কুকুরগুলোর জন্যে, সেদিন থেকেই প্রতিবেশী মহিলার কাছে তা আদিখ্যেতা, আর পুরুষদের কাছে স্পর্ধা হয়ে দেখা দিল।

কুকুর মারা লোহারামকে মহা চিঠি করতে ভরসা পায়নি, তবু দুঃসম্পর্কের পিসির ছেলে, সে ছাড়া তার কেই বা আছে। বাবার সাথে মহা ক্লাস নাইনে গ্রীষ্মের ছুটিতে একবার গেছিল তাদের বাড়ি।

তখনই সে জানতে পারে লোহারামের কুকুর ঘৃণার ব্যাপারে। কত সে খ্যাপা কুকুর নিধন করেছে তার কোনো হিসেব ছিলোনা। সকলে তাকে কুকুর মারা লোহারাম বলে একডাকে চিনত।

শনিবার দুপুরের থেকে খামার থেকে তিনটি কুকুর উধাও। মহা সারা বাড়ি, আশপাশ খুঁজেও আর ওদের দেখা পেলো না, নিরাশ হয়ে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরল।

মহার বাড়ির পথে লোহারাম, সবে সন্ধ্যা নেমেছে, মোড় ঘুরতেই বটগাছ থেকে মেরে ঝুলিয়ে দেওয়া তিনটে কুকুর দেখতে পেলেন । টার্নিং এর পরে গলি থেকে চাপা গলার ফুতকার আর মাতলামির সাথে কথাগুলো শুনে, গ্রিল টা খুলেই থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন লোহারাম..

একজন বলছে,.."....মরদ এনে তুলেছে, আমরা কম কিসে.." দ্বিতীয় জন বলল " হে হে আর একটা কুকুর বাড়ল",

তৃতীয় জন বলল,.. সালা আজকের মতো তিনটা তিনটা মেরে কমিয়ে দেব... হেহে হেহে"।

জীবনে এতো কুকুর মেরেছেন তবু আজ সামনের দুই পা হীন, চোখ কানা, কুকুর তিনটিকে ওভাবে গাছের ডাল থেকে ঝুলতে দেখে লোহারাম কিছুতেই মেনে নিতে পারলেন না।

রাতেই টিকিট করতে স্টেশন যাচ্ছি বলে লোহারাম বেরিয়ে গেলেন। তার বেরনোর ঘন্টা খানেকের মধ্যেই পিটা ইন্ডিয়ার লোকেরা এসে বাকি কুকুর গুলো নিয়ে গেলো।

অনেক রাতে লোহারাম বাবু ফিরলে, মহা বলল," আজ ওই জানোয়ার গুলোর আওয়াজ পাচ্ছি না জানেন?" লোহারাম বাবু বললেন আর কোনো দিনই ওরা কোন আওয়াজ করতে পারবে না।

রাত শেষ হলে, সকালে শোরগোল পড়ে গেল, সবাই দেখল মহল্লার বটগাছে তিনটা কুকুরের সাথে মাতাল তিনটাকে কে মেরে ঝুলিয়ে দিয়েছে। লোহারাম বাবুর সাথে মহা ততক্ষনে খ্যাপা মাতালদের শহর ছেড়ে অনেক দূর পেরিয়ে গেছে।

খড়কুটো, তবু...

পিপ! পিইপ! পিইইপ...

রতন ড্রাইভার গেটের কাছে গাড়িটা দাঁড় করাল।

দোতলার জানালা দিয়ে এমপি গিন্নী বললেন " টিউশন পৌঁছে দে রিয়া কে, আমি সার্দুলের গাড়িতে চলে যাব, আমার প্রোগ্রাম এর দেরি আছে।

ষোড়শি কন্যা আশেপাশেই কোথাও ছিল, অভিমানের সুরে বলল "আমি আর টিউশন যাব না মা, আগে আমাকে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। "

মা রেগেমেগে বললেন,

"আমি তোমাকে আগেই বলেছি, ঘ্যানঘ্যান কোরো নাতো এ নিয়ে? বাবা গেছেন দেশোদ্ধারে, আমি একা মরি এ সংসারে। আমারই যেন একার দায়! আমি পারব না তোমার এই ঢং এর আব্দার রাখতে।"

মেয়ের জেদ আর বদ রাগের কথা মনে পড়লে, কন্ঠ নরম করে মা ডোনা দেবী বলেন, "কাদতে বোসনা এখন আবার, আমি বলে দেব, রতন ঘুরিয়ে নিয়ে আসবে, কিন্তু দীঘা টীঘা না, আশেপাশে কোথাও যেও। এখন টিউশন যাও। "

কয়েক মাস পরের এক সন্ধ্যার ঘটনা, অমাবস্যার সন্ধ্যায় চৌধুরী বাবুর ডাক পড়ে ড্রাইভার রতনকে।

শহর থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার পশ্চিমে এই বাংলো বাড়িতে সে অনেকবার এসেছে এমপি চৌধুরী বাবুকে নিয়ে, খুব নির্জন জায়গাটা। বিশেষত বিচিত্র বয়সের মহিলা বান্ধবীদের সে দেখতে পেত এই বাংলোতে, আজ স্থূলাঙ্গী মহিলাটিও বাবুর সাথে নেই, এই বাংলোর বাইরে অপেক্ষায় কোনো দিন রাত দুপুর হয়েছে, কিন্তু ভেতরে ঢোকার ঘটনা আজই প্রথম, অন্দরমহল আলো ঝলমলে। একটু ভয় পায় রতন, সচরাচর যা ঘটে না, তাই আজ ঘটতে যাচ্ছে, তাই তার মনটা অজানা কারণে কেমন করে ওঠে। সে কী কোনো ভুল করেছে? এমপি বাবু কেন তাকে ভেতরে ডেকেছেন ভাবতে ভাবতে ঢোকে, হঠাৎ প্রশ্নে চমক ভাঙে! হাতের গেলাসের পানিয়টা গলায় ঢেলে, ভয়ংকর কড়া গলায় এমপি খেকিয়ে ওঠে " শুয়ার! কতদিন থেকে এসব চালাচ্ছিস ?" রতনের দিকে এক খানা চিঠি ছুঁড়ে দেয়।

রতন পড়তে পড়তে ঘেমে ওঠে ভয়ে আর লজ্জায়! লেখাটা এমপি কন্যা রিয়ার, তার প্রতি প্রেম নিবেদন। রতন ভয়ে অসাড় হয়ে যায়। রিয়ার হাবভাব আগে একটুও বোঝেনি এমন না, রতন পাত্তা দেয়নি।

রতন অবিবাহিত, জুলোজিতে গ্রাজুয়েট, দেখতে সুদর্শন না হলেও চোখে একটা অদ্ভুত মায়া আছে। চাকরি বাকরি না পেয়ে ড্রাইভারির কাজটা জুটিয়েছে কোনো ভাবে, আজ তার সব যেন শেষ হয়ে গেল। সে চোখে অন্ধকার দেখে। সে কী বলবে ভেবে পায় না, স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে থাকে।

তুই যা, আর শোন তোকে এখানে কেউ আসতে দেখেনি তো? কোনো মতে ঢোক গিলে কথাটা বলে, "না!"

"শোন রিয়াকে কিছু বলার দরকার নেই। সাবধানে গাড়ি নিয়ে চলে যা।

ভাগিরথীর পাশ দিয়ে চলে যাওয়া রাস্তা ধরে রতন, সামনেই শহরে ঢোকার টার্নিং, কোথা থেকে এক লরি অমাবস্যার ঘন অন্ধকার ফুড়ে এগিয়ে এসে রতনের গাড়িটাকে চিড়ে চ্যাপ্টা করে দিয়ে বেরিয়ে যায়। রতন অমাবস্যার আঁধারে হারিয়ে যায় চিরদিনের মতো।

পরের দিন সকালে দুটো মৃত্যু শহর বাসিকে বিহ্বল করে দেয়।...

রতনের বাড়ির লোকেরা খুনের একটা এফআইআর পর্যন্ত করতে পারে না। পথ-দুর্ঘটনার রেকর্ড হয়।

কিন্তু রিয়ার আত্মহত্যা এমপির জীবন এলোমেলো করে দিল। এটি তো হিসেবে ছিল না।

মাতব্বরের ধর্ম

লতিবপুর গ্রামে আশি ঘর মানুষের বাস। গ্রামের পশ্চিম দিকে ফকির চাঁদ কলেজ। এই কলেজেই আলতাফ ভর্তি হয়েছে ইংরেজি অনার্স নিয়ে। আলতাফের বাড়ি আখেরিগঞ্জ। আলতাফের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে কলেজের গেটম্যান শুকুরুদ্দিন লতিবপুর জুম্মা মসজিদে আহম্মদের থাকা খাওয়ার ব্যাবস্থা করে দেয়।

পরিবর্তে তাকে মসজিদের তিন ওয়াক্ত নামাজ পড়ানোর কাজ করতে হবে। আলতাফ রাজি হয়ে যায়। শুকুরুদ্দিন দাপুটে গাজি সাহেবের ভাইপো। একসময়ের হেডমাস্টার গাজি সাহেব ছিলেন শখ নাস্তিক। কিন্তু দেহের তেজ হারাবার সাথে সাথেই নিজেকে মসজিদের ভালো মন্দে যুক্ত করে নিলেন। এই অছিলায় পূর্বেকার শখ নাস্তিক্য গোপন করার সুযোগ পেলেন। গাজি সাহেব হজ্জ্ব করে এসেছেন। এলাকার বিশিষ্ট লোক। তার কথায় উপর লোকের মুখে কোনো কথাই জোটে না।

এদিকে মসজিদের তিন ওয়াক্ত নামাজ পড়ানো এবং কলেজে আলতাফের ইংরেজি অধ্যয়ন চলতে থাকে পুরোদমে।

একদিন গাজি সাহেবের বাড়িতে ডাক পড়লো মিতভাষী আলতাফের। বাড়ি তো নয় যেন রাজপ্রাসাদ। কিন্তু শুনসান নীরবতায় সেই প্রসাদা যেন পাতালপুরি মনে হয় আলতাফের। গাজি সাহেব সামনে উপস্থিত হলে আলতাফ সালাম দেয়। সালাম ফিরিয়ে গাজি সাহেব বলেন "শোনো আলতাফ, হিটু আমার ছোট ছেলে, এবার এইচএস দেবে, ওকে ইংরেজিটা একটু পড়াতে হবে। " আলতাফ রাজি হয়ে যায়। সাথে চিন্তা করে দেখে ভালোই হলো হাত খরচের সংস্থানটা তবে হয়ে গেল। মাসের শেষে এক শুক্রবার সকালে আলতাফ টাকার কথা বললে গাজি সাহেব খেপে উঠে বলেন," কীসের টাকা হে ছোকরা, কোথা থেকে উঠে এসে এগ্রামে থাকছো, খাচ্ছো ফ্রিতে, আবার টাকা কীসের।" আলতাফ অবাক হয়ে যায়, বলে " আপনি না হজ্জ্ব করে এসেছেন, আমার শ্রমের মূল্য বঞ্চনা কেন করছেন? এই আপনার ধর্ম? আমি আর পড়াতে পারবো না আপনার ছেলেকে।"

জুম্মার নামাজ শেষ হলে চেয়ারম্যান গাজি সাহেব সবাইকে থামতে বললেন। বললেন, "আলতাফ ইমামতির যোগ্য নয়। নতুন ইমাম কাল আসবে।" সকলের কাছে এই কথা অপ্রত্যাশিত ছিল, একজন বলল, "কেন ওর ইমামতি যোগ্য নয়, এতদিন ওর পিছেই তো নামাজ আদায় করলাম? গাজি বললেন, "তোমরা জাননা আলতাফ ফাসেক ওর দাড়ি গজায়নি। ফাসেকের পিছনে নামাজ পড়া মাকরুহে তাহরিমি, না জায়েজ।"

আলতাফ সেখানেই উপস্থিত ছিল। সবিনয়ে সকলকে সালাম দিয়ে বলল, "এই ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে যা বলেছে তার কারণ একান্তই ব্যক্তিগত প্রতিশোধ। আমি ওনার ছেলেকে পড়ানো বন্ধ করেছি, কারণ উনি তার কোনো মূল্য দেননি। উপরন্তু আমি ভিনদেশী, মসজিদের অন্ন ধ্বংস করছি ইত্যাদি বলে অপমান করেছেন। ইনি যদি দেখাতে পারেন কোন বইতে লেখা আছে দাড়ি না বেরলে নামাজ পড়ানো নাজায়েজ, তবে আমি ইনার সব কথা মেনে নেব।"

এতগুলো লোকের সামনে গাজি সাহেবের মনে হয় কে যেন তার গালে একটা সপাটে চড় কষিয়েছে। গাজি আর বিতর্কে যায় না বা প্রমাণ হাজির করেনা। কিছুদিন পর আলতাফ নিজেই মসজিদটি যাওয়া বন্ধ করে দেয়।

হাতি তাড়ুয়া

এই জেলার চিফ ফরেস্ট অফিসার বয়স আটান্নোর বনবেহারি বাবু। তার মেদ বহুল বিশাল ছয় ফুটি শরীরের উপর ছোটো একটা মাথা, আর কুঁত কুঁতে এক জোড়া চোখ। দুই ডেপুটিকে নিয়ে ইন্টারভিউ বোর্ডে বসেছেন।

কিছু না বলেই বয়েস ত্রিশের সুঠাম চেহারার যুবকটি দরজা ঠেলে ঢুকেই চেয়ারে বসে পড়লো। এক ডেপুটি বললেন, টি-শার্ট পরে এসেছেন কেন? বুকে হাতির ছবি রং তুলি দিয়ে আঁকা কেন? আপনার বাবা মা কোন ম্যানার শেখাননি? ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন, আপনার নাম কি ? কোথা থেকে আসছেন?

—লোহারাম হালুই । ঝালদা-২।

চিফ গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলন, বাড়ির কেউ কখনো ফরেস্টের কাজ করেছে?

—না স্যার।

—বাবা কি করেন?

— চুনাপাথর খনিতে কাজ করেন।

একজন ডিএফও জিজ্ঞেস করলন, বলুনতো পুরুলিয়া কোন রাজ্যের থেকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে জুড়ে গেছিলো?

—স্যার ১৯৫৬ সালে যুক্ত হওয়া বিহারের মানভুম জেলাই আজকের আমাদের পুরুলিয়া।

—আপনি জানেন আপনার কাজ কী হবে? পারবেন?

—হাতি তাড়ানো।

—আপনার আকাদেমিক ক্যুয়ালিফিকেশন?

পিএইচডি ইন ইকোনমিক্স।

লোহারাম চিফ ফরেস্ট অফিসার কে " স্যার" সম্বোধন করে বললেন,

"সুজন আপনার ছেলে, ও আমার সাথেই গ্রাজুয়েশন করেছে । শুনেছি গত বছর চিফ ফরেস্ট অফিসার হয়েছে।"

—সিএফও মুখটাকে বাঁকিয়ে বললেন অবান্তর কথা বলছো কেন? এটা ইন্টারভিউ বোর্ড। কোনো লাভ নেই ওসব কথা বলে। হাতির ছবি বুকে একে নিয়ে এসেছো কেন ?

—স্যার, যেদিন ভাবলাম হাতি তাড়ানোর কাজ করব, সেদিন থেকেই শুধু হাতির স্বপ্ন দেখি, মানুষের মাঝেও হাতি দেখি, যেমন আমার নরহরি কাকার পেটটা হাতির পেট, স্যার কিছু না মনে করলে বলি?

—বলুন

-আপনার চেহারাতেও সামান্য হাতি আছে, স্বভাবেও। আপনার চোখ গুলোও ঠিক যেন হাতির মতো কুঁত কুঁতে। সুজন কীভাবে চাকরি পেয়েছে, মানে স্যার আমরা বন্ধুদের সবাই সেই খবর জানি।

—বেরিয়ে যাও, বেয়াদব ছেলে, জানো কত আবেদন এসেছে? ২০ লাখ। দুহাজার ছেলে ঠিক খুঁজে নেবো। বেরোও।

—উঠে দাঁড়িয়ে লোহারাম বলে, আমাকে আপনি কাজ দেবার যোগ্য নন! Dirty corrupt bureaucrat! চাকরি দেবার নামে জুয়াচুরি করছেন। আমার পি. এইচ. ডি এই হিসেব নিয়েই। আমি আপনাকে দেখিয়ে দিতে পারি, দেখানোর জন্যই এসেছি, এই পাঁচ লাখ ছেলের আবেদন প্রসেসিং খরচ যা তাতে ২ হাজার ছেলেকে সরকার এক বছর নয়, দশ বছর দশ হাজারি বেতন দিয়ে রাখতে পারে।

—চিফ ফরেস্টঅফিসার খেঁকিয়ে উঠে বললেন, জানো তোমাকে এখনই পুলিশে দিতে পারি?

লোহারাম বজ্রকন্ঠে বলল, আপনাদের চাকরি নামক প্রহসনের জবাব দিতেই আমি এসেছি। বন্ধ করুন এ প্রহসন!

হাতি মার্কা টি- শার্ট টা খুলে চিফের টেবিলটার উপর ছুড়ে দিয়ে লোহারাম বলল, মাস্টার্স ফেল করা আপনার ছেলে সুজনকে শার্টটি দিয়ে বলবেন বন্ধু লোহারাম পাঠিয়েছে। দড়াম করে গেট খুলে লোহারাম বেরিয়ে যায়। চিফসহ বাকি অফিসাররা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

সুকৃতি এর গল্প

দাম

সকালবেলা আনোয়ার গাঁয়ে যাবার আগেই রুহুমাকে বলে দিয়েছিল, আড়তদার পাট নিতে আসতে পারে। কিছুক্ষণ পরেই বাইরে থেকে আডতদারের হাঁক – কই গো বিটি, আমার ব্যাটাডা কই?

– মামা, ও সকাল সকাল বেরিয়েছি, যা রোদের ঝালাস, বেলা হলে, আর পারেনা।

– ঠিকই তো, ঠিকই তো।

– বসেন। (চেয়ার এগিয়ে দেয় রুহুমা)

– দুটো ব্যাটার দুটোই বাহিরে খাটছে, এহন একটু বসে টসে জিরোও বাছা।

– ব্যাটারা হাজার বলুক ঘরে মেয়ে আছে, বসে থাকলে চলে না বসে থেকে শান্তি পাওয়া যায়?

আঁচল দিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে রুহুমা রান্নাঘরের দিকে যায়। সদর দরজা দিয়ে ঝিরঝির করে হাওয়া আসছে। দড়িতে টাঙানো জামাকাপড় দোল খাচ্ছে। রুহুমার চিন্তা- মেয়ের রঙ কালো, বিয়ে কী করে হবে। এই একটি ব্যথা অনবরত ঘাম হয়ে ঝরেও শেষ হয়না।

সে চা বিস্কুট ডিম নিয়ে উপস্থিত হয়। মামা, চা-টা খান, ঠান্ডা হয়ে যাবে। লম্বা বারান্দায় রাখা প্রায় পঁচিশ টন পাট। খুব গভীর ভাবে আড়তদার পাটের গায়ের তন্তু নিরীক্ষণ করে, সে পাটের রং দেখে চমৎকৃত হয়, লোভে চোখ চকচক করে, রুহুমার কথা তার কানে পৌঁছয় না।

– কী এত ভাবছেন! মাসখানেক হল, পাট কিনেছেন, এবার নিয়ে যান, খুব সমস্যা মামা। দেখতেই পাচ্ছেন, সব ঐ কলাই মুগ মুসুরের বস্তা মাটির মেঝেয়, ইঁদুরের বড্ড জ্বালাতন। এই পাকা মেঝেটা না হলে আর হচ্ছে না।

– লিয়্যা তো যাব মা, দাম যা করা ছিল আনোয়ারের সাথে সে দাম তো এখন নাই বাজারে, ঠগা হয়্যা যাচ্ছে গো।

– আপনার ব্যাটা বলছিলো, আমারো সেই কথা- আপনি আমাদের কাছের মানুষ, কতদিনের চলাফেরা। বেচেছিলাম ২০ টাকা দরে, বাজারে এখন ১৮ টাকা। ১৯ টাকা দরে লেন, দুজনেরি লাভ-ক্ষতিতে বিষয়টা মিটে যায়, ...মাসখানেকের মধ্যে দু-তিনবার মত দাম ওঠানামা করেছে, তা তখন যখন নিয়ে গেলেন না, এখনকার দাম হিসেব করার কথাটা কি উচিৎ হবে?

– তাতো বলিনি মা, তাতো বলিনি, দেখছি, তাড়াতাড়িই লোক পাঠাচ্ছি। এই পাটটা হাত ছাড়া করা যাবেনা; ভাবতে ভাবতে চলে যায়।

এরপর আরও দুদিন কেটে যায়। আড়তদারের কোন পাত্তা নেই, ফোনও লাগেনা। সত্য সত্যই বাজারে পাটের দাম পড়েছে, অনেক চাষীরই অবস্থা খুব করুণ, ভাগ্যের দড়িতে ঝোলাঝুলি করছে। একই পাট একই সময়ে ওঠে, একবার দাম কমে, আরেকবার বাড়ে। কী করে হয়, রুহুমা ভাবে কিন্তু কোনও কিনারা পায়না।

আরও দুদিন পরে আড়তদারের সাথে মাছের বাজারে হঠাৎ আনোয়ারের দেখা । আনোয়ার প্রফুল্ল চিত্তে বলে ওঠে – আরে মামা, পাটের কী করবেন, বলেন।

– বাছা, খুব তাড়া আছে, বাড়িতে নতুন জামাই, মাছ নিয়ে এক্ষুণি যেতে হবে, পরে কথা হবে। এই বলে আড়তদার চরম ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আড়তদারের ভাবভঙ্গি আনোয়ারের কাছে কেমন লুকোনো গোছের মনে হয়।

পরের দিন বাজারে পাটের দাম উঠেছে ২২ টাকা। সকাল সকাল আনোয়ার রুহুমাকে খবরটা না দিয়ে পারেনি। হঠাৎ আড়তদারের ফোন আসে।

– হ্যাঁ, মা রুহুমা বলছো তো?

– হ্যাঁ বলেন, মামা।

– গলা যে ভারী ভারী, শরীল খারাপ না কিগো বিটি?

– না তো, কাজের কথা বলেন। চুলোয় ভাত চাপানো আছে, মাড় বসে যাবে।

– তাহলে তোমার ঐ কথায় থাকছে, পাটের লরি

পাঠাচ্ছি।

—আপনাকে তো মামা, পাট দিবনা।

—কেন্যা? দুসপ্তাহ থ্যাকা কথা আছে, একবারও তো বুলনি?

—আচ্ছা আপনি দাম কত দেবেন?

—২১ টাকা।

—কেন? (রুহুমা হাসে)।

—পাটের দাম উঠ্যাছে। ২০ টাকা দরদাম করা ছিল। এখন দুপক্ষ একটু লাইন থাক্যা উঠানামা করলেই,...

—তা আপনি ঠিকই বলেছেন। এই কদিন নাকে দড়ি দিয়ে যেভাবে ঘোরালেন! এত সুন্দর পাট! তবে, কালই বিক্রি করেছি, ২০ টাকা দরে। গরীব হতে পারি, ঐ লোকের থেকে আমরা ২০ টাকাই দাম নেব।

আড়তদার থমকে যায়। রুহুমা ফোনটা কেটে দেয়।

ডার্ক ম্যাটার

—মিমি, তোমাকে continuous পাঁচ মিনিট ধরে কল করছি। (ভারী গলা)

—(নীচুস্বরে) তোমাকে বলেছিলাম সম্বিত, আজ ডিউটি আছে। রাত ৯.৩০টায় ঘরে ফিরেই কথা হবে।

—ডার্ক ম্যাটার পেপারটা কমপ্লিটলি রেডি। আই এম ভেরি এক্সাইটেড!

—প্লিজ, রাতে শুনি, পেশেন্ট এল।

সম্বিত তবু রাখেনা, ঝিম ধরে থাকে,.... আপনার সমস্যা? ---তিন দিন থেকে ভীষণ জ্বর। ----জিভ টা দেখি,চোখটা, একটু,,, জোরে জোরে শ্বাস নিন... কাশি আছে... পর পর পেশেন্ট আসে। মিমির ফোন সাইলেন্ট। মিমি গভীর স্নেহ দিয়ে পেশেন্টের কথা শুনে, প্রেস্ক্রিপশন লিখতে লিখতে ওষুধ ও পথ্যের নিয়মবিধি বলে যায়।

বিরক্ত হয়ে সম্বিত ফোন কাটে। রিসার্চ তো প্রতিদিন হচ্ছে, এ আর নতুন কী? এমন ভাবে হয়তো মিমি... ডার্ক ম্যাটার গবেষণা নিয়ে যখন বিজ্ঞান মহলে এত তোলপাড়, তখন নিজের সিক্রেট রিসার্চভিত্তিক পেপারস প্রথমেই ওই একজনই আছে শেয়ার করার মতো। তবু সে যখন তার পেশেন্ট এর প্রতি বেশিই দুর্বল, থাক- রাতেই কথা হবে। রাত তখন দশটা।

—তোমার সময় তাহলে হল!

—এই প্রফেশনে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় টাইম মিলবেনা সেতো তুমি জান। এই তো চার দিন আগের কথা, তিন দিন আমার ডিউটি ছিলনা। তোমাকে ফোনে পাই না, এত ব্যস্ত ছিলে যে, একটি মেসেজ অব্দি দিলেনা। আমি রাগ করিনি, উদ্বিগ্ন হয়েছি।

—তোমার রাগের কারণ ছিলনা, আমার আছে।

—কী কারণ?

—এতো কার সাথে কথা বলছিলে একটু আগেই যে আমার ফোন বুঝতেই পারলেনা?

—বিয়ের আগেই এই অবস্থা? কার সাথে সে তোমাকে বলবনা,কারণ এই বাচ্চা ছেলেমি তুমি বারবারই করছ।

—মেয়েদের এইজন্যই আমি দেখতে পারিনা, বাইরে বেরোবার সুযোগ হলেই এদের পাখা গজায়,

—দারুণ, তবে বিজ্ঞানী হলেই কেউ বিজ্ঞান মনস্ক হতে পারেনা।

—মিমি

—চেঁচাচ্ছ কেন?

—তুমি বিজ্ঞানের কী বোঝ? বিশ্বের রহস্যময় গবেষণায় আমি যুক্ত, তার ছোট ছোট জায়গাগুলো তোমাকে জানাতে চেয়ে কত অপেক্ষা !

তুমি অপেক্ষায় থাক ঠিক আছে, সেই তুমি

মেয়েদেরকে এত ছোট চোখে দেখ! এখন থাক,পরে কথা হবে, মাথা ভীষণ ধরেছে, ২৪ঘণ্টা ডিউটি, কিছু খেতে পারিনি, এখন খাব, তুমিও নিজের যত্ন নাও।

কয়েকদিন পর।

—কীরে মিমি পাঁচ দিন থেকে তোকে না পেয়ে খুব চিন্তা হচ্ছিল। অসুখ করেনি ত?

—সেটা হলেই ভালো হয়রে মিতা। তবে হয়না তো। ডিউটি বেড়েছে। এই কদিন ঘুম হচ্ছেনা ভালোভাবে। সম্বিত এর জ্বালাটাও বড্ড রকম।

—আবার কী হলো? তুই তো ওকে ব্লক করে দিয়েছিলি, বন্ধুদের সাথে কথা বলতে দেখলেও বিশ্বাস করতে চায়না। তাই তুই বললি যে যোগাযোগ কমানোর চেষ্টা করছিস? আবার শুরু?

—পারছি কই রে!

—তা বললে হবেনা। ডাক্তারি পাস করা দু বছর হয়ে গেল, ওকে ছেড়ে এবার বের হ। এত বন্ধু বান্ধব,সেরকম কোনো ডাক্তার ছেলে,তোর কাউকে ভাল লাগেনা?

—না।

—তাহলে? কোন সাধারণ ছেলে, এই ধর যেমন টিচার?

—না, হীনমন্য হয়ে পড়বে।

—তাহলে, প্রফেসর?

—প্রফেসররা ডাক্তার কে বিয়ে করবেনা।

—তবে?

—দেখি...

কয়েকমাস কাটে। মিমির বিয়ে হয় সম্বিত-এর সাথেই।

—মিমি, তাহলে বাধা পড়লি? (হেসে)

—কিছু ভাবতে পারলাম না।

—ঠিকই আছে। অন্য কিছু আর ভাবিস ও না। দিয়ে সম্বিত-এর কী খবর? খুব খুশি না রে?

—কী বলব...--মানে! সেই আমাদের পুরনো নীলিমা চিনতে পারছিস?

— হ্যাঁ, হ্যাঁ।

—ওর মার শরীরটা খুব খারাপ যাচ্ছিল, দুদিন রেগুলার নজরে রাখতে ফোনে কথা বলছিলাম। ব্যস, আর যাই কোথায়? তাই আবার ব্লক করে দিয়েছি।

মন বড়ই রহস্যময়। ফোনে কথা শেষ হলে, মিমিকে ডার্ক ম্যাটার শব্দটা অস্থির করে তোলে।

পশু

বিয়ের চার বছর হল। রেহেনার কোল আলো করে এখনো কোনো শিশু আসেনি। লকডাউনের শুরু থেকে বাচ্চাদের স্কুল যাওয়া বন্ধ। তাই সকাল দশটার টাইমটা বাদ দিয়ে সকাল ছ'টার সময় দশ-পনেরো মিনিট সময় সে নিজের জন্য রাখে একপ্রকার জোর করেই। কার্নিশ দিয়ে চেয়ে দেখে কয়েকটি কচিকাঁচাকে কাঁধে ব্যাগ নিয়ে যেতে। রেহেনার স্বামী বেডরুম থেকে চেঁচিয়ে ডাকে,..... রেহেনা? কোথায় গেলে? পরক্ষণেই শাশুড়ির গলা- কই রেহেনা, তুমি তো জানো মা, গরম চা'টা সকাল সকাল না খেলে গা'টা কেমন ঝিমঝিম করে। রেহেনা আঁতকে ওঠে বারবার, তবু শক্ত করে দেওয়াল ধরে থাকে।

বাবার পেনশনটার ওপর ভর করেই সংসারটা বেঁচে আছে। অনেকদিন বসে থাকার পর শামীম কাল কলকাতায় গেছে কাজের সন্ধানে, মাসখানেক না হলে ফিরবে না। শান্ত রেহেনা প্রয়োজন ছাড়া আরও স্তব্ধ হয়ে গেছে...... বাসনপত্রের টুংটাংই তার উপস্থিতির প্রমাণ দেয়। সেদিন আকাশটা ছিল মেঘলা। তখন দুপুর, রেহেনা সবে কলতলায় গেছে। কোথা থেকে লাল রঙের কঙ্কালসার একটি কুকুর একটু খোড়াতে খোড়াতে দৌড়ে ছুটে আসে। রেহেনার মায়া হয়। গত রাত্রের একটা রুটি ছিল জলে ভেজা, গলাগলা অবস্থায় কুকুরটিকে দেয়। অত্যন্ত ভীত হয়েও একটু এগিয়ে আবার পিছিয়ে কোনরকমে খেয়েই দৌড় দেয়। রাত্রিবেলায় বাসন মাজার সময় আবারও কলতলার পেছনদিকে একটি কাঠের উপর কিছুটা খাবার রাখে। এভাবে তিন দিন যায়। প্রতিদিনই সকালে রেহেনার চোখে পড়ে কাঠে একটুও কিছু থাকে না।

সেদিন রেহেনা দুপুরবেলায় কিছুতেই উঠতে পারল না, পেটে খুব ব্যথা। সন্ধ্যায় কল থেকে ঘরে জল নিয়ে যাচ্ছিল, কুকুরটিও পেছন পেছন ঢোকে। তার দেওরের চোখে পড়ে,... নোংরা কাদামাখা গায়ের জীবটিকে সে মোটা লাঠি নিয়ে তেড়ে বাগানে নিয়ে যায়, বেশ কয়েক ঘা-এর আওয়াজ পাওয়া যায়। রেহেনা ছাদে থেকে চেয়ে দেখার চেষ্টা করে। নিশ্চয়ই নেতিয়ে পড়ে আছে, ডান পাটা হয়তো আরো ভালোভাবেই মচকেছে অথবা খোড়াতে খোড়াতে যতদূর সে গেছে রাস্তায় আছে লাল রংয়ের ফোটা ফোটা চিহ্ন।

সারাটা দিন তার বিমর্ষতা শাশুড়ির ভালো লাগেনা, স্বামীর সামনে ব্যাপারটার জমানো বর্ণনা দেয়- ছেলেপুলে তো হল না, কুকুরের উপর দরদ! কথাটি রেহেনার কানে যায়, তার কাজের গতি আরো বাড়ে।

এদিকে প্রভু-পোষ্য সম্পর্ক দিব্যি জমে ওঠে। সন্ধ্যার পরপরই রেহেনা কলতলায় বাসন মাজতে যায়, তার আগেই কুকুরটি কলতলার পিছনে আমড়া গাছের আড়ালে চুপটি করে থাকে। উচ্ছিষ্ট খাবার যথাস্থানে রাখতেই এদিক ওদিক করে চাইতে চাইতে খেতে থাকে, আশেপাশে রেহেনার দৃষ্টি তখন আরো সজাগ।

সেদিন বিকেলে বাড়িতে খুব উত্তপ্ত অবস্থা। সাবেরা বিবি গম্ভীরস্বরে বলে- বাড়িতে তোমার স্বামীর অংশগ্রহণ যতটুকু তাতে কুকুর কী, বউ পোষারই তো ক্ষমতা নেই। অত্যন্ত উত্তেজনায় রেহেনা উচ্চ স্বরে বলে ওঠে- আমি তো কুকুরই আর আপনারাও। আপনার ধাড়ী ছেলে সেদিন কী কাণ্ড করলো? আর চালটি আপনি মেপে দেন। আমার খাবারের একটু অংশ যদি কুকুরকে দিই তবে কারো কিছু বলার থাকতে পারে না।

—তোমার এত তেজ, এত গলা?

সন্ধ্যায় কুকুরটি এলে রেহেনা খুব ধমকায়, তবু অবলা জীব চুপ হয়ে বসে থাকে, রেহেনা কোন খাবার না দিয়ে চলে আসে। রাত্রে সে নিজেও না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

সকালবেলা, ঘুম ভাঙতেই রেহেনা বাইরে থেকে শাশুড়ির কঠিন গলা শুনতে পায়, বেরতেই সে দেখে রাস্তা ভর্তি লোকজন। সাবেরা বিবির চিৎকার- দেখ সবাই দেখ, দলাদলা ভাত পড়ে আছে,.... এ বউ তো বউ নয়,.....অপয়া। কেউ শুনছে, কেউ হাসছে, কেউ বলছে... লক্ষ্মীকে অপমান! বাপরে বাপ! এর হেস্তনেস্ত করা দরকার।

রেহেনা দৌড়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে। সাবিনা বিবি চিৎকার করে বলে,..... তোমার বাপের বাড়ির লোককে ডেকে পাঠাচ্ছি ।

রেহেনার বাপের বাড়ি অনেক দূর, বাসে দেড় দিনের রাস্তা। এই দুদিনই রেহেনা, তার ক্ষুদ্র প্রিয়জনের জন্য অপেক্ষা করেছে, একদিনও দেখা মেলেনি।

শিক্ষা

সুভদ্রের মত বিকাশেরও যে একাডেমিক মেরিট খুব ভালো তারাপদ ঠিকই জানে। সেদিন মাথা কাজ করেনি। বিকাশের বেয়াড়া জেদ –বাবা, হাফপ্যান্ট ভাল লাগেনা, দাদার মত ফুলপ্যান্ট দিতেই হবে, স্কুলের বন্ধুরাও সবাই–এত শোনার ধৈর্য্য ছিল না তারাপদর। –ক্লাস সেভেনে পড়িস, এখনই কীসের, হ্যাঁ? বলেই গালে সপাসপ থাপ্পড়। অভিমানে বিকাশ কেরালায় পাড়ি দেয় –মারবেল-টালি বসানোর কাজ শুরু করে।

সেই ঘটনা তারাপদ ও ননীবালাকে মাঝে মাঝেই কষ্ট দেয়। কিছুদিন পর উচ্চমাধ্যমিকে সুভদ্রর লেটার মার্কস তার বাবামাকে সুখের সাগরে ভাসালো। মাঠান তিন কাঠা জমি বিক্রি হল, সংসার খরচ হল আরও ন্যূনতম। প্রতিদিন তিন চার কিমি রাস্তা ভ্যান টেনে তারাপদ মালপত্র, আনাজ দোকানে, হাটে ভাড়ায় নিয়ে যাওয়া আসা করে। ছেলের উজ্জ্বল কেরিয়ারের সাথে নিজেদের নিশ্চিন্ত ভবিষ্যতের কথা ভেবে পথের ক্লান্তি মনে লাগেনা। বিনা চিন্তায় কঠিন নিষ্ঠায় ম্যাথে সুভদ্র ইউনিভার্সিটিতে ফার্স্ট হয়। সারারাত তুমুল বৃষ্টির পর সকালে রোদের আলোয় গাছের পাতারা যেমন ঝিলিক দেয়, তারাপদর মনে সে রকম হয়। ননীবালা ছোট ছেলের জন্য কুঁইকুঁই করলে তারাপদ বোঝায়,– যে পড়বোনা বলে বইখাতা ছুঁড়ে ফেলে, পড়াশোনা তো বটেই জীবনের অনেক কিছুই তার দুর অস্ত্। ননীবালার ব্যস্ততা বেড়ে যায়, থালা বাসনে বেশি আওয়াজ করে। তারাপদ বিরক্ত না হয়েই বলে– ভাবা যায়! অংকে তোমার ছেলে শুধু ফার্স্ট না, নাইন্টি পারসেন্ট নাম্বার! ননী, সুভদ্র বড় কিছু করবে! দেখে নিও। ননীবালার ভেতরটা আনন্দে আবেগে মুচমুচ করে ওঠে– তা, ঠিকই বলেছ। যেমন নামে, তেমনই লেখাপড়ায়। ব্যবহারেও। মনে মনে ভাবে, বিকাশও পারত।

প্রথমবারেই নেটে পাস করে সুভদ্র কলেজের প্রফেসর। তারাপদর তোড়জোড়, বাড়িঘর এবারে তুলতে হবে, ডেকে সেকথা বলতেই, সুভদ্র বলে,– বাবা, তোমাদের তো জানা, আমি অনন্যা কে পছন্দ করি। ও এবাড়িতে থাকতে পারবেনা, ও ওর বাপমায়ের একমাত্র সন্তান। আদরে বড়। তাছাড়া আমাদের ভিটের জমিটা প্রস্থে কম। সেরকম বাড়ি হবে না। বরং বিকাশ এখানে থাকুক, আমি বাজারে বাড়ি বানাব ভাবছি। তবে শ্বশুর বাড়িতে থাকছিনা। বুক ফুলিয়ে সুভদ্র চলে যায়। বাঁশের খাপার বাড়িটা তারাপদ কে বিদ্রূপ করে। সে নিরুৎসাহ গোপন করে ননীবালার খোঁজ করে।

কদিন পর রাত তখন বারোটা। ফোনটা হঠাৎ বাজে। বিকাশের গলা। –বাবা, অনেক হল বিদেশে থাকা, মারবেল টালি সেটিং দারুণ শিখেছি, কোম্পানি এখানেই চাকরি দিতে চায়। তবে তোমাদের ছাড়া আর পারছিনা। দেশেই কাজ করব, বাড়িটা গিয়েই– এবার তোমার ভ্যান ঠেলা বন্ধ। তারাপদ হাউহাউ করে কেঁদে ওঠে।

হারাম

হালিমা বিবি নিজেকে খুব পরহেজগার ভাবে। সে নামাজ-রোজা ইত্যাদি নিয়ে অন্যদের জ্ঞান দেয় সুযোগ পেলেই। গতকাল সে তার বড় ভাই এর বাড়ি এসেছে। সেদিন সাঁঝবেলায়–

ভাবি, তুমি এড্যা কী ধরনের চাদর পাত্যাছো? এত্ত বড় বড় পাল্কির ছবি, ভিতর থাক্যা বহুডা ড্যাবড্যাব কইর‍্যা তাকিয়্যা আছে ...কাইল মেহফিলে পই পই কইর‍্যা কহালো হাদিসে এসব হারাম, তুমি শুনোনি?

–তা তো ঠিকই বুলছ হালিমা----আসলে হয়্যাছে কি বাকি চাদর গালার কুন খান ছিঁড়া, কুনখান ময়লা, তাই ভাবনু পরিস্ক্যার, নতুন বিছানায় তোমার নিন্দ ভালো হবে ---তোমার আদরের ভাইঝি তাই ভাইব্যায় তো নিজেই...

–থাক, সিমার কথা ছাড়, ও ভালো মুন্দের আর কী শিখলে..ভাইকে বুল্যাও কুনু লাভ হল না। হাফেজি লাইনে পহিড়লে এয়াদ্দিন অর পাত্তল পাই কেডা? নাইনে পহিড়ছে, ওড়না জড়াতে শিখেনি,সালাম দিতে জানেনা, সালাম দিলে উত্তুর করেনা, ফ্যালফ্যাল কর‍্যা তাকিয়া থাকে, মুনে হই যানে ভাষা খুঁইজ্যা পাছে না। আবার দেখছি সারাক্ষুণ ফুনে পিটির পিটির-----

–ঘরে ঘরে জনে জনে মোবাইল, অকে তা থাইক্যা আটকাই কেমুন কইর‍্যা? তাছাড়া, আমি তো তেমুন ডা বুঝিন্যা, তবে সবাই বুলছে এই করোনা কালে ফুনেই পড়াল্যাখা হবে।

–কিচ্ছু বোলার নাই, তুমি এমনিই থাকব্যা।

কিছুদিন পর হালিমা বিবির মেয়ের বিয়ে হয় বাপের বাড়ির পাশের গ্রামে। হালিমা মেয়ের শ্বশুর বাড়িতে দুদিন কাটানোর পর বিকেল বেলা হাঁটতে হাঁটতে ভাইয়ের বাড়িতে উপস্থিত হয়। ফুফুর শাড়ির দিকে চেয়েই সিমার চক্ষুস্থির...মা আজকে তোমার যে শাড়িটা আমি ধুয়েছি ওটা তাড়াতাড়ি নিয়ে এসোতো।

–কেন্যা, শাড়হি লিয়্যা কি করবি?

–ফুফুর শাড়ির দিকে চেয়ে দেখ কলসি কাখে কত্তগুলো মেয়ের ছবি...ফুফু তুমি লক্ষ্য করোনি না?

–বুলিস কি সিমা,তাইতো রে...ছি ছি আমি কি কর‍্যাছি...নরম বুল্যা পিন্দনু তাড়াহুড়া কর‍্যা...থাক কিছু হবে না। না জাইন্যা ভুল করলে কুনু পাপ নাই... সিমা অন্যাদিকে তাকিয়ে মুখ লুকিয়ে হাসে।

কাগজের নৌকা

বেশ কিছুদিন পর রুপা মায়ের বাড়ি এসে চমকে গেল। খুশিও হল। কি জমকালো বাড়ি... তার ভাই নবীন বানিয়েছে, যাকে বলে চোখ ধাঁধানো। সাত বছরের মেয়ে শুভ, ভাইয়ের দুবছরের ছেলে চিত্তকে নিয়ে ভীষণ আনন্দে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি, সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা শুরু করেছে, মাঝে মাঝেই সে চিত্তকে জোর করে এটা ওটা করার চেষ্টা করতে চিত্ত চেঁচিয়ে উঠছে.....ফাঁকা বাড়িটা চিৎকার আর দৌড় ঝাপে গমগম করে উঠছে।

মায়ের সাথে কথা বলতে বলতে ঘরগুলো ভাল করে রুপা নিরীক্ষণ করছে। ...মা, কী কাঠের দরজা গো? ...কাঁঠাল? আর এই খাটটাও? সবই ভাল। বিছানার চাদর সেই একই। মিটমিটে কালো।... ছোট ছেলেটার জন্য। নোংরা করে ফেলে তো।... রান্নাঘরটা কত্ত বড়ো! মায়ের নতুন ঘরে মা মেয়ের কথা বেশ ঘন বউদি দীপা আঁচ করে। এক বস্তা রেশনের চাল ঝাড়তে বসেছে দীপা। ভেবে নিয়েছে, কিছুতেই উঠবেনা... শুভকে দুটো কলা দিয়েছিল, একটা খেয়েছিল মেয়েটা...এটা এখন খাইনা, সেটা তখন খায়, ইত্যাদি সব ব্যাপার মেয়েটার। দীপার অসহ্য লাগে। তার ছেলেপুলে ওরকম না। যা পায় তাই খায়।

কিছুক্ষণ পর নবীন বাড়ি ঢুকেই বোনের আগমন বুঝতে পারে। গম্ভীর মুখে দীপার দিকে চায়। শুভ চুপ হয়ে মায়ের কাছে চলে যায়। বাবা কী এনেছ কী এনেছ, বলে মিনি মোবাইল হাতে পিসির কাছ থেকে উঠে আসে। ব্যাগটা রাখতে গিয়ে আবার তুলে নিয়ে নিজের ঘরে যেতে যেতে নবীন বিরক্ত হয়ে বলে... হ্যাঁ, দাঁড়াও।

নবীন ফ্রেশ হয়, দীপা সরবত দেয়। ...শোনো, ব্যাগে আপেল আর আনারস আছে। আপেলগুলো রাখো। আনারসটা কাটো। দীপা অর্ধেকটা কেটে সবাই কে দেয়।

...মা, ওই কাকুর আনারস আমি খাবনা, কেমন করে তাকায়। রুপা অবাক হয়। কেউ যদি শোনে, তাই আস্তে করে ভারী গলায় বলে—ওটা কাকু না, মামা। আর ওরকম বাজে কথা কেন? এই বলে মায়ের সাথে কথা শুরু করে। মা বলে...আজ একটু মুখে কিছু দিয়ে যাস, কেমন। প্রতিবার খালিমুখে যাস, কেন মা? তখুনি মিনি এসে ধরে—পিসি তুমি আজো চিটিং করছ, নৌকা বানিয়ে দেবে বলে না দিয়েই ব্যাগ গুছোচ্ছ? দাও ব্যাগ, দাও আমাকে। মিনি নাছোড়। অগত্যা রুপা নৌকা বানাতে বসে।

...পিসি, মা আঠা দিচ্ছেনা, তুমি বল না, তুমি বললেই দেবে। বেশ, বলে রুপা দরজার কাছে যেতেই কানে আসে, দেখলে তো কাটতে কাটতেই আধখানা আনারস উধাও। ভালো জিনিস বোঝে তোমার বোন, সজি আছে বলে ভাত খেলোনা, মাছ মাংস থাকলে কি খেতনা, সব বুঝি। এসে এসেই কলাগুলোর বাদে লেগেছিলো। ... তোমার দোষ, সামনে রেখে দাও যে। রুপা থ'হয়ে যায়, নড়তে পারেনা।

...পিসি ও পিসি শুভ কলা খাবে। একটা কলাও এনো। রুপার ঘোর কাটে, তাড়াতাড়ি ঘুরে এসে বলে, যাহ ভুলেই গেছিলাম, নৌকা বানাব। তা আঠার কী দরকার? চিত্ত সোনা এসো তোমার জন্য ছোট নৌকা বানাব। শুভ গোমড়া মুখ করে বলে, ও সবাই কে ভালোবাসে, আমাকেই বাসেনা। ...রুপা শুভকে বুকে চেপে বলে- বাসি তো, তোমার দুটো বানাব। চিত্ত বাব, বাব বা, মাম মাম মা বলে কাগজের নৌকা নিয়ে সারাবাড়ি মুখর করে তোলে।

রাস্তার নিচে পুকুরের স্তব্ধ জলে কয়েকটি কাগজের নৌকা টলমল করে এগোয়, কখনো বা পিছোয়। রুপার ভেতরের টলমল কেউ টের পায়না।

তুষার ভট্টাচার্য এর গল্প

স্বপ্ন

মিলন আমেরিকার নিউজার্সি থেকে ফোনটা করল বাড়িতে মা ,বাবাকে জানাতে যে ও হাসপাতালে ভর্তি আছে– করোনা পজেটিভ। তিনদিন ধরে ভীষণ জ্বর আসছিল। রুমমেট কবিরুল হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছে। কবিরুলের বাড়ি বাংলাদেশে। কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। একই কোম্পানিতে কাজ করে। বিদেশে বাঙালিদের মধ্যে চমৎকার একতা রয়েছে।

কলকাতার বাড়ি থেকে মানব বাবুকে আর তাকে যখন পুলিশ অ্যাম্বুলেন্সএ করে করোনা হাসপাতালে নিয়ে গেল তখন মিতা ভাবছিল এই সময়ে মিলন বাড়িতে থাকলে কত উপকারই না হত। আমেরিকায় থাকে। বছরে একবার বাড়িতে আসে। সারা বছর দুই বুড়ো বুড়ি বাড়িতে একা থাকে। এদিকে প্রমোটররা তাঁদের পুরনো দোতলা বাড়িটা কেনার জন্য সকাল বিকেল গেটের কলিং বেল বাজিয়েই যাচ্ছে। কবিরুল ভাবছিল কীভাবে মিলনের কলকাতার বাড়িতে খবরটা জানাবে। আজ সকালেই মিলন পরপারে চলে গেল। এত ভাল বন্ধু জীবনে আর পাবেনা বলে কাঁদতে থাকল কবিরুল। ফোনটা করা দরকার। পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে মিলনের বাড়িতে কয়েক বার ফোন করল। কিন্তু ফোন বেজেই গেল। কেউই ধরল না।

হাসপাতালের নার্স ভাবছিল কীভাবে মিতাদেবীকে খবরটা দেবে। ওনার স্বামী মানব রায় মারা গিয়েছেন গত রাত্রে। ঘুমের ভিতর স্বপ্ন দেখছিলেন মিতা। মিলন আমেরিকা থেকে বাড়িতে এসেছে। মিলন বলছিল -মা আর একটা বছর। এরপর তোমাদের আমেরিকায় নিয়ে যাব। এখানে তোমরা একা থাকো। আমার ভীষণ চিন্তা হয়। একটা কিছু বিপদ হলে তোমাদের দেখবে কে ? মিলনের কথা শুনে মানব রেগে আগুন। রাখ তো তোর কথা! আমি এই চার পুরুষের ভিটে মাটি ছেড়ে কোথাও যাবনা। যে কদিন বাঁচি এখানেই থাকব। মিতা মুচকি হেসে বললেন -তা মিলু এবার একটা ভাল মেয়ে দেখি। পচিশ বছর তো হয়ে গেলে তোর। বিয়ে করে বউকে নিয়ে যাবি না হয়। এই সব হাবিজাবি সব স্বপ্ন দেখছিল। ওদিকে কবিরুল ফোন বাজিয়েই চলেছে।

ফেরা

পুলিশের পাঁচিলে শ্লোগান লেখার কাজ। লেখা শেষ হবার মুহূর্তে সাব–ইন্সপেক্টর কোথা থেকে এসে লাল্টুর গালে কষিয়ে থাপ্পড় মারলেন। রোগা পাতলা শীর্ণকায় লাল্টুর গাল ফেটে রক্ত ঝরছিল। পলাশের দিকে ভদ্রলোক তেড়ে এলে ও এক ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। পলাশের ব্যায়াম করা লম্বা চওড়া শরীর। ইচ্ছে করলে ভদ্রলোকটাকে ধোলাই দিতে পারত। কিন্তু দিল না দোলনের বোবা বলে।

হস্টেলে ফিরে আসার পরে শিবাজীদা নির্দেশ দিলেন– শ্রেণি শত্রু খতম করতে হবে। সন্ধ্যেবেলায় ওঁৎ পেতে থাকতে হবে। পুলিশটাকে বাড়িতে ফেরার সময় বোমা মারতে হবে। হয় এসপার না হয় ওসপার।

পলাশের আর ভাল লাগছিল না এই সব খতমের রাজনীতি। চারদিকে নিরীহ মানুষ খুন হচ্ছে। শ্রেণি শত্রু খতমের নামে। দোলনকে কীভাবে জানানো যায় খবরটা। কিছু টাকা পয়সা সঙ্গে নিয়ে হস্টেল থেকে বেরিয়ে পড়ল পলাশ। দোলনদের বাড়ির গেটের কড়া নাড়তেই কাজের মহিলার কাছে খোঁজ নিল দোলন আছে কিনা। মহিলা মাথা নাড়তেই একটা হাত চিঠি দিয়ে সোজা হাওড়া স্টেশন চলে এল।

বোম্বাইএ কাকার কাছে এসে খতমের রাজনীতির হাত থেকে মুক্তি পেল। নিঃসন্তান কাকার ছিল মিষ্টির দোকান। সেখানে বসেই তিন চার বছরে ব্যবসা বাড়িয়ে ফেলল। কাকা মারা যাবার পরে আরও মনযোগ দিল ব্যবসায়। এই ব্যবসা বাড়াতে গিয়ে বিয়েটাই করা হলনা। তা ছাড়া বিয়ের কথা ভাবলেই দোলনের কথা মনে পড়ে সহসা। ও কেমন আছে কে জানে ? এত দিনে নিশ্চয়ই ওর বিয়ে হয়ে গিয়েছে ! এই সব ভেবে খুব কষ্ট হয়। রাত্রিবেলায় শুধুই দোলনের মুখটা ভেসে ওঠে চোখের সামনে। কেন যে বিপ্লবের নেশা পেয়েছিল। এখন ভাবলে মনে হয় ভুল ছিল সেই পথ। বাবা ,মা মারা যাবার সময় প্লেনে করে বাগডোগরা হয়ে বাড়ি এসেছিল পলাশ। তারপর আর আসেনি ।

এত বছর পরে কলকাতায় আসার কারণ অন্যকিছু নয়। পুরুলিয়ায় একটা অনাথ আশ্রম তৈরি করছে পলাশ। একশো জন অনাথ শিশু এখানে থাকবে। ইস্কুল তৈরি হচ্ছে। সব দায়িত্ব পলাশের নিজের। স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা নেওয়ার জন্যই কলকাতায় ছুটে আসা। হোটেল থেকে বেড়িয়ে এসে পলাশ ড্রাইভারকে বলল হেদুয়া পার্ক যাব। বিডন রোর চেনা গলিটা অনেক পাল্টে গেছে। হস্টেলে কতদিন রঙের প্রলেপ পড়েনি। পলাশ যে দেওয়ালে লিখেছিল বিপ্লবের শ্লোগান সেই দেওয়ালে এখন হাত ,পদ্ম ,ঘাস ফুলের চিহ্ন আঁকা। পলাশের মনে হল এই চল্লিশ পয়তাল্লিশ বছরে পাল্টে গেছে সব কিছুই।

হস্টেল পেরিয়ে গিয়ে পুরনো ভাঙা গেটের কড়া নাড়াল পলাশ। কে বলে দরজা খুলে দিল এক মাঝ বয়সী ভদ্র মহিলা। 'পলাশ অনেকক্ষণ অবাক হয়ে দেখল দোলনকে। বয়সের ছাপ পড়েছে। চোখে চশমা। কিন্তু মুখটা আজও ভারী সুন্দর। মায়াবী। আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে প্রশ্ন করল দোলন। আপনিই দোলন রায়? কেন আপনার কী দরকার? পলাশ বলল– আমি পলাশ মুখার্জী। এই পাশের হস্টেলে থাকতাম বেথুন কলেজের ছাত্রী দোলন রায়কে ভালবাসতাম। মনে পড়ছে? আর কিছু কথা আছে আপনার? বেরিয়ে যান এখান থেকে। অগত্যা অপমানিত হয়ে বেরিয়ে পলাশ গাড়িতে যেতে যেতে ভাবল দোলনের কাছে ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখবে। এর বেশি কী আর করার আছে। অপমানিত হয়েও আজ খুব আনন্দ হল পলাশের। কত দিন পরে দেখতে পেল দোলনকে। রাস্তার পাশে কৃষ্ণচূড়া গাছে লাল ফুলে ভরে গেছে। দূরে একটা কোকিল সুর করে ডাকছে। এখন কি বসন্তকাল এই ভাবতে ভাবতে পলাশ চলেছে হোটেলের দিকে।

প্রতিবাদ

—ও মশাই শুনছেন? ব্যাপারটা আপনিও জানেন না আমিও সঠিক জানিনা। তবে কিনা একটা ফিস ফিস আলোচনা শুনতে পাচ্ছি চারদিকে।

—কী কথা? দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে? তা সব ফেলে ফুলে ছেলে পুলে নিয়ে যাব টা কোথায়? চার পুরুষের ভিটে। এখন বলে কিনা বিদেশী! কোথাও যাব না।

—আরে না মশাই। আমি ওই সব নিয়ে কিছুই বলছি না। তবে যা শুনছি চক্ষু চড়ক গাছ! কী কথা? সব কিছু বলে বিক্রি করে দেবে। রেল ,ব্যাঙ্ক ,বিমান সব কিছুই।

—করলে করবে। বিরোধী দলগুলিও তো চুপ চাপ।

—মশাই বুঝলেন -এম এ পাস করে ছেলেটা বেকার বসে আছে। দেখলে মায়া হয় খুব। চাকরি বোধহয় আর পাবে না। শুনছি চাকরি পেতে গেলে বিশ লাখ টাকা ঘুষ দিতে হচ্ছে।

—আমার মেয়েটারও বিয়ে দিতে পারলাম না এখনও। নগদ পণ কত চায় জানেন? দশ লাখ। তারপর সোনা দানা খাট পালঙ্ক তো আছেই। এই সব ভেবে বাঁচতে আর ইচ্ছা করে না।

—একটা কিছু করা দরকার। অন্তত প্রতিবাদ। দেশটা তো কারো বাপের সম্পত্তি নয়।

—আমরা এই দুজন প্রতিবাদ করে কী হবে ?

—হবে, হবে আমাদের মতন অনেক মানুষ আছে। দ্বিধা ছেড়ে সবাই আসবে। আমরা শুধু ঘৃণা ভয় ছেড়ে শুরুটা করি।

—ঠিক বলছেন? আমার বিস্বাস হচ্ছে না একদম।

—স্বপ্ন দেখতে আপত্তি কি? কালকে পথসভা দিয়েই শুরু করি প্রতিবাদ। আগামীকাল ঠিক দশটায় বাসস্ট্যান্ডে দুজনের দেখা হবে।

স্বপ্ন দেখতে দেখতেই দুজন বাড়ির পথে পা বাড়ালেন।

ভাস্বর রুজ এর গল্প

বোঝা

সোমা আর কবিরের বিয়ে হয়েছে দেড় বছর। কবির কলকাতা পৌরসভায় চাকুরি করে। সোমা বাঙলায় মাস্টার্স। সেও স্কুল সার্ভিসে চাকুরির চেষ্টা করছে। কিন্তু চাকুরি তো সোজা কথা না।

সেদিন সকাল বেলা। সোমা রান্না ঘরে। কবির খবরের কাগজ দেখছে।

–এই শুনছ, এদিকে এসোনা একটু। রান্নাঘর থেকে মৃদুস্বরে কবিরকে ডাক দিল সোমা।

–(একটু এগিয়ে হাসিমুখে) বলে ফ্যালো, কী হয়ছে?

–(অনুযোগের স্বরে) বলি,এসোনা কাল থেকে আমরা দুজনে নামাজ পড়ি, যেন চাকরিটা পেয়ে যায়। তুমি তো আবার ওসব বিশ্বাসই করনা।

–কী বলছ এসব! আর কী বিশ্বাস করিনা আমি?

–আর পাঁচজন যেভাবে সৃষ্টি কর্তাকে মানে তুমি তো ওভাবে মাননা। আমার অনুরোধে তুমি একবার নামাজটা ধর।

–দ্যাখো সোমা, ছেলেমানুষী চিন্তা ছাড়ো। যুক্তি দিয়ে দেখ সব কিছু। বলোতো, তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী আমরা, সকলেই যদি প্রচুর প্রার্থনা করি, তবে কি তুমি চাকরি পাবে? এর সাথে তোমার চাকরি পাওয়ার কোনো যোগ সূত্র আছে কি? চাকরির নিয়োগে দূর্নীতির করালগ্রাস ছাড়া পড়াশোনায় কি একমাত্র চাকরির পথ নয়?

–(লজ্জিত হয়ে) হ্যাঁ, তা বটেই।

–তাহলে এরকম চিন্তার ভূত কেন তোমার মাথায়!

–তোমার কথা ঠিক। কিন্তু তবুও কেমন যেন মনে হয়!

–সোমা, ওখানেই তোমার প্রবলেম। আমাকে নামাজ পড়তে বলছ ঠিক আছে। তা দেহমনের জন্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু তার সাথে তোমার চাকুরি পাওয়া না পাওয়ার কী সম্পর্ক? এর নাম অলীক ধারণার উপর নিজের ভালোমন্দের ভার দিয়ে নিশ্চেষ্ট বসে থাকা।

–কবির, আমি মানি সে কথা। কিন্তু কেন জানিনা, নিজের বেলা কেমন যেন অসহায় লাগছে!

–দ্যাখো সোমা, তুমি খুব ভালো করেই জানো তুমি নিজে মাধ্যমিকে খুব ভালো রেজাল্ট করেছ। অথচ তার জন্য কোনো মৌলবি ডাকা হয়নি বা কোনো পীরের দরগায় মোরগও দাওনি। আবার তোমার চাচাত ভাই রকি দুবার পরীক্ষা দিয়েও শেষ পর্যন্ত বই'ই তাকে ছেড়ে দিল। আর ওর বাবা কত লোক খাওয়াল, মসজিদে পায়েস দিল, তা তুমি সবই জান। এবার কী বলবে!

সোমা লজ্জা পেল। সে কিছুতেই কবিরকে যুক্তিতে পেরে উঠবে না! কবিরকে বলল- যাও তুমি স্নান সেরে নাও, বেলা কত হয়েছে দেখেছ?

কবির স্নানঘরে চলে গেল। সোমা কবিরের কথাগুলো ভাবতে থাকল। কিন্তু মন থেকে তা মেনে নিতে পারল না। তার কেবলি মনে হতে থাকল ঈশ্বরের উপসনার কি কোনোই মূল্য নেই? কবিরের কাছে না থাকুক। আমার কাছে আছে। সে সিদ্ধান্ত নিল কাল থেকেই সে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ শুরু করবে। কবির যা বলে বলুক। পরের দিন ফজরের ওয়াক্তেই সে উঠে পড়ল। পরিচ্ছন্ন হয়ে নামাজ পড়ল। কবির তখনো ঘুমিয়ে। অফিস থেকে ফিরে সে দেখল সোমা নামাজ পড়ছে।

নামাজ শেষ হতেই কবির মন্তব্য করল, তোমার চাকুরি হবে কিনা বলতে পারবো না তবে শরীরের কিছু রোগ যে জব্দ হবে সেটা নিশ্চিত করে বলতে পারি।

সোমা কোনো উত্তর দিলনা।

থানা খরচ

দাসপুরের সুকুমার খাটুয়া বাড়িভাড়া দেন। উনার বাড়ির বত্রিশ বছরের ভাড়াটিয়া প্রবীর মাঝি। দীর্ঘদিন একই বাড়িতে ভাড়া থাকলে সেটির প্রতি দখলবোধ যেন স্বাভাবিক হয়ে যায়!

তাই প্রবীর মাঝি নাছোড়বান্দা। কোনোমতেই ঘর ছাড়বেন না তিনি। পাকাপাকি দখল নেবেন। এই নিয়ে দীর্ঘদিন কোন্দল মালিক সুকুমার খাটুয়ার সাথে। স্থানীয় মেম্বার, প্রধান, থানা প্রশাসন সবাই জানে ব্যাপারটা। কিন্তু সুরাহা হয়না।

মালিকও এবার আদা-জল খেয়েই নেমেছেন। ভাড়াটে উচ্ছেদ করেই ছাড়বেন। গ্রামের মেম্বার সুবীর মিদ্যাকে বললে তিনি কেমন গা-ছাড়া ভাব দেখান।

আর ভাড়াটে? ওর যে জোর আছে! যাবে কেন! সে রাজনৈতিক দলের সাথে লেপটে থাকা লোক। উল্টে মালিকের উৎপাতের বিষয়ে সুবীরের কাছে অভিযোগ জানায়। সুবীর বিষয়টি নিজ কাঁধে নিয়ে ভাড়াটেকে তার দুশ্চিন্তা নিয়ে অভয় দেয়।

এর দুই দিন পর বাড়ি মালিক, সুবীরের কাছে গিয়ে, কিছু বিচার চেয়ে ভাড়াটেকে ঘর ছাড়ার কথা বলতে বলে। সুবীর নিয়মের কথা বলে ভাড়াটের পক্ষ নিয়ে উল্টে মালিককে চাপ দেয়। মালিক চটে যায়। তর্কে তর্কে উভয়ের সুর সপ্তমে ওঠে।

হোমড়াচোমড়া চেহারার মেম্বারের মারে সুকুমার গ্রামীন থেকে সদর হসপিটালে। এক্কেবারে সাতদিন। এদিকে থানা মালিক পক্ষের অভিযোগ নেয়নি।

আজ সহায়ক মইনুল জি.পি অফিসে কাজে ব্যস্ত। সেও গোটা বিষয়টি জানে ঐ অফিসের কর্মী হবার সুবাদে। এমন সময় প্রধানের কাছে ফোন আসে। পাশ থেকে মইনুল শুনতে পায় –

প্রধান :বলো প্রবীর, আবার কী হল তোমার?

প্রবীর: (ব্যঙ্গের হাসি) কী আর হবে দাদা, আপনি যা বলেছেন তা-ই। থানা ওদের কেস নেয়নি। এখন কী করব বলুন।

প্রধান: (মৃদু স্বরে) বাড়ি তোমারই হবে, কে তোমাকে উচ্ছেদ করে দেখছি। চুপচাপ থাকো।

প্রবীর: জানি দাদা। আপনি যখন আছেন, আমার আর সমস্যা কী!

প্রধান: ঠিক আছে, তুমি শুধু থানা খরচটা রেডি রেখো। বাকিটা আমি দেখব।

প্রবীর : ধন্যবাদ দাদা।

মইনুল তার পাশে বসা সহকর্মী নিরঞ্জন দাসকে বলে, কী বুঝলেন নিরঞ্জনদা? নিরঞ্জন রেগে গেলে ইংরেজি বলে। সে মইনুলের দিকে না তাকিয়ে বলল, Cultureless politics is the Zamindari of such a group of vultures!

নীলকণ্ঠ এর গল্প

বেসরকারি স্কুল

ক্রিং ক্রিং করে ফোনটা বেজে উঠলো। দেবেশবাবু তড়িঘড়ি ফোনটা ধরলেন। ফোনে কথা বলা শেষ হলে মিলি জিজ্ঞেস করলো - কে ফোন করেছিল গো?
– ওই বাবুর স্কুল থেকে। কাল স্কুলে দেখা করতে বললো।
– কেন গো?
– সেটা তো বললো না। মনে হয় স্কুলে খুলবে, তাই অভিভাবকদের পরামর্শের কারণে।
অতিমারীর কারনে গত চার মাস সমস্ত স্কুল বন্ধ। পঠনপাঠনও বন্ধ। কিছু ক্লাস অনলাইনের মাধ্যমে হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সেটা ওই ছেঁড়া কাপড়ে তাপ্পি মারার মত।
পরের দিন সকাল ১১টার সময় দেবেশবাবু ছেলের স্কুলে পৌঁছলেন। খুব নামকরা বেসরকারি স্কুল। অফিসে যেতেই প্রিন্সিপাল জিজ্ঞেস করলেন - আপনি?
– আজ্ঞে, আমি অনিশের বাবা। কাল আপনারা ফোন করেছিলেন।
– ও হ্যাঁ, আসুন, বসুন। – বলে একটা চেয়ারে বসতে বললেন। দেবেশবাবু জিজ্ঞেস করলেন - হ্যাঁ তো বলুন, কেন ডেকেছেন? স্কুল খোলার ব্যাপারে কি?
– আজ্ঞে না। স্কুল ফিজের ব্যাপারে। আপনার ছেলের গত চার মাসের স্কুল ফিজ মোট বিশ হাজার টাকা বাকি আছে।
কথাটা শুনেই দেবেশবাবু অবাক হলেন- সে কি মশাই! এই অতিমারীর দিনে স্কুল বন্ধ, আর আপনি ফিজ চাইছেন!
– দেখুন মশাই, এটা বেসরকারি স্কুল। এখানে পড়াতে হলে ফিজ দিতে হবে।
– কিন্তু তাই বলে বসে বসে ফিজ নেবেন!
– সে কি মশাই, আপনি না সরকারি স্কুল টিচার, তা আপনার স্কুলও তো বন্ধ, কিন্তু আপনি তো বসে বসে বেতনটা ঠিকই নিয়ে নিচ্ছেন। যাইহোক মশাই, কথা বাড়াতে চাই না, আপনার ছেলেকে পড়াতে চাইলে ফিজ দিতে হবে। অন্যথায় ছেলেকে নিয়ে গিয়ে সরকারি স্কুলে ভর্তি করান।
দেবেশবাবু কোনো যুতসই জবাব দিতে না পেরে বেজার মুখে ফিরে এলেন। বাড়ি আসতেই মিলি জিজ্ঞেস করলো - কি গো কি হলো? মুখ ভার কেন?
– বলছি, আগে এক গ্লাস জল খাওয়াও তো।
মিলি জল এনে দেয়। জল পান করে দেবেশ ঘটনাটা বলে। কথা শুনে মিলিও অবাক হয়। কিন্তু একটা কথা না বলে পারলো না - খুব তো বেসরকারি বেসরকারি করো। বেসরকারি হলে নাকি পরিষেবা ভালো হয়। এবার বুঝলে তো।
অন্য সবদিন স্ত্রীকে দমিয়ে দিলেও আজ আর তিনি কিছুই বলতে পারলেন না।

বাপের রক্ত

শনিবারের শান্ত বিকেলে গ্রামের এক সালিশি সভা। বাদী এক সময়ের দাপটে মাস্তান মনিরুল। বিবাদী তারই ছেলে কামাল। কথা-কাটাকাটিতে মেজাজ হারিয়ে খেতে বসা মনিরুলকে লাথি মেরে উঠোন থেকে ফেলে দেয় কামাল। বয়স্ক মনিরুলের শরীর সহ্য করতে পারে নি যুবক ছেলের লাথি। এক সপ্তাহ হাসপাতালে কাটিয়ে বাড়ি ফিরে এই সালিশি সভা ডাকে।

গণজনতার কাছে এই ধরনের সালিশি সভা ঠিক তেমনই, যেমন একজন অনাহারে থাকা মানুষের কাছে একমুঠো ভাত। শয়ে শয়ে মানুষ এসে হাজির। বিচারকের আসনে বসা গ্রামের মাতব্বররা মনিরুলের এই করুণ অবস্থা দেখে বিস্মিত। কিন্তু বিস্মিত হওয়ারই বা কি আছে? পরিণাম তো এমনই হবার কথা ছিল।

ভিড়ের মধ্যে এটা-ওটা নিয়ে নানান কানাঘুষো চলছে। বেশ হিমসিম খেতে হচ্ছে সালিশকে শান্ত করতে। ভিড়ের মাঝেই একজন তার পাশের জনকে বলল, 'এ হচ্ছে আল্লার মার বুঝলে ভাই, নিজে একই কাণ্ড করেছে, এখন তার কর্মফল ভোগ করছে'।

বছর তিরিশ আগে ঠিক এমনই এক সালিশি সভা হয়েছিল। মনিরুল তার বাপকে গলা ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল। সালিশের বিচার ঘোষণা হলে তা মনিরুলের পক্ষে যায় নি বলে রে রে করে তেড়ে এসেছিল বিচারকমণ্ডলীর দিকে, সঙ্গে গালিগালাজের অন্ত ছিল না।

সেই থেকে ঐ বংশের বিচার মাতব্বরেরা আর করতে চাই না। কিন্তু মনিরুলের অনেক অনুনয় বিনয়ের পরে মাতব্বরেরা রাজি হয়। রায় ঘোষণার পূর্বে বাদী-বিবাদীর কাছে পুনরায় জানতে চাওয়া হলো, বিচার যাই হোক না কেন, তা তারা মানবে কিনা? মনিরুল গাজি একবাক্যে রাজি হলেও কামাল একটুখানি চিন্তা করে বলল, 'মানবো'। বিচারের ফল ঘোষণা হলো, ছেলে বাপের হাত ধরে সবার সামনে ক্ষমা চাইবে এবং ভবিষ্যতে বাপকে সসম্মানে দেখভাল করবে। বিচার শুনে কামাল শাসানি দিতে ছাড়ে না, বলে, 'আমি এ বিচ্যার মান্যা লিছি ঠিকই, কিন্তু আব্বা যদি পায়তারামু করে তাহিলে আমি ছেড়্যা দিব না'।

অদূরে দাড়িয়ে ছিল ক্লাস নাইনের সরিফুল। কামালের ছেলে। বাপের প্রতি তার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি কারুর নজরেই পড়লো না।

হিংসুটে

দ্বাদশ শ্রেণির মেধাবী ছাত্রী জিনিয়া। টেস্টের রেজাল্ট আশানুরূপ হয় নি। তাই ফাইনাল পরীক্ষার আগে ঘাটতিগুলো পূরণ করে নিজেকে প্রস্তুত করছে।

মাস তিনেক পরে ফাইনাল পরীক্ষা। সময় মেপে পড়াশুনা করছে সে। কিন্তু কিছুদিন থেকেই ঠিক পড়তে বসার সময় পাশের বাড়ির রকেট কাকু এসে বাবা জামাল সাহেবের সঙ্গে গল্প শুরু করে দিচ্ছেন। জিনিয়াদের বাড়ির পরিসর খুব বড় নয়। যেখানেই পড়তে বসুক না কেন গল্পের আওয়াজ কানে যাবেই। প্রথম দু-একদিন মানিয়ে নিলেও এখন বিষয়টা জিনিয়ার বিরক্তিকর লাগছে।

সেদিন মাকে কথাটা বলল, আচ্ছা মা, রকেট কাকু তো এর আগে আমাদের বাড়ি এত আসতো না। এখন প্রায় প্রতিদিনই আসছে। আমার তো ভাব গতিক ঠিক মনে হচ্ছে না। মা বলল, কেন? তোর কী মনে হচ্ছে? আমি নিশ্চিত আমার পড়াশুনার ডিস্টার্ব করার জন্যই আসছে, জিনিয়া বলল। মা বলল, তোর এমন কেন মনে হচ্ছে? জিনিয়া বলল, টেস্টের রেজাল্টের দিন দেখলে না বাড়িতে এসে বলে গেল উনার মেয়ে খুশি নাকি খুব ভালো রেজাল্ট করেছে। যেভাবেই হোক গ্রামের মধ্যে খুশিই নাকি HS-এ ফার্স্ট হবে। মা বলল, ঠিকই, সেদিন তো অনেক বড়ো বড়ো কথা বলে গেল। জিনিয়া বলল, যাইহোক, তুমি আব্বাকে বোলো যেন উনাকে আসতে নিষেধ করে অথবা বাইরে গিয়ে গল্প করে।

বাবার কানে কথাটা গেল। কিন্তু কেউ বাড়িতে এলে মুখের উপর কি তাকে আসতে নিষেধ করা যায়? কৌশল করে ব্যাপারটা এড়ানোর চেষ্টা করলেন। পড়ার সময়টুকু বাইরে থাকেন। কোনোদিন বাড়িতে থাকলে বাইরে গিয়ে গল্প করেন।

ফাইনাল পরীক্ষা এগিয়ে আসতে রকেট কাকুর আসাটাও ধীরে ধীরে কমতে থাকল। যথারীতি ফাইনাল পরীক্ষা শেষ করলো জিনিয়া।

পরীক্ষা শেষ হলে একদিন বাড়ির চার সদস্য বসে গল্প করছে। জিনিয়া বলল, দেখলে তো রকেট কাকু আর আমাদের বাড়ি আসেন না। আমি নিশ্চিত ছিলাম ঐ কারণেই উনি আসতেন। মা কথাটা শুনে বলল, কোথা থেকে যে মানুষের মধ্যে এত হিংসা আসে কে জানে? আমরা কি ওদের কোনো ক্ষতি করেছি? একথা সেকথার পর জিনিয়ার দাদা বলল, আব্বা, আপনি তো সেদিন বললেন যারা নামাজ পড়ে তারা নাকি খুব ভালো মানুষ হয়। বাবা বলল, হ্যাঁ, এটাতো ঠিকই কথা।

—এটা যদি ঠিকই হয়, রকেট কাকু তো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন, উনি তো তাহলে খুব ভালো মানুষ হওয়ার কথা। কিন্তু উনি বাড়ির আবর্জনা, দোকানের নোংরা বর্জ্য কুড়িয়ে আমাদের বাড়ির সামনে ফেলেন কেন?

—তাই নাকি! বাবা বিস্মিত হলেন।

—হ্যাঁ, আপনি তো সকাল সকাল কাজে বেরিয়ে যান তাই জানেন না।

—ব্যাপারটা তো ঠিক না, বাবা মন্তব্য করলেন।

—আসলে আপনার কথাটা একটু ত্রুটিপূর্ণ। যারা ভালো মানুষ তারা প্রথা মানুক না মানুক তারা ভালোই। বর্তমানে দেখবেন যারা শয়তান, দুষ্টু লোক তারাই নিজেদের চরিত্রকে আড়াল করার জন্য ধর্মীয় আচারগুলোকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে।

—হ্যাঁ, তুই ঠিকই বলেছিস। আজকাল আর ধর্মীয় আচার-আচরণ দিয়ে মানুষকে সঠিকভাবে বিচার করা যায় না। আর আমরা কাউকে কিছু বলিনা তো, সবাই আমাদের দুর্বল মনে করে। ওদের অন্যায়টাকে বাধা দিলেই ওরা আর ওটা করতে সাহস পাবে না।

—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন আর আপনি কালকে সেটাই করবেন।

পরের দিন জামাল সাহেব রকেট কাকুকে নোংরা ফেলতে হাতেনাতে ধরে ফেললেন এবং কড়াস্বরে দুকথা শুনিয়ে আসলেন। যার ফল হলো ভালোই। এর পরে রকেট কাকু নোংরা ফেলার স্পর্ধা আর দেখান নি।

গুজবের নেপথ্যে

প্রতিদিনকার মতই আড্ডা আজও জমে উঠেছে মোড়ের চায়ের দোকানে। নানান বিষয়ের আলোচনা, দেশ দশ ইত্যাদি। সবাই নিজেদের পাণ্ডিত্য ফলানোয় ব্যতিব্যস্ত। ঠিক সে সময় তৈমুর সাহেব এসে হাজির হলেন। তিনি অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। এলাকায় সম্মানীয়। কিন্তু রাজনীতি করেন বলে পিঠ পিছে অনেকে কটু মন্তব্যও করে। উনার ক্রোধান্বিত চেহারা দেখে সবাই হতভম্ব। রাগান্বিত ভাবেই তিনি বললেন, তোমরা সবাই বসে আড্ডা মারছো, আর এদিকে আমাদের ধর্ম নিয়ে টানাটানি পড়ে গেছে।

আড্ডায় দু একজন ধর্মপ্রাণ(!) ব্যক্তিও ছিল। ধর্মীয় পোশাক পরিহিত একজন কথাটা শুনেই বলল, কেন মাস্টার চাচা? কি হয়েছে বলেন তো? মাস্টার বললেন, ওই পাড়ার অমুক বাবু, আজকাল নাকি নেতা হয়ে উঠেছে, আমাদের সৃষ্টিকর্তাকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেছে। সেই ব্যক্তি বলল, বলেন কী? এত বড় সাহস! আমাদের ধর্ম নিয়ে কটুক্তি! এর একটা বিহিত করতেই হবে।

সবাই ভেড়ার পালের মত রে রে করে উঠলো, হ্যাঁ হ্যাঁ, আরেকজন বলল মাস্টার আপনি বলে দিন এখন আমাদের কী করা দরকার? তিনি বললেন, দেখো, এদের এখনই শিক্ষা না দিলে আমাদের ধর্ম সংকটে পড়ে যাবে। তোমরা সবাই যে যা পারবে লাঠিসোঁটা নিয়ে এক্ষুনি এসো।

ঘটনা যখন অন্যদিকে মোড় নিচ্ছে, আশেপাশের দোকানগুলো বন্ধ হতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাই লাঠিসোঁটা নিয়ে হাজির। এমন সময় ওখানে অর্জুন শেখ এসে হাজির হলো। একজন শিক্ষিত বুদ্ধিমান যুবক। পরিস্থিতি দেখে জিজ্ঞেস করলো, আপনারা সবাই লাঠিসোঁটা নিয়ে, কি ব্যাপার? ঘটনার বিবরণ শুনে মাস্টারকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি নিজের কানে শুনেছেন ওই কু-মন্তব্য?

– না।

– তাহলে কী করে জানলেন?

–দেখেছি।

–দেখেছেন? কোথায়?

–ফেসবুকে, হোয়াটসঅ্যাপে।

–ফেসবুকে? ফেসবুকের একটা জিনিসকে বিশ্বাস করলেন?

–কেন? ফেসবুকে কি সব মিথ্যে ভুল জিনিস থাকে নাকি?

–না, তা নয়। কিন্তু ফেসবুকের সব জিনিসকে নির্বিচারে বিশ্বাস করে নেওয়াও বোকামি। কই দেখান তো কী দেখেছেন?

মাস্টার মোবাইল বের করে ফেসবুকে একটা ছবি দেখালেন। অর্জুন ভালো করে দেখে বলল, একটু ভালো করে দেখেন তো, এটা কি নকল বলে মনে হচ্ছে না? আশেপাশের দু একজন দেখে বলল, হ্যাঁ, এই ছবিটা নকল বলেই তো মনে হচ্ছে। মাস্টারকে উদ্দেশ্য করে অর্জুন বলল, এটা ফটোসপ করা ছবি। আপনি শিক্ষিত মানুষ, শিক্ষক ছিলেন এককালে, আপনার ভুলের জন্য আজ কত বড় সর্বনাশ হতে যাচ্ছিল আপনি বুঝতে পারছেন? আপনিই যদি এরকম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবেন তাহলে সাধারণ মানুষ কী করবে? মাস্টার মাথা হেট করে কথা গুলো শুনলেন। এরপর আড্ডার লোকেদের উদ্দেশ্যে অর্জুন বলল, কেউ একটা তথ্য দিল আর আপনারা সেটা জিজ্ঞাসা, যাচাই করার প্রয়োজনটুকু বোধ করলেন না! আর আপনারা নাকি দেশ দশ নিয়ে চায়ের দোকানে ঝড় তোলেন। ধিক্কার আপনাদের।

এই বলে অর্জুন সেখান থেকে চলে গেল। কিছুটা সম্বিত ফিরলো সকলের। লাঠিগুলো জড়ো করে দোকানের পাশে ঝোপঝাড়ের জঙ্গলে ছুড়ে ফেলে দিল।

পরেরদিন মোড়ের লোকেরাই বলাবলি করছিল, মাস্টারের বড় ছেলে কয়েকজন বেকার ছেলেকে চাকুরি পাইয়ে দেবার নাম করে মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে চম্পট দিয়েছে। এটা কিন্তু সোস্যাল মিডিয়ার খবর ছিল না।

প্রভাস গোস্বামী এর গল্প

স্বাতন্ত্র্য

মনোজ কয়েকদিন থেকে অসুস্থ, সে প্রতিদিন রোহিনীর কথা ভাবে। সব সময় নানান কিছু নিয়ে ঘরকে আনন্দময় করে তুলত। গল্প বলার ধরন ছিল অনেকটা সেন দিদির মত। ভীষণ একা লাগে, যদি সে বাড়িতে থাকতো তাহলে সব কাজ কর্ম তাকে একা একা করতে হত না। বছর দুয়েক আগে মনোমালিন্য হয়। তার পর থেকে রোহিনী বাবার বাড়িতে আছে।

অতি তুচ্ছ ঘটনা। বাড়িতে সেদিন নিমন্ত্রিত ছিল আত্মীয়স্বজন ও কিছু বন্ধুবান্ধব। মনোজের প্রমোশন উপলক্ষে । অফিস থেকে একটি ফোন আসে মনোজের কাছে এবং সে খুব উত্তেজিত হয়ে কথা বলতে থাকে। উত্তরোত্তর কথার তীব্রতা দেখে রোহিনী কাছে এগিয়ে আসে এবং ফোনটি রেখে দেওয়ার জন্য বলে তখনই মনোজ অনিয়ন্ত্রিত রাগে সপাটে একটি চড় বসিয়ে দেয় গালে। মনোজ কিছু বলার আগেই রোহিনী বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

অভিমান করে বাবার বাড়িতে এসেছে রোহিনী। বেশ কয়েকবার তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে মনোজ। কিন্তু সে যায় নি। রোহিনীর বাবা-মা বেশ কয়েকবার বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করেছে কিন্তু তাদের কথাও শোনে নি। রোহিনী একাধিকবার ভেবে দেখেছে তার অভিমান কার প্রতি? তার নিজের প্রতি না মনোজের প্রতি। সে নিজে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখেছে একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও ফিরে যেতে তার আত্মসম্মানে বাধে। সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ভাবে কিন্তু পারে না।

মনোজ এর সেদিন খুব জ্বর। রাতে তার ঘুম আসে না কিছুতেই। দাম্পত্যের কর্তব্য সে কি বিস্মৃত হয়েছে? তার মনে পড়ে সেদিনের কথা। সে ভাবতে থাকে চড়ের যন্ত্রণা তাৎক্ষণিক ছিল কিন্তু হৃদয়ের যে যন্ত্রণা....। সে ঠিক করে ক্ষমা প্রার্থনা করবে তার কাছে। ঘুমিয়ে যায় কখন সে বুঝতে পারে নি।

ঘুম থেকে উঠে আবার রোহিনীকে ফিরিয়ে আনতে যায় কিন্তু রাস্তায় দেখা হয়ে যায় রোহিনীর সঙ্গে। রোহিনী ব্যাগ নিয়ে দাড়িয়ে আছে গাড়ির জন্য। ব্যাগটি হাতে নেয় মনোজ এবং একটি গাড়ি ডাকে। রাস্তায় কেউ কোনো কথা বলতে পারে না। দুজন দুজনের হাত ধরে কিন্তু চোখগুলি তাদের জলে ভেজা।

মনোজ অফিস বেরিয়ে যায়। রোহিনী দেখে টেবিলে একটি চিঠি ভাঁজ করা আছে। মনোজ লিখেছে, আমি সেদিন আমার সীমা লঙ্ঘণ করেছি। আমায় ক্ষমা করতে পেরেছ?

কবিতা

শ্রীচেতনিক-এর কবিতা

ক্ষমা!

ক্ষমা!
তুমি তো আমাকে মেরেছ
যখন যেখানে যেভাবে পেরেছ, মেরেছ
এ মার বিচ্ছিন্ন মার নয়, এতো ঘোষিত যুদ্ধ
বহু যুগ তুমি আমায় শত্রু বানিয়েছ
আমার পায়ে পা দিয়ে যুদ্ধ চাপিয়েছ;

আমি তো চাইনি যুদ্ধ
আমি ছেয়েছিলাম আমার খেতে ফসল ফলাতে
কারখানায় কাজ
চেয়েছিলাম দেখতে সংসার-প্রকৃতির
অপরূপ সাজ!
তুমি দাওনি
তুমি আমায় জোর করে পাঠিয়েছ প্রবাসে
ভিন দেশ ভিন রাজ্য ভিন জেলায়;
সেখানে এই তো সেদিন তুমি ভাষার নামে মারলে
জাতের নামে মারলে
ধর্মের নামে মারলে
মারলে অঞ্চলিকতার নামে: নর্থ-ইস্ট, সাউথ, বেঙ্গলি!
পিঠে দেওয়াল নিয়ে খুঁড়িয়ে চলছিলাম
এমনি করেই বহু যুগ
তোমার লোভে, লোভের সংক্রমণে একদিন-কতদিন
পৃথিবীর অতল থেকে মারণ-বীজ বের করলে তুমি;
এবার পিঠ তোমার দেওয়ালে
দিকে দিকে দেশে দেশে!
'বাঁচি কী করে?'

হঠাত তোমার মনে হল
এদের যাওয়া আসা সব বন্ধ করতে হবে!
লক ডাউন!
আমি কতদিন খেয়ে-না খেয়ে মরে বেঁচে রইলাম...
আমাকে রাস্তায় গাড়ি চাপা দিলে
খেতে না দিয়ে মারলে
রোগে মারলে
তারপর তোমার মনে হল, এবার যাও
ট্রেন দিচ্ছি বিশেষ!
কিন্তু ভাড়া নেব জেন, ষোলো আনায় আঠারো আনা...

মাঝে মাঝে মনে হয়, বেঁচে আছি কিনা
চিমটি কেটে দেখি নিজেকে
চেতনায় যদি এতটুকু বাঁচি, জেনে রেখ
কুরুক্ষেত্র কত নৃশংস!
ক্ষমা! কাকে, কেন, কোন অধিকারে?
ক্ষমা পায় কি ভীষ্ম?
আজ নাহোক, শত বছর হাজার বছর লক্ষ বছরের পর,
কোন এক বৈশাখী দুপুরে
কাঠ-ফাটা রোদ্দুর তোমার যকৃৎ-চিরে ঘোষণা করবে
চেতনার বিজয়!
ততদিনই তোমার ছাড়!

সংকট

মনে আছে তো, ১৯৪৩?
খাদ্যাভাব নয়, ব্রিটিশ নীতির কারণে মারা গিয়েছিল
লাখ লাখ লোক!
অমর্ত্য বাবু ত্যানাদেরই লোক হলেও খুঁড়ে
দেখিয়েছেন, সেটি।
মানে কখনো কখনো দেখাতে হয়, এই আর কী!
তাঁর কথা থাক, বিরাট লোক!
...কাজ নেই, কাজ নেই... কাজ থাকলেও করার উপায়
নেই!
ত্রাণের পরিসংখ্যান ফিরিস্তি, তাতে পেটে ভাত নেই!
খাদ্য আন্দোলন!
হাভাতেদের?
আবার?...
যতদিন যতমাস যতবছর যতযুগ যতকাল দেবতাদের
কালোবাজার,
খাদ্য আন্দোলন, ততদিন!

তোমার গোডাউন থরে থরে সাজিয়েছে যারা
তাদের অভুক্ত রেখে বাজার চাহিদা ধরে রাখতে সমুদ্রে
ফেলেছ অন্ন...
সে গেছে এক যুগ...
তারপর তাড়া খেলে যখন
জার্মান-দর্শন, ফ্রেঞ্চ-সাহিত্য আর ব্রিটেনের
ইকনোমিক্সের যুগলবন্দিতে!
মাথায় পোকা ধরে গেল!
দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের ফাঁকতালে শিয়ালীয়ানার ফাঁদে
ক্রমে বন্দি হল সোভিয়েত শ্বেত কপোত
এই তো সেদিন, নব্বই এ
ফাঁকা মাঠ, দেদার হরির লুঠ
হরিবল হরিবল!
লোকে বলল বা: বেশ বেশ বেশ... বিশ্বায়ন
এস হে সব দেশের বানিয়া-কুল, বাঁধি জোট
টিনা (TINA) ঘোষণা করে দাও...
ইতিহাসের মৃত্যু...
চলুক লুঠ অবাধ, মুক্ত--
মুক্ত বিশ্ব বাজারে: জল-জমি-জঙ্গল-মহাকাশ
এভাবেই আমাজন,..
আরো কত কী!
বাজার সংকটে মাঝে মাঝে ধুঁকলেও
কী বা এসে যায়!
আবার সামলে নেওয়া যাবে ক্ষণ!
যেমন, ২০০৯তে হয়েছিল মার্কিন বেনিয়া কাবু
আর আজ? ২০২০?
একই রোগ, দেবতার বাজার সংকট
সেই ২০১৮-১৯ থেকে?
এবার রক্ষ-কবচ?
করোনা, মহামারি!
পেয়েছি, পেয়েছি!
'চেতনা'ও দেখছে সবই
পূর্বের আঁতুড় ঘর থেকেই কবি দেখেছিলেন আশ্বাসের
সংবাদ বাহক,
সভ্যতার সংকটে...

প্রকৃতির লক ডাউন

১৪৪-জারি রাস্তার দুধার দিয়ে শত হাজার পদচিহ্ন নিশ্চিহ্ন
শ্রম-কর্ম সব অসাড় কঙ্কাল হয়ে জনজীবন স্তব্ধ
আমাদের প্রাত্যহিক জীবনটি পাঁশুটে গতিহীন
পৌনঃপুনিক রুটিনবদ্ধ জাড্য মনকে ক্লান্ত করে
সোশ্যাল মিডিয়ার আনসোশ্যাল একটিভিটি
এ ক্লান্তি বাড়ায়, কমায় না
এজীবনটি আপার- মিডিল ক্লাস

আর অন্যদিকে মাটির-ঘামের মানুষেরা, কিছুই হয়নি যেন
দৈনন্দিন মাঠ-ঘাট শ্রম-বৃত্তি
ভাবনাহীন
তাদের জীবন-চর্যা নিয়ন্ত্রণ করছি আমরা
তাই তারা থতমত বিংটে যাচ্ছে হামেশাই

আকাশের রঙ পালটানো দুপুর প্রকৃতিকে সাজালেও তাতে সাড়া দিতে পারছি কৈ
শহরের রাস্তায় শেয়াল-ভাম বন্যপ্রাণীদের বিচরণ সংবাদে প্রকাশ
অনেক-অনেক স্থানের বাতাস দূষণহীন
কার জন্য? প্রাণবন্ত হয়ে তা এঞ্জয় করতে পারছিনা
এ হল প্রকৃতির প্রতিশোধ--
'অস্তিত্ব' এর সতর্ক বার্তা তো মানিনি
'ঘটনা ঘটে জলস্থলে, মানুষের হাত যা করে তার ফলে'--
তাই সুদূর অতীতের প্লেগ-আক্রান্ত গ্রীস
আর আজকের নিউইয়র্ক কিংবা দিল্লি
প্রকৃতি তার খেয়ালেই ছিল
তাকে যারা বিকৃত করার খেলায় মেতেছিল
আজ তারাই তো স্বেচ্ছা-ঘরবন্দি!

রঞ্জন পাড়ুই-এর কবিতা

সে

সে একদিন রাজপথে নামে
বাঁকা-চোরা কানাগলি ছাড়িয়ে শ্রমে-ঘামে
তার ভালবাসার মানুষেরা একে একে আসে
একটি মিছিল দিগন্তে হাসে
সে একদিন রাজপথে আসে

রাজপথ কী?
তাকি রাজার পথ? প্রশ্ন করে দৈবারিক
না, শ্রেষ্ঠ পথ, ঋজুরেখ
তার সোপানগুলি বুকের হাড়-পাঁজর দিয়ে গাঁথা
তাতে শতাব্দী শতাব্দী মানব-মনের ভালবাসার
ইঁট-পাথর-সিমেন্ট-চুন মিলেমিশে একবদ্ধ
এ-ই ঐক্য, তাওহিদ, মানবতার একত্ব
সত্তা-দাহী আগুনের পরশমণিতেই সমৃদ্ধি তার

দহন প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন হতে চেয়ে সে-তারা
রাজপথে আসে
যুগপুরুষের নৌকা বাওয়া
ইতিহাস বানায়...

কত যুগ কত মিশ-কালো আঁধারচিত্র
পেরিয়ে এলে তাদের মতই আমি-তুমি-সে
আমরা রাজপথ পাব?
আর কাণ্ডারী তোমাকে
কুলোর বাতাস হয়ে তুমি উড়িয়ে দিও যত কালো...

মব

মব কে, কী তার পরিচয়
তার ধর্ম কী,জান সুনিশ্চয়?
সিজার- হত্যার ষড়যন্ত্রীর বাক্যবাণ তাকে মুহূর্তে পক্ষে টানতে পারে;
পরক্ষণে অ্যাণ্টনির পালটা বাক্যনিচয় তাদের দিকেই
হয় উদ্ধত মার মার রবে;
শেক্সপিয়র জানিয়ে দেন মবের চরিত্র নেই,
মব চরিত্রহীন।

উন্নততম জ্ঞানচর্চার নির্যাস রূপ সংস্কৃতে
'ধর্ম' বচনে ঋষি জানান ধৃ রূপ চিরায়ত জীবন-নিয়ম।

তাই চরিত্রহীনের ধর্ম? হয় না।
মবের কোন ধর্ম নেই!

যে অধর্ম রাজপদ কলুষিত করে
মব সংক্রমণ ঘটায়,
সে-ই হত্যাকারী মবের নাম-বস্ত্র-রূপী ধর্ম খোঁজে
অধর্ম রাজপদের পোষা সর্পকুলের নৃশংস বিষ
রাম রূপ পবিত্রতার সাধনা ছাড়া
নাশে কীসে?...

অদৃশ্য শত্রু

হানা দেয় অদৃশ্য শত্রু কখন
তাই তো লক ডাউন!
এবারের মত বেঁচে যাব হয়তো
হয়তো নয় নিশ্চিতই, হবেই তো।
কেউ আর চাইবে না চাকুরি
ফসলের দাম-দাবি নিয়ে গুলতানি-ফিকিরি!
হাভাতেদের থেকেও অ-নে-ক নিরাপদ
দেখছি তো ওঠে যাতে পাতে অন্তত একটি পদ।
খবরের দুএকটি কাগজ-চ্যানেল চেঁচালে
ঠাণ্ডা করে দেওয়া যাবে ফাঁকতালে।
বড় হুজুরের দশাও তো সেই
হাত-যশ কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা পার পাচ্ছে কই?
ইউরোপের ড্রাগনদের প্রাণপণ বাঁচার
হবে কি ইচ্ছে পূরণ আবার?
জল কোন দিকে যায় তুলাদণ্ডে মাপ
আপাতত প্রাণ যায় বাপরে বাপ!
চিনা ড্রাগনের আপাত হাল্কা ফাঁস
বসছে কি কষে আবার সর্বনাশ?
দিল্লির ঘট পূর্ণ হবে মনে বড় আশ
এও তো যুদ্ধ, আবার পৌষ মাস!
আগের বৈতরণী পেরিয়েছি একই না-ই
এবারও সওয়ার, একই রোশনাই...

যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা সেতো আজ বা গতকাল
বুদ্ধু বানানোর ফেরেব তাতে চিরকাল।
ঢাকা কি পড়ছে তাতে শ্রেণি চরিত্রের কালো?
ব্রিটিশ সমাদরে বাড়ি যায় প্লেনে
শ্রমিক মরে হেঁটে ঘেমে গুণ টেনে।

হাঁক দেয় চেতনার ষাঁড়াশি
ভাঙতে বিষ দাঁত এস বাঁধি জোট কষি।

দাসত্ব-গাথা

শ্রমিক রূপী দাস কি জানত
সে দাস?
কারাগারের বাইরের বন্দি কি জানত
সে বন্দি?
আপাত মুক্তির ছলনায় ভোলা
'মুক্ত' কি জানত
সে বন্দি?
সম্পদ কুক্ষির চক্রান্তের
চির-শরিক কি জানত
সে এত কাঙাল?
ছা-পোষা নিরীহ কি জানত
সে আসলে স্রেফ কিছু নয়?
রাজা কি জানত
সে অতি সাধারণ?
কিংবা সম্রাট, সে কি জানত
সে এক মস্ত গবেট?
পৃথিবীর দেবতারা কি জানত
তারা কত তুচ্ছ?
ধর্মের চেলারা কি জানত
তারা বিজ্ঞানের দোরে হা পেতে থাকে?

একটি মহামারি সব্বার অতলান্ত
বিটকেলে তুচ্ছতা উন্মোচিত করে দিলে!

আমার লেনিন

গড্ডালিকার বাম-সংস্কার!
তোমার লেনিন খুটোয় বাঁধা
করেছ তাকে আট-ঘাট মারা তাকবন্দি
তোমার বন্ধ দুয়ার খল-হিসেবি দখল নিতে,
করেছ তাকে ফ্রেমবন্দি, মন্ত্রপড়া তন্ত্র ধরা।

আমার লেনিন তন্ত্র বানায়, শিকল ভাঙে
বাদে'র ফাঁদ-কেটে রাস্তা বানায় নতুন হাতে।

তোমার লেনিন আঁটোসাঁটো
মিথ-মিথ্যায় করেছ তাকে বড্ড খাটো।

আমার লেনিন দিগম্বর যে
মুক্ত আকাশ তার সীমানা
জীবনেরই আগল ভাঙা পূর্ণিমাতে;

ঋত্তিক তাকে ধরেছিলেন তার ফোকাসে
তিনিই ছিলেন নজরুলেরই বিদ্রোহীতে
তিনিই ছিলেন মানিক বাবুর মন-ওপেনের উপন্যাসে
তিনিই ছিলেন সত্যজিতের অপুর হাতে।

সেই লেনিনের আসার পথের সাথি হোতে
তুমিও এস
সংস্কারকে ডাণ্ডামেরে তাড়িয়ে দিয়ে নিশান হাতে....

Bring Him Home

He says bring him home
She says bring him home
For he is abroad
For he is out of the state
For he is out of the city
For he is out of the District
And there is Pandamic
And there is curfews
And there is no food and drinks
He might be sick
She might be sick
And no one is there to care for him
And no one is there to care for her
He says bring him home
She says bring him home

Do you care, folks?
He cares, She cares, They care
For they have heart
And we do not
For we are heartless!

আল আমিন-এর কবিতা

জীবনের গান

টুপ টুপ টুপ বৃষ্টি পড়ে,
সকাল দুপুর সন্ধ্যে;
পৃথিবীটা ভরে ওঠে,
মিষ্টি মধুর ছন্দে।....
....হ্যাঁ, এমন পৃথিবীই চাই
যেখানে প্রকৃতি উজাড় করে দেবে নিজেকে,
ভালবাসা ভালোলাগার তানপুরা আনন্দ দেবে
সারাক্ষণ।

আকাশে মেঘ সাদা সাদা,
পেঁজা পেঁজা তুলোর মতো;
একটু বসে দেখলেই ভাই,
সেরে ওঠে মনের ক্ষত।।....
ঠিক তাই, হাহাকার করে কান্না আমার আসেনা,
বুকে জমা কান্নার নিকেশি পথ বুঝি তাই এটাই।

শিশির কণা খায় লুটোপুটি
ভোরের ঘাসে ঘাসে,
হাঁটতে গিয়ে তাইতো দেখি
পা দুখানা ভাসে।।....
জোনাকির আলোয়, প্রজাপতির ডানায়,
কুয়াশায় ঢাকা রাত, ভোরের শিশির,
আর আমার না বলা গল্পের স্বাদ।

হা হা হা হাসবো অনেক,
রং লেগেছে বনে;
আজকে আমি লিখবো সনেট,
গাইবো মনে মনে।।....
নব জীবনের সূচনায় অগ্রবর্তী কলতান
এস গান গায়, জীবনের গান....

তোমাকে চাই

আলো চেয়েছি জীবনে
যেমনটি জোছনা রাতে দূর বালু তটে
যেমনটি শিশির ভেজা গাছের পাতায়
যেমনটি উদ্ভাসিত আমরা হিয়ায়

রাতের আঁধারে আঁকড়ে থাকা মৃত্যুর মত
বিতৃষ্ণা, এখনো আছি একা
তাই তোমাকে চাই, আলোর মত চারিদিক আলোকিত
করে আমাকেও আলোকিত করো, আরো গভীর ভাবে
আরো নিবিড় ভাবে আলিঙ্গন করো,
আরো আলোকিত করো আমাকে।

ঠোঁটে লেগে থাকা বিষ, সমস্ত আবেশ
শীতের পর্ণমোচী পাতার মত ঝরে পড়ুক,
বসন্তের রঙে হৃদয়ের নতুন পাতায় আলপনার আদলে
আবির্ভাব হোক সত্তা,
আমি পৃথিবীকে রাঙাতে চাই।

প্রিয়তমা

এই দারুণ দুর্দিনেও মানুষের কি নির্লিপ্ততা,
এখনো এক অলৌকিক শক্তির আশায় !
দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে নাকি ঘুরে দাঁড়াতে হয় !
সব বোগাস,
দেওয়ালে তো পিঠ ঠেকেই আছে
মানুষের এ এক আজন্ম ইতিহাস
যদি বেঁচে যায়, আবার শস্য ক্ষেত্রে,
আবার কলকারখানায়, খনিতে মর্তে পাতালে
বিরামহীন দাসত্বে,
সেই একই জীবন

প্রিয়তমা, আসলে আমরা কেউ আগুন জ্বালেতে জানি না,
আগুন নেভাতেও জানি না,
পিঠ ঠেকে গেলে আর একটু ক্লিশে হয়ে ভাবি--- এই তো অনেক জায়গা

নুয়ে নুয়ে মেরুদণ্ড বাঁকা, সোজা হয়ে দাঁড়াতে ভয় হয়
ভয় দেখানো পৃথিবীর সাম্রাজ্যে মানুষ বুঝি তাই বড়ো অসহায়!
এবং পরগাছারাই রাজত্ব চালায়।

বঙ্গ জননী

পিয়ারুল ইসলাম

ওগো জননী তুমি আমায়
লালিয়ে পালিলে
তোমার বুকে হাত রেখে তাই
হাঁটতে শেখালে,
তোমার আলো তোমার বাতাস
আজ আমারে
গড়িলে ইস্পাত তীক্ষ্ণভাবে
নব এই আকারে,
তাই জাগছে মানের চিলে কোঠায়
ক্ষণে ক্ষণ প্রহরে প্রহরে
শুধু তোমারে
বঙ্গ জননী তোমারে।
সেই আমি তোমায় ফেলে এসেছি চলে
জানি আমি তবু তুমি যাবে না
আমায় ভুলে আমার জন্য কাঁদবে তুমি
লাল হলুদ, নীল ফুল প্রজাপতি সাথে
ছড়িয়ে বাগানে।
জানো আমিও বসে কাঁদছি জননী
জান্তি দুরামে,
সবুজ পাহাড় তলে কেরালার
শান্ত গ্রাম ক্যায়াপুরামে
তাই জাগছে মনের চিলে কোঠায়
ক্ষণে ক্ষণে প্রহরে প্রহরে
শুধু তোমারে
বঙ্গ জননী তোমারে।

যোগ্যতা

রাজেশ

খুব, খুবই স্বাভাবিক নিয়মেই
নিজেকেই করেছি একান্ত আপন,
রোজ সূর্য, সে তো উঠেও ডুবে যায়
বয়ে যায় নিত্য ক্লিশে জীবন যাপন ।

দু'চোখের রঙিন স্বপ্নেরা
বড়ো হবার আশা ভুলে যায়।
চাহিদার মাঝে জীবন আবদ্ধ
"না পাওয়ার" চাহিদায় পুড়ে ছাই ।

গল্প বলি, গল্প শুনিও কতশত
বাড়ার গল্প, ঘুরি বাঁচার বাজারে
তাই সঙ্গী করেছি বাড়তে,বাঁচতে
সেও চির অচেনায় রয় অন্তরে।

কর্মেই নাকি জীবন সাজে
করছি তো কাজ ঢের,
হ্যাভ নট বলেই অর্থেতে টান
খাবার বেলাতেও ফের।

যাদের, টাকা ও মামা-কাকা,
'মেধা'জোড়া তাদের সাথে
শুনছি রোজ, বলছে বর্তমান-
আসল মেধা বিক্রি তাদের হাতে।

ক্ষমতা! সে তো সীমাবদ্ধ
করছি সবেতেই গোলামি,
কী করবো তা ঠিক করে দেয়
যোগ্যতা নয় সেলামি।

বড়ো হবার জো না পেয়ে
ক্লিশে জীবনই সার্থক(!),
"বড়ো তো হবো" বলে তবুও ছুটি
যদিও আমি আজ কেবলই দর্শক ।

আত্ম-বন্দনা

বিলাস

সেই কবে বসন্তের কোকিল কেশে কেশে রক্ত তুলেছে;
অনেকেই আজ অভিধানচ্যুত,বিলুপ্ত
যেমন আমি, আমার সত্ত্বা;
আমি শুধু রয়ে গেছি ছেঁড়াকাঁথার সংসারে...
অনেকটা বাক্সে বন্দি,
না সংহার না স্বাধীনতায়
জরাসন্ধের অঙ্গুলিহেলনে, ন্যুব্জ হয়ে কল ও কব্জায়
পিষে যাচ্ছে ক্রমশ বুকের পাঁজর আর কশেরুকা
অস্তিত্ব সংকটে।

তবুও তুমি খুঁজে মরো রূপকথা
ডিমের অন্তঃসারশূন্য খোলকে।
দিক্ষাহীন শিক্ষার বাজারে
ক্রুর হাঁসি হেঁসে যাও, বাজারি গোলকে।
আমি যে হাঁসি না এমন নয়
আমিও হাঁসি, ঠোঙার দয়ায়।
ভাগ্যিস,অতিমারির প্রমাণ প্রকটে,
তোমার ধর্ম চালান আজ পকেটে।

এক পৃথিবী গল্প নিয়ে ঠোঁটে
কানাঘুষো বেঁচে থেকে কী লাভ?
না, আমি হাঁটব না অবেলার মৃত্যুমিছিলে
না আমি ভাসব না সময়ের কালো স্রোতে
থাকব সমাপতন মাখামাখিতে
মানবতা আর চেতনার উন্মেষে।
মেরুদণ্ডে ধার দেব,অধিকার
বুঝে নিতে, বুঝিয়ে দিতে।

বসে আছি আপন ঘরে
অঙ্ক কষছি বল-শক্তি শক্তি-বল এর
'কত ধানে কত চাল' কড়ায় গন্ডায় মিলিয়ে নেওয়ার।

আওড়াব না কোন স্তব,
ভাসব ভাসাব প্রেম চরাচর,
প্রেমবার্তা করব ঘোষণা....
কাল যেন ধর্ম ফসফরাসে ঘষা না দেয়...
না ঠেকুক পেট পিঠে, না পিঠ দেওয়ালে
না উঠুক জীবন দাঁড়িপাল্লায়
শীর্ষ কুকুরের হাটে-বাজারে, বিকৃত-কল্পনায়।

তুমিও এসো
চোয়ালশক্ত কর,
মুষ্টিবদ্ধ, অপেক্ষায় আছি
দেখা হবে ধ্রুবতারার পথে.....

সম্পাদকীয় নিবন্ধ

ধর্ষণ ও প্রতিবাদ: একটি বিশ্লেষণ

(১) সিলেক্টিভ প্রতিবাদ?

" এত নারী প্রতিদিন ধর্ষিতা হচ্ছে। কেন কেবল হাতরাস এর ঘটনা নিয়ে প্রতিবাদ?"

আসলেই তো। জাতীয় অপরাধ পঞ্জীকরণ সংস্থার (NCRB) সাম্প্রতিক হিসেবে প্রতি ১৬ মিনিটে একটি ধর্ষণ। আর এই তথ্য কেবল যে ধর্ষণের রিপোর্ট হয় সেগুলির। হাজার হাজার ধর্ষণের ঘটনা সমাজ ও অপরাধীদের ভয়ে লুক্কায়িত থেকে যায়। পারিবারিক ধর্ষণকে হিসেবে ধরা হয়না।

এটাই আমাদের দেশের দু:খজনক সত্য।

যখন কোনো নির্দিষ্ট ধর্ষণ এর প্রতিবাদ করা হয় তখন তা সব ধর্ষণের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ। সেই রেপ সমস্ত রেপ এর প্রতীক হিসেবেই বিবেচিত হয় তার জঘন্যতা ও ভয়াবহতার কারণে।

এর মানে এই নয় যে অন্যগুলি কম গুরুত্বপূর্ণ। সবগুলোর বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ জরুরি। কিন্তু প্রতিবাদ ধর্ষকদের বিরুদ্ধে করা দরকার, তাদের বাঁচানোর জন্য নয়।

হাতরাস ওই রকম একটি ভয়ানক, ঘৃণ্য রেপ। এই জন্যই প্রতিবাদ।

(২) একটি সরকারের বিরুদ্ধে কেন?

" কেন কেবল ইউপি সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ? সমস্ত সরকারের বিরুদ্ধে নয় কেন?"

ভারতে রেপ নতুন নয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী এই অপকাণ্ড ঘটছে। কিন্তু প্রশ্ন হল প্রশাসন তা কীভাবে হ্যান্ডেল করছে সেটি নিয়ে।

তারা কি নির্যাতিতার পক্ষে দাঁড়াচ্ছে এবং তাকে ও তার পরিবারকে ন্যায় প্রদান করছে?

নাকি তারা তাদের মুখ বন্ধ করে দিচ্ছে, ন্যায় তো দূরের কথা? তারা কি রাতের আঁধারে দেহ পুড়িয়ে দিচ্ছে? ঘটনার ১৫ দিন পর অটোপসি করে তারা কি ' যেহেতু বীর্য পাওয়া যায়নি মানে রেপ হয়নি' এমন হাস্যকর বিবৃতি দিচ্ছে? তারা কি মিডিয়াকে রিপোর্ট করতে দিচ্ছে না? তারা কি বিরোধী নেতানেতৃদের প্রতিবাদ করতে দিচ্ছে না, বা তাদের এই জন্য আটক করছে? পরিবারের পাশে দাঁড়াতে কি বাধা দেওয়া হচ্ছে?

সরকারের রেসপন্সই তার মনোভঙ্গির পরিচয়। অর্থাৎ ক্ষমতা যখন অত্যাচারীর পক্ষ নিয়ে নেয় তখন প্রতিবাদ করাটা অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।

এই জন্যই হাতরাস, এই জন্যই ইউপি সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

(৩) রেপ এর ক্ষেত্রে জাত-ধর্ম টানা কেন?

"রেপ রেপই। অন্য অপরাধের মতই একটি অপরাধ। এর মধ্যে জাত ধর্ম টানা কেন?"

রেপ সাধারণ অপরাধ নয়। এটি চুরি ডাকাতির মত নয়। এটি একটি আধিপত্য। যৌন আকাঙ্ক্ষা কেবল নয়।

সব রেপই ধর্ম ও জাতপাতের ব্যাপার নয়।কিন্তু কিছু কিছু। এটি এমন একটি ঘৃণ্য হাতিয়ার যা আধিপত্যকামী শ্রেণি দুর্বলের প্রতি ব্যবহার করে। করে কারণ যাতে তাদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে কেউ মাথা তুলতে না পারে। এ তারা করে চরম শিক্ষা দিতে। হাতরাসে উচ্চবর্ণের লোকেরা নিম্নদের অত্যাচার করে। তাদের সব রকম ভাবে কণ্ঠরোধ করে।

এই জন্যই জাত। এই জন্যই ধর্মের প্রশ্ন। এই জন্যই হাতরাসে তা আসছে।

(৪) ধর্ষণ ও নারীবাদ/ পুরুষ তন্ত্র

"কেন এখানে পুরুষ প্রাধান্যের কথা আসছে?

রেপএর কারণ যৌনাকাঙ্ক্ষা, হতাশা, যৌনতা না পাওয়া থেকে বেকারত্ব অনেক কিছুই হতে পারে।

হতাশের রেপ করার খুব প্রয়োজন হয় না। একাকীত্বে ভোগা লোক ধর্ষণ করেনা। যৌনাকাঙ্ক্ষা যুক্ত ব্যক্তি হস্তমৈথুন করে। বেকার কাজের সন্ধান করে। তারা কোন মেয়েটিকে এরপর ধর্ষণ করে এমন চিন্তা করে কি?

তাহলে কি পুরুষ প্রধান শাসন মানস? এই মেন্ট্যালিটি নারীকে হীন ভাবে। নারী বিদ্বেষীও হয়ে যায় অনেক ক্ষেত্রে। সেখান থেকে নারীর প্রতি যে সহিংসতা তা রেপ এ রূপ নিতে পারে।

সে তো পুরুষকে সন্তুষ্ট করার জন্যই জন্মেছে। তার ইচ্ছা তার অনুমতির কোনো দরকার নেই। এই মানসিকতা আবার নির্যাতিতাকেই দায়ী করে। অপরাধীকে আড়াল করার জন্য। রেপ এর 'লজ্জা' নির্যাতিতার জন্য।

এই মানসিকতা গোটা সমাজকে শাসন করে। এর নাম পুরুষতন্ত্র নয়। এর নাম রক্ষণকামিতা। এই রক্ষণকামিতা নারী ও পুরুষ উভয়কেই ব্যবহার করে। যেমন দেখুন শাসক দলের নারীরা এই ঘটনায় কেমন চুপ মেরে আছে। অর্থাৎ পুরুষ নারী নয় আসলে শত্রু একটি শক্তি। যা মানবতাকে পীড়ন করে। এই অপশক্তিই রক্ষণকামিতা। যে নারী ও নর কাউকেই ছাড়েনা।

মনে রাখা দরকার রক্ষণকামিতা পুরুষ আর নারী আলাদা করে দিতে চায়। যাতে তার বিরুদ্ধে নারী-পুরুষের মিলিত প্রতিবাদ প্রতিকারে রূপ নিতে না পারে। তাই পুরুষ প্রধান শাসন মানসের কথা মনে রেখেও নারীবাদের ছলে রক্ষণকামিতা যাতে যৌথ প্রতিবাদকে ভেঙে না দিতে পারে সেদিকে নজর দিতে হবে।

(৫) ধর্ষণ ও রাজনীতি

"বিরোধীরা এটা নিয়ে রাজনীতি কেন করবে? অপরাধের বিচার হোক এটাই কি যথেষ্ট নয়?"

রাজনীতি মানে কী? তা কি কেবল ভোট দেওয়া আর নেওয়া? না। রাজনীতি ঠিক করে দেশ এর উন্নয়ন পলিসি কী হবে। রাজনীতি ঠিক করে শিক্ষা পলিসি কী হবে। রাজনীতি ঠিক করে দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা পলিসি কী হবে। রাজনীতি ঠিক করে সামাজিক নিরাপত্তা কীভাবে নিশ্চিত হবে। মানে নির্বাচনের মাধ্যমে যাদের আমরা রাজনৈতিক ক্ষমতায় বসালাম তাদের দ্বারা আর্থসমাজের সুষ্ঠু বিকাশ, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা আশা করলাম।

তারা যদি ক্ষমতাসীন হয়ে সেই বিকাশ, সেই সমৃদ্ধি, সেই শান্তি ও সেই নিরাপত্তা না দিতে পারে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে পালটা রাজনীতি হবে না? অবশ্যই হবে। করতে হবে। রাজনীতি কেন হবে এই প্রশ্ন তোলাটাই এক্ষেত্রে মূর্খামী বা সেই অপদার্থ রাজনীতিরই পায়রোবি করা।

উত্তর প্রদেশ পুলিশ ও প্রশাসন কার দ্বারা চালিত হয়? আকাশ থেকে নয়। রাজনীতি দ্বারা। তাদের ব্যর্থতা শুধু নয়, তারা যখন অত্যাচারীর পক্ষ নেয় তখন পালটা রাজনীতি না করাটাই অপরাধ।

কর্পোরেট আধিপত্যে দেশের সিংহভাগ সম্পদ। বেকারত্ব আকাশ ছোঁয়া। তার অঙ্গুলি হেলনে রাজনৈতিক দলগুলি কাজ করছে। তাদের জন্যই আইন কানুন পুলিশ।

অন্যদিকে আবশ্যিক মূল্যহারা মানুষের ঢল। যাদের জীবন অন্ধকারের কানাগলিতে মুমূর্ষু। ক্রমশ আরো অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে একটা অংশ হয়ে যায় লুম্পেন। চোর-ছ্যাচ্ছড়-গুন্ডা-ভাড়াটে খুনি এরকম কত কী। অন্যদিকে গোটা সমাজটা কর্পোরেট সংক্রামিত নানান বিষে সংস্কৃতিহীন জড়পিন্ড। এই পিণ্ডে কখন কোন জায়গায় কোন অপকাণ্ড কীভাবে ওঁত পাতে তার ইয়ত্তা নেই। সেই কর্পোরেট রক্ষণকামিতা এই ব্যাপক গণমানসে সম্প্রদায়, জাত, উচ্চ, নীচ, বর্ণ, গোত্র হরেক সেন্টিমেন্টে সেন্টিমেন্টে সমাজটাকে ভাগ করে রাখে। যাতে তার হাতির পেটে লুকানো ধন আর্থসামাজিক জীবন বিকাশের জন্য বাজেয়াপ্ত না হয় এই ভয় তার সর্বক্ষণ। এই জন্য তাকে ভাগ-নীতি নিতে হয়। যা সে যুগে যুগেই করে।

মানবিক শক্তিকেও তার মোকাবিলা করতে হয়। যার পদ্ধতি প্রযুক্তির প্রকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত রামায়ন ও মহাভারতে দেখানো হয়েছে।

সমকাল সমাজ মানবতা সেই দৃষ্টান্ত দেখবে কি না বা তার ভিত্তিতে দানবিকতার বিরুদ্ধে লড়ার জন্য প্রস্তুত হবে কি না তার উপর নির্ভর করছে ধর্ষণ সহ যাবতীয় অপকাণ্ড নিয়ন্ত্রণের ভবিষ্যৎ।

নয়া শ্রম-আইন: কর্পোরেট শোষণের লাইসেন্স

দেশের সর্বকালীন বেকারি রেকর্ডের সিচুয়েশনে তিনটি শ্রম আইন, শ্রমের উপর রক্ষণকামের ভয়ানক আক্রমণ হিসেবে নেমে এল গত ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২০।

কোনো আলোচনা ছাড়াই-

১। INDUSTRIAL RELATION BILL, 2020

২। SOCIAL SECURITY BILL, 2020

৩। HEALTH, OCCUPATIONAL SAFETY AND WORKERS BILL, 2020 পার্লামেন্টের শীতকালীন অধিবেশনে পেশ হল এবং পাশ হল।

তার আগে কৃষি বিষয়ক তিনটি বিল নিয়ে দেশবাসী উত্তাল হয়েছে। এই ফাঁকতালে সরকার ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ শ্রম আইনকে রাতারাতি পাস করিয়ে নিল। মিডিয়া, ওয়াকিবহল মহল এ নিয়ে আলোচনা বিতর্ক করার সুযোগ পেলনা।

বিল তিনটি নিয়ে প্রিসাইজ আলোচনা এবং তা কীভাবে দেশের প্রতিটি শ্রমিকের জীবনকে প্রভাবিত করবে সেটি জানার আগে শ্রমচিত্র অতি সংক্ষেপে:

- মুক্ত বাজার অর্থনীতির অতি প্রকট বৈশিষ্ট্য হল লাগামহীন কর্পোরেট মুনাফা এবং শ্রমিকের কর্ম অনিশ্চয়তা (Precarity)।
- ২০০৪-০৫ থেকে ২০১৭-১৮ পিরিয়ডে কৃষি ক্ষেত্রের বাইরে স্যালারিড শ্রমিকের শেয়ার বেড়েছে ৬০% থেকে ৭১%।
- প্রাইভেট ও পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে তা ৫৯% থেকে ৭১%।
- সরকারি ক্ষেত্রও এর ব্যতিক্রম নেই। সেখানে বৃদ্ধি উক্ত পিরিয়ডে ২৭% থেকে ৪৫%।
- পরিযায়ী শ্রমিক দ্বারা এর বৃদ্ধি ৪৭% থেকে ৫৭%।
- ম্যানুফাকচারিং এর মত সংগঠিত ক্ষেত্রে ১৯৯৫-৯৬ থেকে ২০১৭-১৮ পিরিয়ডে এই বৃদ্ধি ১৩% থেকে বেড়ে হয়েছে ৩৬%।

এই বৃদ্ধি চিত্র কীসের ইঙ্গিত? না, সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমশক্তি সিফট হচ্ছে কৃষি ও অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে।

নতুন বিলে কী আছে?...

১) এ পর্যন্ত ১০০ জন শ্রমিক থাকা কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকদের ক্ষেত্রে মালিক যে যে স্বাধীনতা ভোগ করত (নিযুক্তি ও বরখাস্ত) তার উর্ধসীমা ৩০০ করা হয়েছে। অর্থাৎ ৩০০ জন পর্যন্ত শ্রমিককে নিয়োগ ও বরখাস্ত করা মালিকের ইচ্ছা অনুযায়ী হবে। সরকারি কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না।

২) সমস্ত ক্ষেত্রেই স্ট্রাইক করতে গেলে ট্রাইবুনালের কাছে ৬০ দিন আগে নোটিশ দিতে হবে। যা কার্যত শ্রমিকের স্ট্রাইকের অধিকার কেড়ে নেওয়া। কারণ যে জটিলতা স্ট্রাইক পূর্বে আনা হল তা স্ট্রাইকের আইনি অধিকার হরণ ছাড়া আর কিছু নয়।

৩)সোশ্যাল সিকিউরিটির নামে ন্যাশনাল সোশ্যাল সিকিউরিটি বোর্ড তৈরি করা হল। এই বোর্ড শ্রমিকদের জন্য নানা স্কিম তৈরি করবে। হাজার হাজার স্কিম থাকা সত্বেও এই বোর্ড মারফত আবার কী অশ্বডিম্ব আসবে সেটাই দেখার। তবে তা যে গরু মেরে জুতো দানের বেশি কিছু হবে না এটি নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

৪)কর্মক্ষেত্রে টেম্পোরারি থাকার ব্যবস্থাপনার দায় এতদিন পর্যন্ত কর্মদাতার ছিল। তা তুলে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এখন থেকে খাওয়ার মতো থাকার ব্যবস্থাও শ্রমিকদের নিজেদের করতে হবে।

৫)এক্ষেত্রেও গরু মারার পরের অবস্থা অর্থাৎ শ্রমিকদের আসা যাওয়ার ভাড়া কর্মদাতা দেবে।

গুজরাট মজদুর সভার পিটিশন ও সুপ্রিম কোর্টের রায়-

১) সম্প্রতি লকডাউনের অজুহাতে এগজিস্টিং শ্রম আইনকে গুজরাত উত্তর প্রদেশের মতো কয়েকটি রাজ্য সাসপেন্ড করেছিল। যেখানে শ্রম-ঘন্টা যতখুশি বাড়াবার স্বাধীনতা মালিক পক্ষকে দেওয়া হয়েছিল। বিক্ষোভ ও প্রতিবাদে তা সম্পূর্ণরূপে কার্যকর না হলেও গুজরাটের দুটি ট্রেড ইউনিয়নের করা কেসে সম্প্রতি

সুপ্রিম কোর্ট যে রাই দিয়েছে তা স্বস্তি ব্যঞ্জক।

২) বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় তার রাই-এ বলেছেন, গুজরাট সরকার মহামারি অজুহাতে ফ্যাকটরি আইনের বেসিক রাইটস সাসপেন্ড করার যে নোটিফিকেশন করেছে তা বেআইনী। যে নোটিফিকেশন বলে শ্রমিকের ১২ ঘন্টা কাজ, বিশ্রাম সময় কমানো ও ওভার টাইমের মূল্য কমানোর অপসুযোগ তৈরি হচ্ছিল।

৩) বিচারপতি আরো বলেন, লেবার ল সাসপেন্ড করা যায় "পাবলিক ইমার্জেন্সি" এর ক্ষেত্রে। মহামারি সেই অর্থে পাবলিক ইমার্জেন্সি নয়। যদিও তা বড় মাপের স্বাস্থ্য সংকট।

সংবিধানের আর্টিকেল ২১ (জীবনের অধিকার) ও আর্টিকেল ২২ (বাধ্যতামূলক শ্রম এর বিরুদ্ধে অধিকার) এ বিধৃত বেসিক সেট অব লেবার রাইট যা মর্যাদার সাথে বাঁচার অধিকারকে নিশ্চিত করে। চন্দ্রচূড় এটিও উল্লেখ করেছেন।

৪) এই অধিকারকে কলমের এক খোঁচায় ক্ষমতার জোরে মুছে দেওয়া যায়না। কিন্তু মেজরিট্যারিয়ান সরকার ক্ষমতায় থাকলে, সেই অধিকার অর্জন করতে হলে প্রয়োজন সক্রিয় শ্রম আন্দোলন ও নজরদার বিচার ব্যবস্থা।

৫) অন্যথায় নতুন আনা বিলে ১) শ্রমিকের বেসিক রাইটস ও প্রটেকশন ২) স্ট্রাইকের অধিকার ৩) উনবিংশ শতকের 'হায়ার ও ফায়ার' নীতি মালিকের করুণার উপর শ্রমিকদের ছেড়ে দেবে।

[শ্রমিকের বেসিক রাইটস ও প্রটেকশন বলতে লিমিটেড শ্রম-ঘন্টা, রেস্ট, মিনিমাম মজুরি, হেলথ ও হাইজিন নিশ্চিতকরণ।]

সূত্র: ১। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ২। হিন্দুস্তান টাইমস, গৌতম ভাটিয়ার আর্টিকেল।

নতুন কৃষি আইন: কৃষকের সর্বনাশ, বানিয়ার পৌষ মাস

আপনারা হরিয়ানা ও পাঞ্জাবে কৃষক-বিক্ষোভ হচ্ছে সেটি কি শুনতে পেয়েছেন? কর্পোরেট মিডিয়া কি সেগুলি আপনাদের শুনতে দিয়েছে? যদি না দেয়, আসুন একটু বুঝে দেখি কেন হরিয়ানার কৃষকরা রাস্তায় নেমে এলেন?

কেন্দ্রীয় সরকার অল্প কিছুদিনের মধ্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ তিনটি অধ্যাদেশ এনেছে। পার্লামেন্ট এড়িয়ে।

সেগুলির মধ্যে দিয়ে সে কী করতে চাইছে?

এটা জানতে হলে প্রথমে কয়েকটি বিষয় জেনে নেওয়া জরুরী।

১#

কৃষক ফসল ফলালেন। কোথায় কীভাবে কী দামে বিক্রি করবেন? স্বাধীনতার পর থেকে দীর্ঘদিন ফসলের দামের বাজারে সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিলনা। কৃষকরা মহাজন ও ফড়েদের দ্বারা প্রতারিত হত। ব্রিটিশদের সময়ে দাদন প্রথা একপ্রকার চালু ছিল। আর কৃষকরা ছিলেন ভূমিদাস।

২#

এভাবেই দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়। অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহ বিক্ষোভের পরিণতিতে ১৯৬৫ সালে APMC-Agriculture Produce Market Committee Act তৈরি হয়। যার মাধ্যমে কৃষির নিয়ন্ত্রিত বাজার চালু হয়। এতে কৃষকরা তাদের ফসল ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে (এম এস পি) বিক্রি করতে পারেন। মাণ্ডিগুলি তৈরি হয়। লোকাল ট্রেডার দ্বারা প্রতারণা কিছুটা ঠেকানো যায়।

৩#

বিশাল মুক্তবাজারের মাঝে সামান্য হলেও নিয়ন্ত্রিত এই বাজার কাজ করে। মনে রাখা দরকার মোট ফসলের মাত্র ৬% এই বাজারের আওতায় বিক্রি হয়। অর্থাৎ ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের বাজারের পরিধি অতি সংকীর্ণ। শুধু তাই নয় কিছুদিনের মধ্যেই এই মার্কেট কমিটিগুলি কার্টেল তৈরি করেও কৃষকদের কম দামে ফসল বেচতে বাধ্য করতে থাকে। স্থানীয় ক্রেতাদের সাথে তাদের অশুভ আঁতাতের মাধ্যমে।

৪#

তবু এই নিয়ন্ত্রিত বাজার নম নম করে হলেও টিকে থাকে। বিশ্বায়নের ঢক্কানিনাদে মুক্তবাজার যখন দেশের অর্থনীতিকে গ্রাস করে তখনো সরকার এই রক্ষা-কবজটি তুলে দিতে সাহস করেনি। কিন্তু এমন কাজ করেছিল যাতে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নামক বস্তুটি সোনার পাথরবাটির মত হয়ে যায়। কৃষিপণ্যের ফাটকা খেলতে ব্যবসায়ীদের কোনো অসুবিধা না হয়। এই কাণ্ড সহ চলতে চলতে নব্বই এর দশক পরবর্তীতে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য হিসেব কষার পদ্ধতির পরিবর্তনের দাবি জোরদার হতে থাকে। যার পরিণতিতে ২০০৬ এর শেষে স্বামীনাথন কমিশন একটি সুপারিশ করেন। যেখানে MSP হবে মোট খরচের ৫০% বেশি। সরকার সেটি গ্রহণ করেনি। ২০১৩ পরবর্তী সময়ে সরকার বলল তারা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী MSP নির্ধারণ করবে। যাইহোক কার্যক্ষেত্রে তা করা হয়নি।

৫#

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশের খাদ্য নিরাপত্তাকে প্রায়োরিটি দেওয়া হয়েছে। ফলে কৃষিকে কখনোই রপ্তানি নির্ভরতায় ঠেলে দেওয়া হয়নি।

৬#

এখন কেন্দ্রীয় সরকার কী করল? ওয়ান নেশন ওয়ান মার্কেট ও কৃষকের চয়েস অব ফ্রিডম স্লোগানের আড়ালে যেটুকু নিয়ন্ত্রণ অবশিষ্ট ছিল তা তুলে দিল। ফলে রেগুলেটেড মার্কেট শেষ। কৃষক কী করবেন? তারা ব্যবসায়ীদের সাথে দরকষাকষির মধ্যে দিয়ে তাদের ফসল বিক্রি করবেন। এতে তাদের ফ্রিডম অব চয়েস অর্থাৎ বাছাই এর স্বাধীনতা রক্ষিত হবে।

৭#

আসলে ওয়ান নেশন ওয়ান মার্কেট মানে হল

কেবলমাত্র মুক্ত বাজারের নিয়ম। ছিঁটেফোঁটা নিয়ন্ত্রণটুকু আর থাকবে না। কর্পোরেটরা কৃষিতে একচেটিয়া হয়ে ঢুকবে। আর এভাবেই নব্য দাসত্বের নয়া আখ্যান এর শুভারম্ভ।

কৃষক বাজার বা মান্ডিগুলি পাততাড়ি গুটাবে। MSP এর দায়বদ্ধতা সরকারের থাকবে না। কর্পোরেট মনোপলির দ্বারা কৃষকদের ফসল ফলানো বেচাকেনা ও জীবন নির্বাহ করতে হবে।

৮#

এই কারণের জন্যই পাঞ্জাব ও হরিয়ানার কৃষক বিক্ষোভ।

৯#

পশ্চিমবঙ্গে এই বিক্ষোভ কেন দেখা যাচ্ছে না? তার অনেক কারণের একটি, কৃষকরা সংগঠিত হতে পারছেন না। শাসকদলের তরফে কিছু প্রচার হচ্ছে। বিরোধীরা এখনো কোনো ভূমিকা নিতে পারেনি।

১০#

কৃষি ক্ষেত্রকে সরাসরি কর্পোরেটের কাছে উন্মুক্ত করতে মুক্ত বাজারের অতি প্রবক্তারা পর্যন্ত সাহস করেনি। এরা করছেন। এরা দু:সাহসী কাণ্ড ঘটাতে অতি সক্রিয়। পরিণাম নিয়ে চিন্তিত নন। যার দৃষ্টান্ত ১, নোটবাতিল ২, জিএসটি ৩, লকডাউন এবং আরো অসংখ্য। এক কথায় কৃষিকে বানিয়াদের কবলগ্রস্ত করানোর জন্য এই অধ্যাদেশ। কৃষক তথা জনগণ কি তা মেনে নেবে?

কথার শেষে

একটি সম্ভাব্য সূত্র?

ছাত্র-চাকুরি প্রার্থী-শ্রমিক- মধ্যশ্রেণি- কৃষক এর পৃথক পৃথক আন্দোলন? না, ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্ম।

তা না হলে ইউনিভার্সিটিতে ছাত্রের হাড়, রাস্তায় চাকুরি প্রার্থীর হাড়, বিক্ষোভরত কৃষকের হাড়, কারখানায় শ্রমিকের হাড়, বাজারের থলে হাতে মধ্যশ্রেণির হাড় ভাঙা ক্ষমতার কাছে অতি সোজা। হাড়গুলি জোড়া দেওয়া যায় না? তাহলে সহজে কি তা ভাঙা যাবে?....

এই জোড়া দেবার ভিত্তি ও রূপরেখা কী?

সে অন্য পরিসরে আলোচনার দাবী রাখে। একটি কথা বলা যায় - বস্তুগত মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার অধিকার। যার রুট মানবতা।

সেই মানবতার ভিত্তিটুকু নিয়েই ভাবার সময় এসে গেছে। একটি সুযোগও এসেছে। এযুগের কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থবাহী সোশ্যাল মিডিয়া। এই মিডিয়া দিয়ে ওরা যেমন ধারণার মনোপলি সংক্রমণ করতে চায়, এরই কাউন্টার প্রোডাক্টিভ রূপ দিয়ে তারই দাঁতের গোড়া ভাঙা যায়। শ্রমিককে তার পরিসরে, কৃষককে তার পরিসরে, ছাত্র শিক্ষকসহ অন্যান্য বৃত্তিজীবীদের নিজ নিজ পরিসরে বেঁধে রাখার দিন শেষ হয়েছে। ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্ম তৈরি করার এমন সুযোগ অতীতে ছিলনা। উৎপাদিকা শক্তি অর্থাৎ প্রযুক্তির নানাবিধ আবিষ্কার মানবতার সামনে সংকীর্ণ পরিসর ডিঙিয়ে বৃহত্তর জীবন পরিসর সৃষ্টি করার হাতিয়ার জুগিয়ে দিচ্ছে। একে কাজে লাগাবে কে? তার তত্ত্ব, তার আদর্শ আর প্রায়োগিক রূপরেখা কী– সেই গবেষণায় আত্মনিয়োগ করাটাই এখনকার কাজ।

চাকরি দেব না, কেড়ে নেব

উপবাদে বলে, ভাত দেবার ভাতার নয়, কিল মারার গোঁসাই---

সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকোনমি তাদের সার্ভে প্রতিবেদনে জানাচ্ছে:

তথ্য-১

- ২০১৯-২০ সালে মোট স্যালারিড জব ৮৬ মিলিয়ন
- ২০২০-২১ আপ টু আগস্ট ৬৫ মিলিয়ন
- মোট কর্মহানী ৮৬-৬৫= ২১ মিলিয়ন অর্থাৎ ২ কোটি ১০ লক্ষ চাকুরিজীবী এই সময়ে তাদের চাকুরি হারিয়েছেন। এই কর্মহারা কারা? তাদের শ্রেণি পরিচিতি? তারা কেমন বয়সের?
- তারা মধ্যবিত্ত।
- তারা সরকারি, কর্পোরেট সেকটর, কোম্পানি প্রভৃতিতে নিযুক্ত হোয়াইট কলার চাকুরিজীবী অর্থাৎ যারা অফিস আদালতে কোম্পানি বিল্ডিং প্রিমিসেস এ অফিসিয়াল কাজে যুক্ত।
- তাদের বয়স ২০ থেকে ৩০ এর মধ্যে অর্থাৎ তরুণ।

তথ্য-২

ভারতের মোট কর্মজীবীর ২১-২২ শতাংশ স্যালারিড অর্থাৎ চাকুরিজীবী। যাদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফিক্সড স্যালারি প্রাপ্তি ঘটে। চাকুরি বৃদ্ধি চিত্র–

- ২০১৬-১৭~ ২১.২ শতাংশ
- ২০১৭-১৮~ ২১.৬ শতাংশ
- ২০১৮-১৯~ ২১.৯ শতাংশ
- ২০১৯-২০~২১.৩ শতাংশ

এই হিসেব লকডাউনের আগের। এটি মাথায় রাখবেন।

তথ্য-৩

সরকারি প্রচারে একটি কথার ঢোল বাজানো হল। কী সেটি? আপনি চাকুরি চাইবেন কেন, আপনি চাকুরি দেবেন। মানে আপনি নিজেই উদ্যোগপতি (এন্টারপ্রেনার) হবেন এবং লোককে আপনি সেই উদ্যোগের উৎপাদনে চাকুরি দেবেন। তার হাল কী? দেখা যাক–

ইন্টারপ্রেনার এর সংখ্যা

- ২০১৬-১৭= ১৩%
- ২০১৭-১৮= ১৫%
- ২০১৮-১৯= ১৭%
- ২০১৯-২০= ১৯%

অর্থাৎ ২০১৬-১৭ সালে ৫৪ মিলিয়ন ইন্টারপ্রেনারসিপ থাকলেও তা ২০১৯-২০ সালে দাঁড়িয়েছে ৭৮ মিলিয়ন। মানে ২৪ মিলিয়ন বেড়েছে।

কিন্তু তারা কোনো চাকুরি দিতে পারেনি। কারণ এই সময় পর্বে চাকুরি ৮৬ মিলিয়নের থেকে এতটুকু বাড়েনি। স্টেবল থেকেছে। কারণ–

১। তারা নিজেরাই মরমর অবস্থায় উদ্যোগ নিয়েছে।

২। ক্রমাগত আর্থিক নিম্নগতি তাদের নতুন বিনিয়োগ বা কর্মনিযুক্তি ঘটাতে দেয়নি

৩। তারা ফেইল করেছে।

নিট ফল কী দাঁড়ালো?

লবডঙ্কা।

মানে কর্ম সংস্থান অর্থাৎ চাকুরি দূরস্থান। চাকুরি ছিনিয়ে নেয়া হল।

টেলিভিশন, খবরের কাগজ, সোশ্যাল মিডিয়ায় চোখ রাখলে এটি বোঝার জো আছে যে এই ক'মাসে ২ কোটির বেশি লোক চাকুরি হারিয়েছে? নেই।

- লোকগুলি কি রাস্তায় আন্দোলন করেছে? তারা কোথায় গেল?
- বয়সে তরুণরা কাজ পেলনা। উলটে তারা যেটুকু পেয়েছিল তা হারাল। তারপরে তারা চুপ কেন?

- কেন্দ্রীয় ক্ষমতার সাপোর্ট ভিত্তি আজ কর্পোরেট মিডিয়া আর সোশ্যাল মিডিয়া নির্ভর। সেই সব জায়গা তো এই মধ্য শ্রেণির। অথচ ওখান থেকেই সবচেয়ে বেশি সাপোর্ট আসছে কেন?

প্রখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী নোয়াম চমস্কি কর্পোরেট মিডিয়া ও ক্ষমতার সম্পর্ক চিত্র আঁকতে গিয়ে বলেছেন, ম্যানুফাকচারিং কনসেন্ট অর্থাৎ যেন-তেন প্রকারে তোমার মত যে আসলে আমার পক্ষে তা কারখানায় তৈরি মালের মত তৈরি করা ও তার বাজার জাত করণ।

মানে –

- ডিসলাইক কে লাইক এ বদলে প্রচার কর।।
- আতঙ্কের নীরবতাকে সম্মতি হিসেবে দেখাও।
- আমিই তো আছি। আর তো কেউ নেই। থাকতে নেই। এটা বুঝে নাও ও অন্যকে বুঝিয়ে দাও।।
- বিরোধী নেই। ব্যানার নেই। ভাষা নেই। স্লোগান নেই। মিছিল নেই।

অত:কিম?..

ভাষাহীনকে ভাষা কে দেয়?...

ভাষা দেন ব্যাস... অর্থাৎ জীবনের তত্ত্ব মানে নিয়মকে ভেদ করেন যিনি। মানে মহাভারত তত্ত্ব। তাতে কী? তা তো হরেক কাহিনির জঙ্গল! না, তার যুগপ্রাসঙ্গিক প্রযুক্তি নির্মাতা মানব অস্তিত্ব দেখানো পথ। সেটি কী –

- আর্থসমাজের কৌরব পান্ডব মেরুকরণ।
- পান্ডবী দল গঠন।
- নেতৃত্ব নির্বাচন

অত:পর কুরুক্ষেত্র!

তাহলে এই মর্মে উদ্যোগ শুরু হোক!

অর্থনীতির মহাধস

কথা#১

চিন বিপ্লবের নেতা মাও সে তুং বলেছিলেন অর্থনীতি হল রাজনীতির ঘনীভূত প্রকাশ। কথাটি পলিটিক্যাল ইকোনমির ছাত্র মাত্রেরই জানা। গেরস্থালির কর্তার উপর গেরস্তের শ্রী বা হতশ্রী নির্ভর করে। মানে গেরস্ত কোন পদ্ধতি প্রযুক্তিতে আয় ব্যয়ের ব্যালান্স করছেন। নাকি আদৌ তার এসবে মাথা ব্যাথা নেই। একটা বিশৃঙ্খলায় তার গেরস্থালি যেখানেই যাক না কেন বিদ্যাবুদ্ধি, জ্ঞান-গম্মিকে তিনি তার শত্রু গণ্য করেন। তাহলে যা হবার তাই হয়। এই নীতিগত chaos কতদূর যেতে পারে? তার ঘটনাগত উদাহরণ ইতিপূর্বে ভেনেজুয়েলা, গ্রীস এবং গত মন্দার সময় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ভোগ করেছে।

কথা#২

ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির হার ঋণাত্মক ২৩.৯ শতাংশ। বর্তমান বছরের প্রথম ত্রৈমাসিকে এই হিসেব। বৃদ্ধির হার আগের বছরের সাথে তুলনা করে নির্ণয় করা হয়। অর্থাৎ আগের বছর আমাদের মোট উৎপাদনের থেকে বর্তমান তিনমাসে তা ২৩.৯ শতাংশ কম। কোন কোন ক্ষেত্রে কম? কৃষি বাদে প্রায় সবক্ষেত্রেই।

জনতার ভোগব্যয় ৫০% এর বেশি কমেছে। প্রাইভেট বিনিয়োগ একই হারে কমেছে। সরকারি খরচ ১৬% বাড়লেও তা এই নিম্নমুখী বৃদ্ধির কাছে নস্যি মাত্র। একমাত্র কৃষিক্ষেত্রেই এত বাধা সত্ত্বেও ৩.৫% বৃদ্ধি হয়েছে। যার জন্য ভাল আবহাওয়াকেই ক্রেডিট দিচ্ছেন অর্থনীতিবিদরা।

কথা#৩

ভোগ ব্যয় কমা মানে লোকে আগের থেকে কম খরচ করছে। মানে বাজারে চাহিদা কম। চাহিদা কমলে বিনিয়োগ কমে। মানে প্রাইভেট পুঁজি উৎপাদনের ক্ষেত্রে কম বিনিয়োগ করবে। এর অর্থ কর্মক্ষেত্র কমবে। বেকারি বাড়বে। অর্থাৎ ভয়াবহ বেকারত্বই ভবিতব্য।

কথা#৪

সরকারি ব্যয়বরাদ্দ তথা জনগণের হাতে টাকা দেবার কথা বলে বলে বিরোধী দলগুলি এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা ক্লান্ত। কর্মসংস্থান সর্বকালের রেকর্ড ছাড়ালেও সরকারি দপ্তরে ১৫-২২ লক্ষ কর্মচারী পদ শূন্য। নিয়োগ নেই। উলটে বিএসএনএল এর মত সরকারি ক্ষেত্রে চাকুরি নট করে দেওয়া হয়েছে অনেকের। গত ১ বছরে প্রায় ৫০ লক্ষ লোক চাকুরি হারিয়েছেন।

কথা#৫

কলেজ ইউনিভার্সিটি থেকে ছেলে মেয়েরা বেরিয়ে কী করবে তার কোনো দিশা নেই। অথচ সরকার নয়া শিক্ষা নীতির নামে ছু কিত কিত খেলছে।

কথা#৬

দেশের এরকম আর্থিক সংকটে প্রাইভেট পুঁজির রমরমা কিন্তু থেমে নেই। আম্বানি-আদানি-পতঞ্জলিরা কিন্তু তাদের মুনাফার হার বাড়িয়েই চলেছে। জীবন চালাতে শিক্ষিত বেকাররা যখন কোনো কাণ্ডই বাকি রাখছে না তখন অশ্লীলভাবে এদের সম্পদ বেড়ে চলেছে।

কথা#৭

২০১৪ সালে অর্থনীতির যে অবস্থায় বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসেছিল ২০১৯ নাগাদ তাকে ভেঙেচুরে কিম্ভূতকিমাকার বানিয়ে ফেলেছিল। মনোমোহিনী বাঁশির সুর শুনে ১০ বছর কাটানোর পর রক্ষণকামী কর্পোরেট নীতি পঙ্গুত্বের অভিযোগে যাকে ক্ষমতায় আনল, তার কৃত এত বিশৃঙ্খলার জবাবে সে চুপ আছে। কেন? না, তার মুনাফাহানি তো ঘটছে না।

কথা#৮

গতকাল প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির রাজনৈতিক জীবন পরিসমাপ্তির পিছনেও তো ছিল এই কর্পোরেট স্বার্থ। যেখানে ইউপিএ জমানায় তার অর্থমন্ত্রিত্ব কালে সরকারি খরচ কমানোর জন্য তারা উঠে পড়ে লেগেছিল। কিন্তু তাঁর গৃহীত নীতিতেই অর্থাৎ বর্ধিত সরকারি খরচ যা প্রধানত ব্যয় হয়েছিল ১০০ দিনের কাজ, পিডিএস ইত্যাদির মত ক্ষেত্রে, দেশকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল বিশ্বমহামন্দার হাত থেকে। যার থেকে মার্কিন অর্থনীতিও ছাড় পায় নি। তো এই ভয়ানক আর্থিক টানাপোড়েনের সময় গতকালই আবার কেন্দ্রীয় সরকার তার ব্যয় কমানোর নামে সরকারি চাকুরি থেকে যাকে খুশি যখন খুশি নট করার নীতি ঘোষণা করেছে। একটা কমপ্লিট মাৎস্যন্যায় চলছে।

কথা#৯

বিনিয়োগহীন অর্থনীতির সংকটের কালে সরকার নন ইশ্যুকে ইশ্যু করে জনবিক্ষোভ সামাল দেয়ার চেষ্টা করছে। আর একাজে তার দোসর কর্পোরেট মিডিয়া। যেমন, একজন অভিনেতার আত্মহত্যা ও তার পরবর্তী কাণ্ড নিয়ে প্ল্যানড মাতামাতি!

কথা#১০

শুরুর কথায় আসা যাক। অর্থনীতি কোন পথে চলবে তা নির্ধারণ করে রাজনীতি। তাহলে জানতে হয় সেই রাজনীতির চরিত্র। কেমন সে রাজনীতি?

বিগত ছয় বছরের যাপিত জীবন কী বলে? সেখানে ডিমানিটাইজেশন এর উল্কাপাত, জিএসটি এবং পরবর্তীতে মহামারি কালীন অপরিণামদর্শী মর্মন্তুদ লকডাউন ব্যাপক জনমানসের পক্ষে ছিল না বিপক্ষে? আসলে কর্পোরেট ও অতিজাতীয়তাবাদের গাঁটছড়ায় দেশ ভয়াল সমস্যার মুখোমুখি।

বিকল্প কী? প্রয়োজন শত্রু মিত্রের মেরুকরণ। এই মেরুকরণ যা আসলে দানব থেকে মানবকে আলাদা করা। তার পর যেমনটা মহাকবি বেদব্যাস দেখিয়েছিলেন দানবকে কুরুক্ষেত্রের ময়দানে টেনে নিয়ে গিয়ে মীমাংসা করা।

ব্যাস (অস্তিত্ব) যার সূত্র দিচ্ছেন সংগ্রামী সংস্কৃতির উজ্জীবনে নতুন রাজনীতির সূচনার তত্ত্বে। সেই সূত্র অনুসন্ধান ও তার গবেষণায় আমরা ব্রতী হব কিনা তার উপর নির্ভর করছে আমাদের ভবিষ্যৎ।

মহামারির প্রেক্ষায় রক্ষণকামী বিজ্ঞান ও ধর্ম

পাখি/১

বিজ্ঞান হল বস্তুজ্ঞানকে কার্যকরী করার আপেক্ষিক প্রকৌশল। যেমন, নিউটনের বলতত্ত্ব বা আইনস্টাইন এর শক্তিতত্ত্বের ভিত্তিতে মানুষের জীবনকে সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করার নানান প্রকৌশল, যার উদঘাটনে জীবন সহজ ও গতিময় হয়। হয়েওছে তাই। এটিই হয়। যুগে যুগে, কালে কালে।

কিন্তু বিজ্ঞান যদি জড়বিজ্ঞানে বিশেষিত হয়ে গিয়ে বস্তুজ্ঞানকে অস্বীকার করে লাইব্রেরি বিশিষ্ট চার দেওয়ালকেই তার জড়চোখের স্বর্গ বানিয়ে নিতে চায়, তখন তা মানুষের জীবন বিকাশি ভূমিকায় না থেকে হয়ে যায় জীবন বিরোধী।

যে বস্তুসূত্রে নিউটন নিউটন হয়ে উঠলেন বা আইনস্টাইন আইনস্টাইন হলেন সেই সূত্রকে অস্বীকার করা মানেই বিজ্ঞান তখন জড়বিজ্ঞান। জড়ের সীমায় আটকে পড়েও সেই সীমাটা তখন তার দৃষ্টির অগোচর। এই বিজ্ঞানকেই আর্থসামাজিক অপক্ষমতা তার অপকাজে লাগায় খুব সহজেই।

পাখি/২

ধর্ম হল মহাবিশ্ব যে নিয়মে নিয়মানুগ তার সাযুজ্যে জীবন তথা আর্থসমাজকে সজ্জিত করার প্রক্রিয়া। মহাবিশ্বের নিয়মটি জেনে যখন যখন তার সমকাল প্রযোক্তারা সেটি আর্থসামাজিকভাবে প্রয়োগ ঘটিয়েছেন, পরবর্তী সংস্করণ না হওয়ায় তা তন্ত্র-রূপে জড় গেড়ে দিয়েছে। এই ধর্মতন্ত্র সেই একই অপক্ষমতার কব্জায় মানুষের জীবনবিরোধী হয়ে মানবতাকে অত্যাচার করে।

পাখি/৩

উক্ত জড়বিজ্ঞান আর তন্ত্র-রূপী ধর্ম তখন জীবনের কোনো সমস্যারই সমাধান করতে পারেনা। মহামারি সংক্রমণে দেখুন সেই ধর্ম আর বিজ্ঞানের হাল?

পাখি/৪

কথা তো আসলে এটাই যে, একদিকে মানুষের মন তথা আমিত্ব-শক্তি অর্থাৎ মানবিক শক্তি অন্যদিকে জড় অর্থাৎ পদার্থ-শক্তি অর্থাৎ দানবিক শক্তি। এই দুই শক্তির চলাচল ব্যক্তি থেকে সমাজে। এই দুই শক্তির দ্বন্দ্বে আমিকেই বিজয়ী হতে হয়। আমি বিজয়ী না হলে দানবিক খপ্পরে সমাজ অশান্তিতে ভোগে।

পাখি/৫

দানবিকতার আজকের রূপে দেশে দেশে রাস্ট্রীয় গণতন্ত্রের আড়ালে মানবতা ধ্বস্ত। আর এই দানবের সবচেয়ে বড় দুই ঢাল তন্ত্র রূপী ধর্ম আর জড়বিজ্ঞান।

দানবতার সাম্রাজ্য শ্রমমূল্য কব্জা করার মাধ্যমে গড়ে ওঠে। আর তাকে বৈধ করার জন্য দরকার হয় ধর্মের জড়িবুটি। যা ব্যাপক জনতার চোখে ঠুলি দিয়ে দেয়। মূল্যের প্রশ্ন চাপা পড়ে যায়। চাকুরি অর্থাৎ শ্রমক্ষেত্র কেন কোন জাদুতে সংকুচিত তারা ধরতে পারেনা। তখনই এই ধর্ম এই অধিকার হারানো মানুষের সামনে এগিয়ে দেয় অতিন্দ্রীয় ঈশ্বরকে। যা আসলে সেই দানবতার রক্ষাকবচ। এটিই কার্ল মার্ক্স কথিত আফিম। আর জড়বিজ্ঞান? সে মন অর্থাৎ আমিত্ব চেতনাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এই অধিকার হারানো জনতার শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত শুষে নেবার কল-কব্জার যোগান দেয় দানবতা অর্থাৎ রক্ষ অর্থাৎ রাক্ষস অর্থাৎ রক্ষণকামিতাকে। মানে খাটিয়ে মারার কলকব্জা। কিন্তু অর্থনীতির সহজ সরল পথটি যাতে বোধগম্য না হয়, তার ব্যবস্থাও পাকা করে দেয়।

পাখি/৬

আর এই আবহে গোটা পৃথিবীর পরিবেশ মুনাফা-খোরির লোভের আগুনে বিষিয়ে যেতে থাকে। পৃথিবীর গ্রীনহাউস বর্ম ঝাঝরা হয়, গ্লোবাল ওয়ার্মিং লাগাম

ছাড়া হয়, জল বায়ু মাটি সবটাই দূষণের খপ্পরে পড়ে। আমিত্ব-চেতনাহীন ক্ষীণদৃষ্টি মানুষ রূপী দানবের কবলে জীবনশৈলী এমন জবড়জং হয়ে যায় যাতে হিত -অহিত বোধ লোপ পায়। পরিণামে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও মহামারি সংক্রামিত হয়। আর তা তখন নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। তখন বিজ্ঞানকে সাপসাপান্ত করা ধর্মও মানুষকে বাঁচাতে পারেনা। আর বিজ্ঞান জড়ের মাতলামিতে পড়ে গিয়ে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি বের করতে পারেনা। তখন যা হবার তাই হয়।

পাখি/৭

তাহলে উপায়?

বস্তু সূত্র হল আমিত্ব অর্থাৎ চেতনার বিজ্ঞান। জন্মাষ্টমী প্রজ্ঞায় এই চেতনাকে অধিকার করাই মানুষের জীবন লক্ষ্য। আর তাতেই আমরা দ্বান্দ্বিক। মহাভারতের পঞ্চপান্ডব যে দ্বান্দ্বিকতায় আর্যসমাজ স্বর্গ রচনা করে। দ্বান্দ্বিকতা মানেই সুর-অসুর, ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ, বিদ্যা-অবিদ্যা, আলো-আঁধার, মানব-দানব চিহ্নিত করা। এককথায় চেতনা তথা আমিত্বের সৃষ্টিমুখীন চর্চা। যার নাম সংস্কৃতি।

এই সংস্কৃতি চর্চার চার্চিক হয়েই নিজ অনুভূতিকে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম করার সাধনা। যেখান থেকেই প্রতিকারী রাজনীতির উত্থান ঘটে। জীবন যখন ক্লিব নয়, বিজ্ঞান তখন মানুষেরই ঘর সাজায়, দানবের হাত শক্ত করেনা। ধর্ম রূপী তন্ত্রের তখন বাপের সাধ্য হয়না মানুষ তথা আর্যসমাজকে তার স্বধর্ম চ্যুত করে। আর মহামারি সহ যাবতীয় সমস্যা সমাধানের প্রযুক্তি তখন সেই সমাজের করায়ত্ব হয় খুব সহজেই।

‘অস্তিত্ব’ প্রকাশিত গ্রন্থাবলি

১। অস্তিত্বঃ প্রবেশিকা (২১টি প্রবন্ধ)	১৫০.০০
২। অস্তিত্ব △ মানুষঃ দেহপূর্ব, দেহান্তপূর্ব এবং ... বর্তন ক্রমঃ এক	২০০.০০
৩। অস্তিত্ব △ মানুষঃ দেহপূর্ব, দেহান্তপূর্ব এবং ... বর্তন ক্রমঃ দুই	২০০.০০
৪। দেহমনের নিয়ন্ত্রণ এবং...	১৩০.০০
৫। জীবন দিশারী ‘অস্তিত্ব’	৩০.০০
৬। মেধা প্রতিভা কি ভাগ্য (!) বাচক? কী তার লভ্য প্রযুক্তি?	১৫০.০০
৭। দাম্পত্য প্রযৌক্তিক পরিবার সমিতি	৩০.০০
৮। বস্তু প্রযুক্তি নির্মাণী ‘অস্তিত্ব’	২৫.০০
৯। সত্তার অর্গল ভাঙাটাই মনের দরজা খোলার রহস্য	৪০.০০
১০। শ্রমমূল্যের শান্তি রথ	১০০.০০

প্রকাশক: গাইডেন্স ফাউন্ডেশন
ফোন: ০৩৩-২২৮০-৬৭০৯/৫৫০৫
১৯৭ পার্কস্ট্রিট, কলকাতা-১৭, (পার্ক সার্কাস ময়দানের পাশে)
যোগাযোগ: ৯৮৩০০৬৯৫২৫
E-mail: emdadul197@gmail.com

Mob: 9434567197

M P BUILDERS

(Civil Contractor & Interior Decorator)

Head Office

Vill+ P.O- Rajanagar Srinath Gram
P.S– Kakdwip
Dist– South 24 Parganas
Mob: 9434567197 / 7384594644
mpbuilders9@gmail.com

Branch Office

Vill- Prasadpur
P.O- bBudhakhali
P.S– Kakdwip
Dist– South 24 Parganas
Mob: 7076416779

Cover page– 4

Issue date 15 March 2021.
Vol. III, Issue 1 Voice Mark

সাংস্কৃতিক বন্ধ্যাত্ব ও রাজনৈতিক দিশাহীনতায় আর্থসমাজ অস্থির। তার লক্ষ্য নির্ণয়ে ব্যর্থ। এই সংকটাপন্ন পটভূমিতে শান্তি লক্ষ্যে– ১। অস্তিত্ব: প্রবেশিকা (২১টি প্রবন্ধ) ১৫০. ২। মানুষ: দেহপূর্ব, দেহান্তপূর্ব এবং ... (বর্তন ক্রম: এক) ২০০. ৩। মানুষ: দেহপূর্ব, দেহান্তপূর্ব এবং ... (বর্তন ক্রম: দুই) ২০০. ৪। দেহমনের নিয়ন্ত্রণ এবং ... ১২০. ৫। শ্রমমূল্যের শান্তি রথ ১০০.

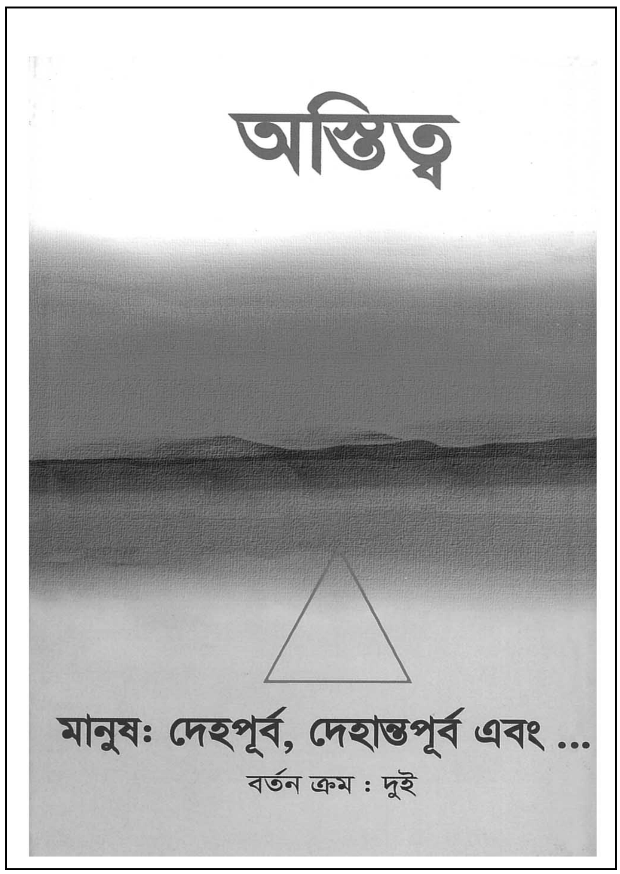

প্রকাশক: গাইডেন্স ফাউন্ডেশন
ফোন: ০৩৩-২২৮০-৬৭০৯/৫৫০৫
১৯৭ পার্কস্ট্রিট, কলকাতা-১৭, (পার্ক সার্কাস ময়দানের পাশে)

Published by Md. Azad Hossain from Bhagwanpur, Ashariadaha, Lalgola, Murshidabad, Pin-742148 and printed by him at M/s. KIS Offset Press, Berhampore, Murshidabad, Pin-742101.